তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

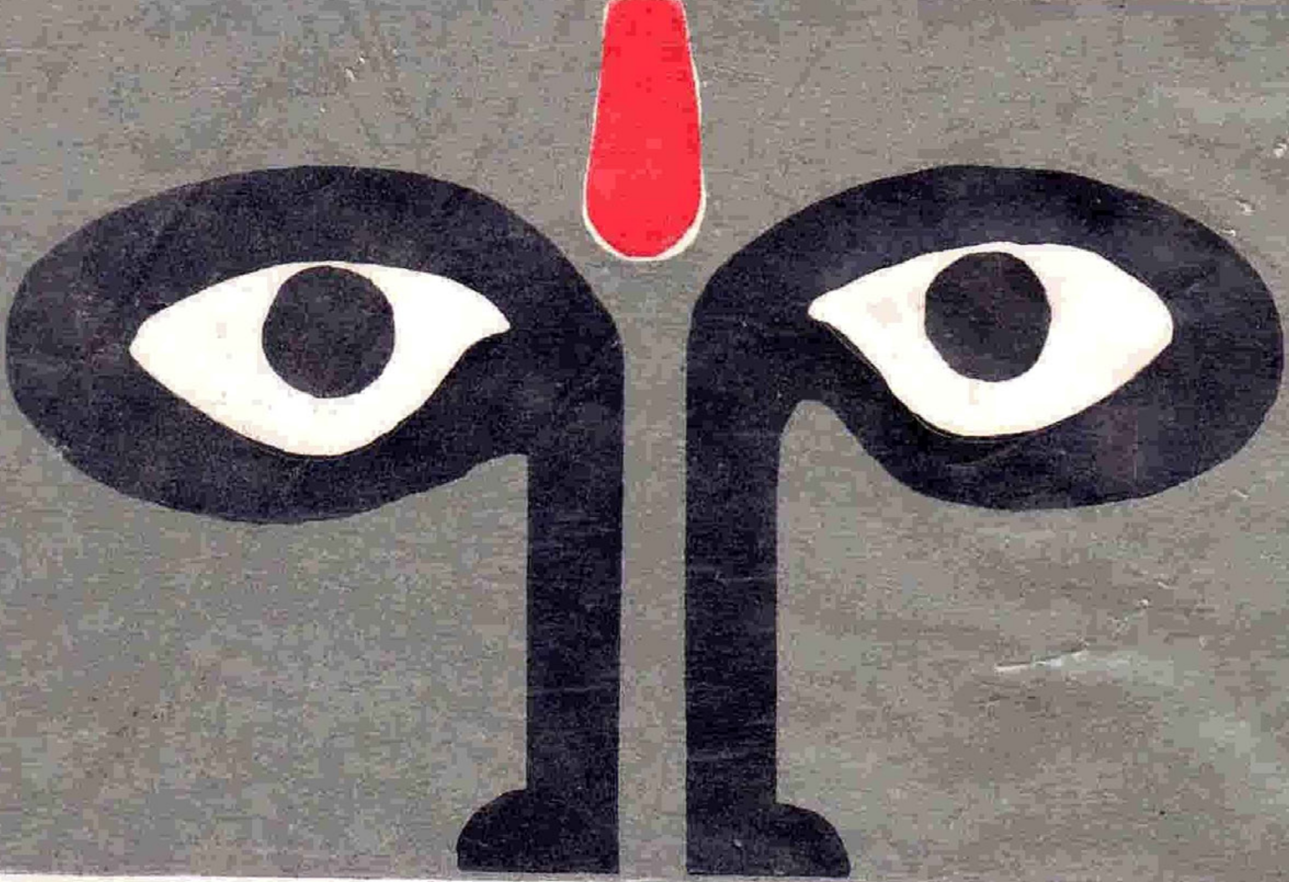

তারানাথ তান্ত্রিক

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কাহিনী আমার চিন্তাপ্রসূত নয়, বেশিরভাগই অভিজ্ঞতাপ্রসূত। অলৌকিক এবং অতিলৌকিক ঘটনার দিক শেষ হয়ে যায়নি, কেবল অনেক সময় আমরা তাদের অলৌকিক বলে চিনে নিতে পারি না—এই যা। জে. বি. এস. হ্যালডেন বলেছিলেন—সত্য যে কল্পনার চেয়েও বিচিত্র শুধু তাই নয়, আমাদের কল্পনা যতদূর পৌঁছয় সত্য তার চেয়েও অদ্ভুত। পাঠকেরা বিশ্বাস বা অবিশ্বাস যা নিয়েই পড়তে শুরু করুন না কেন, এ কাহিনীগুলি সত্য।

গত আট বছর ধরে 'কথাসাহিত্য' এবং অন্য পত্রিকায় তারানাথের গল্প প্রকাশিত হচ্ছিল—এখনও হতে থাকবে, তার গল্পের ঝুলি নিঃশেষিত হয়নি। কিন্তু তারানাথের প্রকৃত পরিচয় জানতে চাইলে আমি তার উত্তর দেবো না। পাঠকেরা আন্দাজ করার চেষ্টা করতে পারেন।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতির পর্যায়ে 'মিত্র ও ঘোষ'-এর শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীর অকৃপণ সাহায্য আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করেছে। কৃতজ্ঞতা উৎসাহদাতা অগ্রজসমান শ্রীভানু রায়কেও। মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ঋণ আজীবনের—তাকে নতুন করে আর কি জানাব?

॥ আরণ্যক ॥
এস. এন. ব্যানার্জী রোড্
পোঃ ব্যারাকপুর
২৪ পরগণা (উত্তর)

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
মকরসংক্রান্তি, ১৩৯২

দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাককথা

মানুষ গল্প শুনতে ভালবাসে। সেই আদিম নিয়ানডার্থাল মানুষদের যুগেও সারাদিন শিকার আর খাদ্যসংগ্রহ অভিযানের পর সন্ধেবেলা গোষ্ঠীর সকলে গুহায় ফিরে এসে অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে বসে গল্প শুনত এবং শোনাতো। এখন মানুষ চাঁদে-মঙ্গলে-মেষরাশিতে মহাকাশযান পাঠায়, হৃৎপিণ্ড আর কিডনী শল্যচিকিৎসা করে বদলে দেয়, কম্পিউটারের চাবি টিপে মুহূর্তে যোগাযোগ ঘটায় পৃথিবীর অপর প্রান্তের সঙ্গে—কিন্তু চেতনার গহন-গভীরে সে এখনও গল্পখোর। বোধহয় সেজন্যই 'তারানাথ তান্ত্রিক'-এর পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন হল। তারানাথের গল্প এখনও লিখে চলেছি, পাঠকেরা চাইলে হয়ত বা সেগুলিও সংকলিত হবে। বিভূতিভূষণ দুটি তারানাথের গল্প লিখে প্রয়াত হয়েছিলেন (সে দুটি এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত নয়), তারপর থেকে তারানাথ আমার হাতে। প্রথম থেকে ধরলে তারানাথের ধারাবাহিকতা প্রায় ছয় দশকের। কিন্তু তার বয়েস বাড়েনি, এখনও সে মধ্য পঞ্চাশে, থাকে মট্ লেনেই, বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের কলকাতায়—যে কলকাতা এবং তার পরিবেশ স্বপ্নবৎ মিলিয়ে গিয়েছে।

'মিত্র ও ঘোষ'-এর সবিতেন্দ্রনাথ রায়, প্রদোষকুমার পাল। মণীশ চক্রবর্তী এবং অন্য সমস্ত বন্ধুদের কৃতজ্ঞতা জানাই আমার প্রতি তাঁদের প্রীতিপূর্ণ প্রশ্রয়ের মনোভাবের জন্য। আমার অসুস্থতার কারণে প্রাথমিক পর্যায়ের প্রুফ সংশোধন করে দিয়েছেন আমার সহধর্মিণী মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা তো আজীবন॥

১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪০৮

॥ আরণ্যক ॥
এস. এন. ব্যানার্জী রোড্
পোঃ ব্যারাকপুর
উত্তর ২৪ পরগণা (দূরভাষ ঃ ৫৬০-৯৩২৮)

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

তারানাথ তান্ত্রিক

দিনটা সকাল থেকেই মেঘলা। দুপুরের দিকে বেশ একপশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। তারপর আর বৃষ্টি নেই বটে, কিন্তু আকাশ থমথম করছে কালো মেঘে। জোলো বাতাস দিচ্ছে।

এমন দিনে মনে একটা কি-করি কি-করি ভাব হয়। দু-একখানা বিলিতি ম্যাগাজিন বন্ধুদের কাছ থেকে চেয়ে এনে পরে পড়ব বলে জমিয়ে রেখেছিলাম। এখন সেগুলো উলটে-পালটে দেখলাম বাদলার দিনের মেজাজের সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছে না।

কি করা যায়? স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করব? নাঃ, সাত বছর বিয়ে হয়ে যাবার পর আর বাদলার দিনে খোলা জানলার ধারে স্ত্রীকে নিয়ে কাব্য চলে না। যতই নিষ্ঠুর শোনাক, কথাটা সত্য। মহাকালের নির্মমতা এবং অতীত সুখের দিন সম্বন্ধে বিমর্ষ ভাবে চিন্তা করছি, এমন সময় দরজার কড়া নড়ে উঠল।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি কিশোরী সেন। ভেতরে ঢুকে কাদামাখা রবারের পাম্পশু ছাড়তে ছাড়তে সে হেসে বললে, এই বর্ষার দিনে বাড়ি বসে করছ কি?

বললুম, যে অশ্ব নেই তার তৃণ সংগ্রহ করছিলুম। খুব ভাল হয়েছে তুমি এসেছ। একেবারে মিয়োনো দিন, না?

কিশোরী বললে, আর বসে কাজ নেই। একটা জামাটামা যাহোক কিছু গলিয়ে নাও। চল, তারানাথ জ্যোতিষীর বাড়ি ঘুরে আসি। আর কিছু না হোক, দু-একটা আজব গল্প তো শোনা যাবে। এমন দিনেই তো উদ্ভট গল্প জমে—

তারানাথের কথা আমার যে কেন আগেই মনে পড়েনি তা ভেবে অবাক লাগল। বললুম, বসো, ধুতিটা বদলে নিই—

পথে বেরিয়ে বললুম, ট্রামে উঠে কাজ নেই। মাসের শেষ, সেই আট পয়সা দিয়ে বরং সিগারেট কেনা যাবে। হেঁটে মেরে দিই চল। এইটুকু তো পথ—

কিশোরীরও মাসের শেষ। আট পয়সার পাশিং শো কিনে হাঁটতে হাঁটতে দুজনে মট্‌ লেনে তারানাথের বাড়ি হাজির হলুম।

দরজা খুললে তারানাথের মেয়ে চারি। আমাকে দেখেই বললে, কাকাবাবু, আজ আমার লেসের ডিজাইন ভোলেননি তো? রোজ-রোজই আপনি ভুলে যান—

আজ ভুলিনি। আগে থেকেই পকেটে রেখে দিয়েছিলাম। বের করে হাতে দিতে চারি হাসিমুখে বাড়ির ভেতরে যেতে যেতে বললে, বসুন, বাবাকে ডাকি—

খবর পেয়ে তারানাথ খুব খুশী হয়ে বেরিয়ে এল। বহুদিনের মধ্যে তারও এমন একনিষ্ঠ শ্রোতা ও ভক্ত জোটেনি। গল্পে লোক শ্রোতার মর্ম বোঝে। তক্তাপোশে বসতে বসতে তারানাথ বললে, তারপর, হঠাৎ যে?

বললুম, ভাল লাগছিল না বাড়ি বসে। তাই আড্ডা দিতে চলে এলুম। দু'একখানা গল্প হবে নাকি?

তারানাথ স্পষ্টতই খুশী হল, বললে, বসো, বসো জমিয়ে আগে। কি খাবে বল? ও চারি, চারি! এদিকে শোন্‌ দিকি একবার—

চারি এসে দাঁড়াতে তারানাথ বললে, যা দিকি চট করে তেল-নুন-কাঁচালঙ্কা দিয়ে মুড়ি মেখে নিয়ে আয়। পরে চা দিবি।

তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললে, কি গল্প বলব? তোমরা তো এসব বিশ্বাস করো না—

কিশোরী বললে, অমনি বলে বসলেন বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস যদি না-ই করব, তাহলে এই বাদলায় এতখানি পথ ঠেঙিয়ে এলুম কি করতে?

—সে গল্প শোনার লোভে। নাস্তিক আর অবিশ্বাসীরাই অলৌকিক গল্পের ভাল শ্রোতা হয়।

আমি বললুম, আপনার কাছে এতদিন আসছি, আপনি কিন্তু আমাদের অলৌকিক কিছু দেখালেন না—

তারানাথ উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, মানে শূন্যে হাত নেড়ে সন্দেশ রসগোল্লা আনা? জলকে মন্ত্র পড়ে সরবৎ করে দেওয়া? তোমাকে তো একদিন বলেছি, ওসব খুব নিম্নশ্রেণীর শক্তি—ভেল্‌কি। ও করায় গুরুর বারণ ছিল। তবে করিনি কি? করেছি। কম বয়েসে ভক্তদের অবাক করবার জন্যে, পয়সা রোজগারের ফিকিরে করেছি কিছু কিছু। বাকি শক্তিও তাতেই গেল। ওতে কিছু নেই বাপু—আসল তান্ত্রিক কখনো ভেল্‌কি দেখায় না।

কিশোরী বললে, আচ্ছা, সাধুরা যে চোখ বুজে ত্রিভুবন ত্রিকাল সামনে দেখতে পান, এখানে বসে বিলেতে কি হচ্ছে সব বলে দিতে পারেন, এসব কি বিশ্বাসযোগ্য।

তারানাথ জোর দিয়ে বললে, নিশ্চয়। সদ্‌গুরু পেলে আর প্রকৃত সাধনা করতে পারলে তুমিও পারবে।

—যেমন?

—যেমন। ধর, সদ্যোমৃত কোনো চণ্ডালের শব থেকে মুণ্ড কেটে এনে অমাবস্যা বা সংক্রান্তি তিথিতে শ্মশানে গর্ত করে তাতে সেই মুণ্ড নিক্ষেপ করতে হবে। পরে গভীর রাতে সেই গর্তের ওপর পদ্মাসনে বসে মাথার ওপরে মরা দাঁড়কাকের বাঁদিকের ডানা রেখে এক লক্ষ বার বীজমন্ত্র জপ করলে তুমিও সর্বজ্ঞ হতে পার।

কিশোরী বললে, বীজমন্ত্রটি কি?

তারানাথ বললে, সেটি বলা যাবে না। তন্ত্রে অদীক্ষিত লোকের কাছে সাধনার গুহ্যমন্ত্র বলা নিষেধ। বীজমন্ত্রই আসল কিনা—

চারি তেলে জবজবে করে মুড়ি মেখে নিয়ে এল। খেতে খেতে বললুম, আপনি কখনও সত্যিকারের কাপালিক দেখেছেন?

কিশোরী জিজ্ঞেস করলে, তান্ত্রিক আর কাপালিকে পার্থক্য আছে নাকি কিছু?

তারানাথ বললে, পার্থক্য আছে। তবে সে সব তোমাদের বোঝানো কঠিন, জেনেও তোমাদের কোন কাজ নেই। হ্যাঁ, কাপালিক দেখেছি কিছু। কিন্তু একবারের স্মৃতি কখনও ভুলতে পারব না।

তারানাথ যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে গেল।

বললুম, বলুন না সে গল্প, বেশ লাগবে শুনতে।

—বলছি এখন। তোমরা খেয়ে নাও আগে। সে এক ভয়াবহ কাহিনী হে—অনেকদিন বাদে মনে পড়ে গেল। এখনও মনে হলে গায়ে কাঁটা দেয়।

আমি বললুম, এ ঘটনা কি মধুসুন্দরী দেবীর আবির্ভাবের আগের?

—বটেই। আমার ভবঘুরে জীবনের একেবারে প্রথম দিকে ঘটেছিল। তখনও আমি বীরভূমের মাতু পাগলীকে দেখিনি। চা এনেছিস? রাখ্ এই তক্তাপোশেই—নাও, চা খাও—

আমরা চায়ে চুমুক দিলাম। তারানাথ গল্প শুরু করলে।

আমার বয়েস তখন বাইশ-তেইশ। বাড়িতে আর ভাল লাগে না। আমাদের গ্রামের ধারে বাঁধানো বটতলায় একবার এক বিচিত্রদর্শন সাধু এসে সাত-আটদিন বাস করেছিল। সামনে ধুনি জ্বালিয়ে চুপ করে বসে থাকে। মাথায় চূড়ার মত উঁচু জটার ভার। চোখ দুটো বেশ শান্ত। গ্রামের

অনেকেই তার কাছে গিয়ে দুধ, ফলমূল এসব দিয়ে আসত। বৌ-ঝিরা বায়না করত মাদুলি-তাবিজের জন্য। সাধু কিন্তু কখনও ভড়ং দেখায়নি, অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে ভক্ত যোগাড়ের চেষ্টা করেনি। কেউ বেশি বিরক্ত করলে বলত—আমি কিছু জানি নে মা, আমার কোন ক্ষমতা নেই। ভগবানকে ডাক, ভগবান সব ঠিক করে দেবেন। বেশি ধরাধরি করলে বলত—আচ্ছা যা, আমি তোর হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো। এই সততার জন্য এবং কারো কাছ থেকে পয়সা না নেওয়ায় সাধুর ওপর আমার কেমন একটা আকর্ষণ জন্মালো। গেলাম একদিন সাধুর বটতলায়।

একদিকে বসে আছি। নানারকম লোক এসে নানান বায়না করছে সাধুর কাছে। সাধু সবাইকেই হেসে বিদায় করছে। এসব মিটতে মিটতে বিকেল গড়িয়ে অন্ধকার নেমে এল। এবার আমি আর সাধুই কেবল রয়েছি বটতলায়।

পাশ থেকে একখানা চ্যালাকাঠ তুলে ধুনিতে গুঁজে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে সাধু বলল, আয়, এগিয়ে এসে বোস্।

আমি সাধুর সামনে ধুনির এপাশে গিয়ে বসলাম।

ধুনির আলোয় সাধু কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছে আছে, না?

আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলাম।

—তোর সে-সব হবে না। তবে তোর কপালে অনেক সাধুসঙ্গ আছে দেখছি। কিছু শক্তিও পাবি। কিন্তু সংসারে থাকতেই হবে তোকে।

আমি বললাম, আপনি তো কাউকে কিছু বলেন না। আমাকে এত কথা বলছেন কেন?

সাধু একটু চুপ করে বসে থেকে বলল, তোর কপালে তন্ত্রসাধনার চিহ্ন আছে—কিন্তু অস্পষ্ট। তার অর্থ কিছুদূরে গিয়ে তারপর ফিরে আসতে হবে। এ চিহ্ন না দেখতে পেলে তোকে এসব কথা বলতাম না। তোর অধিকার আছে জানার।

আমি উৎসুক হয়ে উঠলাম। বললাম, আর কি দেখতে পাচ্ছেন সাধুজী?

—আর যা দেখতে পাচ্ছি তা খুব ভাল নয়।

—কি রকম?

—বছরখানেকের ভেতর তোর খুব বড় বিপদ আসছে। ভালই হয়েছে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে তোর। নইলে প্রাণসংশয় হতে পারত।

বললাম, কি রকম বিপদ কিছু বলবেন না? তাহলে তার থেকে বাঁচব কি করে?

সাধু বলল, তা আমিও ঠিক বলতে পারছি না। জানলে নিশ্চয় বলতাম। তুই এসে বসবার পর থেকেই আমার মনে কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। এখন তোর দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি তোর পেছনে একটা অন্ধকারের স্তূপ যেন চাপ বেঁধে আছে।

আমি চমকে পেছন দিকে তাকাতেই সাধু হেসে বলল, তুই দেখতে পাবি না, আমি দেখতে পাচ্ছি।

আমি বললাম, এক বছরের মধ্যেই যে বিপদ ঘটবে তা কি করে বলছেন? আগে বা পরেও তো হতে পারে।

—ওটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। বোধ হয় ভুল করিনি।

চুপ করে বসে রইলাম। বলা বাহুল্য সাধুর কথা শুনে একটু গা শিরশির করছিল। কেউ যদি জানতে পারে তার পেছনে একটা অদৃশ্য চাপবাঁধা অন্ধকার ঘুরছে তাহলে তার ভাল লাগার

কথা নয়। তার ওপর নির্জন জায়গা—গ্রামের বাইরের দিকে বটগাছটা। ধুনিতে পট্‌পট্‌ করে কাঠের গাঁট পোড়বার শব্দ হচ্ছে। সাধু আর আমি ছাড়া কোনোদিকে আর কেউ নেই।

সাধু বলল, তোকে আমি একটা জিনিস শিখিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। ভাল করে শিখে রাখ্‌। যদি কোনোদিন কখনও বিপদ আসছে বলে মনে হয়, কি কোনো অস্বস্তি বোধ করিস, তাহলে এই প্রক্রিয়াটা করবি। যতই বিপদ আসুক, প্রাণটা বেঁচে যাবে।

বললাম, কি প্রক্রিয়া সাধুজী?

সাধু বলল, নে, ভাল করে দেখ্‌। আর এই মন্ত্রটা মুখস্থ করে নে। একে বলে গাত্রবন্ধন।

শিখতে বেশিক্ষণ লাগল না। বললাম, কিন্তু বিপদ যে আসছে, তা বুঝতে পারব কি করে?

সাধু একটু হাসল, তারপর বলল, তুই ঠিক বুঝতে পারবি। তোর কপালে তন্ত্রসাধনার চিহ্ন আছে, বললাম না? সময় হলে আমার মত মনের মধ্যে বিপদের ঘণ্টা বেজে উঠবে। আমি যেমন আজ তোর বিপদ বুঝতে পারলাম।

বললাম, কিন্তু আমি তো পারিনি।

—আজ থেকে তোকে কিছুটা শক্তি দিলাম। যা, ভালমন্দ যাই আসুক, তুই আগে থেকে আন্দাজ করতে পারবি।

আমি হাতজোড় করে বললাম, আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন। আমি দীক্ষা নেব আপনার কাছে।

সাধু ভ্রূ কুঁচকে বলল, ওসব হবে-টবে না। আমি কাউকে শিষ্য করি না। আবদার করিস না—যা, কেটে পড়্‌।

—আবার কবে আপনার দেখা পাব?

—এমনিতে দেখা পাবি না। তবে যদি সত্যি কখনও তোর প্রাণসংশয় ঘটে, তাহলে তোকে সাবধান করে দেব।

তারপরেই একটা আধপোড়া কাঠ তুলে নিয়ে ধুনি খুঁচিয়ে দিতে দিতে বলল—যা যা, ভাগ্‌—পালা!

বাড়ি ফিরে এলাম। পরদিনই সেই সাধু আস্তানা ভেঙে কোথায় চলে গেল কে জানে। পরদিন বিকেলে বটতলায় গিয়ে দেখি শুধু নিভে যাওয়া ধুনির ছাই আর কতগুলো আধপোড়া কাঠ পড়ে আছে।

মাসখানেক কাটল। কিছুই যেন আর ভাল লাগে না। কেবলই বাড়ির বের হয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। পথ যেন দারুণ আকর্ষণে টানছে। কেবল যে ধর্মের স্পৃহা তা নয়, একটা ভবঘুরেমি পেয়ে বসল। আরো কিছুদিন এভাবে কাটাবার পর একদিন সত্যিই কয়েকটা জামাকাপড় আর দশটা টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বাড়ির লোক খোঁজাখুঁজি করবে এবং সন্ধান পেলেই ধরে নিয়ে যাবে বাড়িতে। এজন্য সারাদিনই প্রায় হাঁটতাম, যতটা দূরে গিয়ে পড়া যায়। রাত্তিরে আশ্রয় নিতাম কোন গৃহস্থের বাড়িতে। তখনকার লোকজন ছিল ভাল। অভাব ছিল না, গোলাভর্তি ধান, পুকুরভর্তি মাছ, নিজের গরুর দুধ। অতিথিকে যত্ন করতে সে যুগের লোক ত্রুটি করত না। অব্রাহ্মণ গৃহস্বামী হলে গোয়ালঘরের একপাশ পরিষ্কার করে রান্নার আয়োজন করে দিত। সেখানে বসে রাঁধতাম। তারা আবার অপেক্ষা করত ব্রাহ্মণের প্রসাদ পাবার।

কিশোরী প্রশ্ন করল, জিনিসপত্রের দাম তখন কি রকম ছিল?

তারানাথ বলল, গাঁয়ের দিকে বেশির ভাগ জিনিসই কিনে খেতে হত না। সবই তো গ্রামেই উৎপন্ন হত। তবে হ্যাঁ, মনে আছে একবার আমি আর আমার বন্ধু হরমোহন মাংস খাবার শখ

হওয়ায় পাশের গ্রাম থেকে দশ আনা দিয়ে একটা পাঁঠা কিনে এনে দুজনে রান্না করে খেয়েছিলাম। তাও হরমোহন বার বার বলছিল আমরা ঠকেছি, আর একটু দরাদরি করলে আট আনার ভেতরেই হয়ে যেত।

আমি অবাক হয়ে বললাম, দশ আনায় একটা আস্ত পাঁঠা?

—বটেই। সে-সব সস্তাগণ্ডার বাজার তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।

—দুজনে মিলে গোটা পাঁঠাটা খেয়ে ফেললেন?

—তা পারব না কেন? গাঁয়ের ছেলে, আমাদের খিদেও ছিল আর অম্বলের ব্যামোতেও ভুগতাম না। আমার খাওয়ার কথা আর কি শুনছ? আমার বাবার খাইয়ে হিসেবে দশটা গাঁয়ের মধ্যে নামডাক ছিল। সে গল্প বলব এখন পরে একদিন।

কিশোরী বলল, হ্যাঁ, যে গল্প হচ্ছিল সেটা হোক।

তারানাথ বলতে শুরু করল।

এভাবে কিছুদিন ঘুরে বেড়িয়ে বিরক্তি ধরে গেল। রোজ রোজ অকারণে পথ হাঁটা, লোকের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া, তাদের দাক্ষিণ্যে ভাল ভাল খাওয়া—শুধু খাওয়ার জন্যই কি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি? বাড়িতে কি আমার ভাতের অভাব ছিল? কিন্তু যা চাই তা পাই কই?

যাই হোক, পথ হেঁটে ক্লান্ত অবস্থায় একদিন সন্ধ্যেবেলা এক গ্রামে এসে পৌঁছলাম। গ্রামটায় ঘনবসতি নেই, একটু ছাড়া ছাড়া বাড়িঘর। আম-জাম বাঁশবাগানে ভরা। একটা বড় আমবাগানের পাশে কাদের বেশ সুন্দর বাড়ি দেখে সেখানেই আশ্রয় নেব ভাবলাম। সুন্দর বলতে পাকা বাড়ি নয়, পোড়ো চালের বড় বড় আট-দশখানা ঘর মাঝখানে উঠোনকে ঘিরে। বিরাট উঠোনে ধানের গোলা, একপাশে গোয়ালে ক'খানা গরু সাঁজালের ধোঁয়ার মধ্যে বসে বসে জাবর কাটছে। আমি উঠোনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মধ্যে শাঁকে ফুঁ পড়ল। সব মিলিয়ে সম্পন্ন গৃহস্থের লক্ষণ ফুটে বেরুচ্ছে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, একজন কালোমত মধ্যবয়স্ক লোক এগিয়ে এসে বলল, কি চাই?

বললাম, আমি বিদেশী লোক, রাত্তিরটা একটু থাকবার সুবিধে হবে কি?

—আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

লোকটা 'আসুন আসুন' করে ব্যস্ত হয়ে আমায় নিয়ে দাওয়ায় বসাল, পা ধোয়ার জল দিল। তার নাম মাধব ঘোষ, সে-ই বাড়ির মালিক। চাষ-বাস আছে প্রায় পঞ্চাশ বিঘের। মাধব লোক বেশ ভাল, আমাকে রান্নার ব্যবস্থা করে দিয়ে সে ঠায় বসে রইল সামনে। বসে গল্প করে, আর একটু বাদে বাদে হুঁকো-টিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, সাজুন, ব্রাহ্মণের প্রসাদ পাব।

কথায় কথায় আমি বললাম, আমাদের বাংলাদেশের আতিথেয়তা বড় সুন্দর, না? এই যে তুমি আমাকে এত যত্ন করছ, এতে তোমার লাভ কি?

জিভ কেটে মাধব বলল, আজ্ঞে ও কথা বলবেন না। ব্রাহ্মণ-দেবতার হাঁড়িতে দুটি চাল দিতে পারছি—সে তো আমার সৌভাগ্য। তবে কথা কি জানেন, সব অতিথি তো আবার সমান হয় না—এই তো, দিন সাতেক আগে আমাদের বাড়িতে সে এক কাণ্ড।

ধোয়া সুগন্ধি আতপচাল হাঁড়িতে ছেড়ে দিয়ে তার দিকে ফিরে বললাম, কেন, কি হয়েছিল? চুরি-টুরি নাকি?

—তাহলে তো বরং ছিল ভাল। শুনুন না কাণ্ড। এই ঠিক গেল সোমবার বিকেলের দিকে এক লাল কাপড় পরা সন্ন্যেসী এসে বলে—তোমার এখানে থাকব। আমার সাদা মনে কাদা

নেই, বললুম—থাকুন। গোয়ালঘরে রান্নার ব্যবস্থা করে দিলুম। দিব্যি চেহারা তার—ফর্সা রঙ, এই মোটা পৈতের গোছা, দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই।

নিঃশেষিত কলকেটি উপুড় করে তামাকের গুল ঝেড়ে কলকেটি একপাশে রেখে মাধব বলল, সে রাত্তিরে কিছু হল না। পরের দিন সকালে সন্ন্যেসী যাওয়ার সময় আমাকে বললে—কাল যে মেয়েটি রান্নার জিনিসপত্র এগিয়ে দিচ্ছিল, সে তোমার কে হয়?

আমি বললাম—আমার মেয়ে। কেন বলুন তো?

তারপর, কি বলব আপনাকে, সন্ন্যেসী যা বলল তা শুনে তো নিমেষে আমার মাথায় রক্ত উঠে গিয়েছে। বলে কি, তোমার ওই মেয়েটি আমাকে দাও, আমি ভৈরবী করব। ওর শরীরে ভৈরবীর চিহ্ন রয়েছে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তারপর?

মাধব ঘোষ বলল, তারপর আর কি, আমার চেঁচামেচিতে পাড়ার লোক জড় হয়ে গেল। বললুম, যাও ঠাকুর, ব্রাহ্মণ বলে শুধু পার পেয়ে গেলে। নইলে মাধব ঘোষের মেয়ের দিকে নজর দিয়ে এ গ্রাম থেকে আর বেরুতে হত না। সন্ন্যেসী আমার দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে যাবার সময় বলে গেল, কাজটা ভাল করলি না, তোর মেয়ে উদ্ধার হয়ে যেত। প্রতিফল হাতে হাতে পাবি।

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম, বললাম, বল কি হে, এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার! লোকটা আর আসেনি তো?

মাধব ঘোষ হেসে বলল, আর তার আসতে সাহস হবে না। সন্ন্যেসী হলেও প্রাণের মায়া তো আছে।

মাধব ঘোষের যত্নের সত্যি তুলনা নেই। খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, একটা বড় জামবাটিভর্তি দুধ এনে সে একটু দূরে নামিয়ে রাখল। আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, আবার দুধ কেন?

—আজ্ঞে, খান ওটুকু। ব্রাহ্মণ-সেবা করলে আমার কল্যাণ হবে।

পরের দিন সকালে উঠে আমি মাধবের কাছে বিদায় নিলাম। সে ছাড়তে চায় না কিছুতেই। আমি প্রায় জোর করে চলে এলাম বলা যায়। কারণ আগেই বলেছি, আমি দুটো ভাতের জন্য পথে বের হইনি। সরল মানুষের ঘাড়ে চেপে অকারণে অন্নধ্বংস করতে আমার খারাপ লাগল। এই পথে আবার কখনও এলে তার বাড়িতে আশ্রম নেব কথা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

দুপুরে একটা গঞ্জ মত জায়গায় চিঁড়ে-দই কিনে খাই; তারপর আবার হাঁটি। সারাদিনে প্রায় মাইল পনেরো-ষোল হেঁটে সন্ধ্যে নাগাদ একটা এমন জায়গায় এসে পৌঁছলাম যার ত্রিসীমানায় কোন গ্রাম বা জনবসতি নেই। রুক্ষ, পাদপহীন প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে একটা ছোট্ট কি নদী তিরতির করে বয়ে চলেছে। কি করব ঠিক করতে না পেরে নদীর ধার ধরে হেঁটে এগুতে লাগলাম। মিনিট পনেরো হেঁটে দেখি সামনে এক শ্মশান। বেশ বড় শ্মশান। অন্তত যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখলাম কেবল পোড়া পোড়া কাঠের গুঁড়ি, ছেঁড়া মাদুর—কাঁথা, ভাঙা কলসী—এইসব পড়ে আছে।

কিশোরী বললে, ওই নির্জন শ্মশানে সন্ধ্যেবেলা আপনার ভয় করল না?

—নাঃ! ভয় করবে কেন? শ্মশান অতি পবিত্র স্থান, সেখানে মানুষের সমস্ত পাপ শেষবারের মত মুছে যায়, তার ঊর্ধ্বলোকে প্রস্থানের পথ সুগম হয়। শ্মশানে ভয় কিসের?

যাই হোক, দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখছি, হঠাৎ গম্ভীর ভারী গলায় পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল—এখানে কি চাই?

কি ভয়ানক গলার স্বর! লোহার ড্রামে পাথরকুচি ঢাললে এমন শব্দ হতে পারে। চমকে পেছনে তাকিয়ে দেখি একজন সাধু দাঁড়িয়ে। মাথায় পাকা তেঁতুলের মত অজস্র জটা। মুখময় অযত্নবর্ধিত দাড়িগোঁফের জঙ্গল। লম্বায় আমার মাথা ছাড়িয়ে আর এক হাত। পরনে রক্তাম্বর, পায়ে বউল দেওয়া কাঠের পুরু খড়ম।

—কি দরকার এখানে?

সাধুকে প্রণাম করে বিনীতভাবে জানালাম আমার বিশেষ কোন দরকার নেই, পথ হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছিয়েছি—এই মাত্র।

—কোথায় যাওয়া হবে?

—কোথাও না।

—মানে?

—ঠিক নেই।

—সাধু কি বুঝলে জানি না। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকল, তারপর তার দাড়ির জঙ্গলে খুব সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল। সে বলল, আয় আমার সঙ্গে।

সেই ঘনায়মান অন্ধকারে আমি সাধুর পেছনে চললাম। বেশ খানিকটা হাঁটবার পর দেখি একটা গাব বা ওই জাতীয় কোন গাছের নীচে সাধু মড়ার মাদুর, কাঁথা ইত্যাদি টাঙিয়ে বেশ ঝুপড়ি মত বানিয়েছে। বললাম, এইখানে আপনি থাকেন?

—কেন, অসুবিধেটা কি?

সাধুর কথাবার্তা যেন কেমন কেমন। আমি বললাম—না, অসুবিধে আর কি? তাই বলছি—

সাধু আমাকে ঝুপড়ির বাইরে বসতে বলে নিজে ভেতরে ঢুকল। বেরিয়ে এল দুটো পাকা কলা হাতে নিয়ে। বলল, এই নাও, খাও—

নিলাম।

—কি উদ্দেশ্যে বেরুনো হয়েছে বাড়ি থেকে? সাধু হবার ইচ্ছে নাকি?

আমি উত্তর না দিয়ে কলা হাতে চুপ করে বসে রইলাম।

—তুই আমার কাছে থেকে যা। আমি তোকে চেলা করে নেব। থাকবি?

তারপর সাধু একটা কথা বলল যা আমাকে আমাদের গ্রামের বটতলার সেই সাধুও বলেছিল। বলল, তোর কপালে তন্ত্রসাধনার চিহ্ন আছে। থেকে যা তুই আমার কাছে।

আমি একটু ফাঁপরে পড়লাম। এই সাধুকে দেখে আমার তেমন ভক্তির উদয় হয়নি, বরং কেমন একটু অস্বস্তিই হয়েছে। এত সহজে নিজে থেকে চেলা করে নিতে চাইল দেখে সে ভাব বেড়েছে বই কমেনি। ভাল সাধু কখনও কথায় কথায় শিষ্য করে বেড়ায় না। অবশ্য আমার আর চিন্তা কি? থাকি ক'দিন, ভাল না লাগলে কেটে পড়ার বাধা কোথায়? সাধুসঙ্গের জন্যই তো বেরিয়েছি, বাজিয়ে দেখতে দোষ কোথায়?

বললাম, থাকব।

সাধু বলল, বেশ। আমি একটা বিশেষ সাধনা করছি। সেটা ক'দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর তোকে দীক্ষা দেব।

—কি সাধনা?

—সে আছে। সময় হলেই জানাব। তাছাড়া তোর সাহায্যও আমার দরকার হতে পারে। থেকে গেলাম সাধুর কাছে। দু-চারদিন কেটে গেল।

সাধু আমাকে একলা ফেলে রেখে সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরে কি সব সংগ্রহ করে আনে। বোধ হয় নিজের সাধনার জিনিসপত্র। রাত্তিরে বসে অনেকক্ষণ ধরে পুজো-আচ্চা আর জপতপ করে। সে সময়টা আমি একটু দূরে কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বেলে মাটির হাঁড়িতে ভাতে-ভাত রান্না করি। অনেক রাত্তিরে খাওয়া হয়।

ক্রমে সাধুর কাণ্ডকারখানা দেখে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হল সাধু একজন কাপালিক। একদিন একটা মরা চড়ুইপাখি কোথা থেকে ঠ্যাং ধরে ঝুলিয়ে এনে হাজির। ঝুপড়ি থেকে ছুরি এনে চড়ুইটার পেট চিরে নাড়িভুঁড়ি বের করল সাধু। তারপর কি একটা জিনিস আমাকে না দেখিয়ে টুক্ করে ভরে দিল পাখিটার পেটে। আবার ঝুপড়িতে ঢুকে দু-খানা একই মাপের মাটির সরা এনে একটায় মরা পাখিটা রেখে অন্যটা দিয়ে চাপা দিয়ে দিল, তারপর একটু আটা মেখে সেই আটা দিয়ে দুটো সরাই মুখে মুখে জুড়ে দিল। আমি অবাক হয়ে বললাম, এ দিয়ে কি হবে?

সাধু সংক্ষেপে বলল, কাজ আছে।

তারপর আমার হাতে মুখবন্ধ সরাটা দিয়ে বলল, আগুনে পোড়াও তো এটা। এক ঘণ্টা ধরে পোড়াবে। এইভাবে তিনদিন এক ঘণ্টা করে পোড়াবে। নাও—

রান্না হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আগুন তখনও জ্বলছে। আমি কথা না বলে সরাটা সাধুর কাছ থেকে নিয়ে আগুনে রেখে দিলাম।

সাধু বললে, দ্রব্যগুণ, বুঝলে? দ্রব্যগুণ এক বিরাট জিনিস। তুমি মানো?

বললাম, নিজে প্রত্যক্ষ দেখিনি কখনও। গাছপালা থেকে ওষুধ তৈরি হয় দেখেছি, খেলে অসুখ সেরে যায় তাও দেখেছি। কিন্তু যেসব কথা শুনতে পাওয়া যায়—যেমন বশীকরণ, স্তম্ভন—সেসব দেখিনি।

সাধু হেসে উঠে বলল, বশীকরণ? ও আবার একটা কঠিন কিছু নাকি? ওর অনেকরকম উপায় আছে। বেশি জটিল প্রক্রিয়ায় যাবার দরকার কি? একটা সোজা উপায় শিখিয়ে দিই, শোন। চেষ্টা করলে তুমিও পারবে—

—আজ্ঞে কি?

—যে কোন মাসের অমাবস্যা তিথিতে যদি দুপুরবেলা ঘূর্ণিঝড় ওঠে কিংবা জোরালো হাওয়া দেয়, তাহলে সেই হাওয়ায় উড়ে যাওয়া কোন শুকনো গাছের পাতা একটা মন্ত্র বলতে বলতে বাঁ হাতে ধরে ফেলতে হবে। সেই পাতা গুঁড়ো করে পান বা দুধ বা যাহোক কিছুর সঙ্গে খাইয়ে দিতে পারলে সেই লোক কুকুরের মতো তোমার পায়ে পায়ে ঘুরবে। আছে আমার কাছে, দেখবে?

সাধু ঝুপড়ি থেকে একটা শুকনো অশ্বত্থপাতা হাতে করে বেরিয়ে এল, বলল—ভাদ্রমাসের অমাবস্যায় ধরেছিলাম। থাক আমার কাছে, এর গুণ দেখিয়ে দেব—

দিনদুয়েক আগে সাধু একটা বেশ মোটা নিমের ডাল নিয়ে এসেছিল। একদিন সকালে দেখি বসে বসে ছুরি আর দা দিয়ে কেটে তার থেকে একটা পুতুল বানাচ্ছে। নাক, মুখ, চোখ সবসুদ্ধ একটা মানুষের মূর্তি। এদিনও অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এ দিয়ে কি হবে?

এদিনও সাধু রহস্যময় হেসে বলল, কাজ আছে।

তখনও আমি সাধুর আসল উদ্দেশ্য কিছুই বুঝতে পারিনি! বুঝতে পারলে আর এক মুহূর্তও সেখানে থাকতাম না।

আরো তিন-চারদিন কাটল। একদিন বিকেলে আমি রান্নার জন্য কাঠকুটো এক জায়গায় জড়ো করছি, সাধু এসে কাছে বসল। বলল, তুমি প্রকৃতির সংহার শক্তিতে বিশ্বাস কর?

বললাম, আজ্ঞে, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—প্রকৃতির অনেকরকম শক্তি আছে। যেমন প্রকৃতি আমাদের শস্য দান করে, বাতাস দান করে, বৃষ্টি দান করে—এগুলিতে আমাদের প্রাণ বাঁচে। এগুলি শুভ শক্তি। আবার মহামারী, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, যুদ্ধ—এগুলি হল সংহারক শক্তি। এছাড়াও নানা ধরনের অদৃশ্য, অদ্ভুত মারক শক্তি আছে, সাধনার দ্বারা তাদের জাগ্রত করা যায়। যেমন বেতাল জাগানো। বেতাল হচ্ছে এক ধরনের ক্রূর নিষ্ঠুর অপশক্তি, তার মারক ক্ষমতাও অমোঘ। একবার জাগ্রত হলে কাজ শেষ না করা অবধি তার নিদ্রা নেই।

আমার গা শিরশির করছিল, বললাম, আর যদি কাজ শেষ না করতে পারে? যদি বাধা পায়?

সন্ন্যাসীর চোখ জ্বলে উঠল, বলল, বেতালকে বাধা দেওয়া খুব কঠিন, প্রায় অসম্ভব। কিন্তু বাধা পেলে সে ফিরে এসে যে তাকে জাগিয়েছে, তাকেই হত্যা করে। এসব আগুন নিয়ে খেলা।

সাধু একটু চুপ করে থেকে বলল, আজ রাত্তিরে তোমাকে বেতাল জাগানোর পদ্ধতি দেখাব। তুমি ভয় পাবে না তো?

প্রথমে ভাবলাম বলি—হ্যাঁ। তারপর জিনিসপত্র পোটলা করে পালাই। কিন্তু কেমন একটা আকর্ষণ হল, বললাম, না। আপনি কি এরই সাধনা করছিলেন?

সন্ন্যাসী হেসে বললে, তাই।

সেদিন রাত্তির যখন গভীর, সাধু তার ক্রিয়াকর্ম শুরু করল। জবাফুলের মালা, রক্তচন্দন—এসব আগে থেকেই যোগাড় করা ছিল। সাধু সেই নিমকাঠের পুতুলটা এনে তাতে বেশ করে তেল সিঁদুর মাখাল, তারপর সেটাকে কোমর অবধি পুঁতল মাটিতে। তার চারদিকে বেড়ার মত করে মাটিতে রেখে দিল একটা জবাফুলের মালা। পদ্মাসনে বসে বিড়বিড় করে কি মন্ত্র পড়তে পড়তে পুতুলটায় চন্দনের ছিটে দিতে লাগল। এসব হলে ঝোলা থেকে বের করল একটা মদের বোতল। সাধুর ঝুপড়িতে একটা মড়ার খুলি ছিল আগেই দেখেছি, সেটাতে খানিকটা মদ ঢেলে সাধু আমার দিকে তাকিয়ে বলল, সেই বন্ধ সরাটা কই?

আমি সরা এনে দিলাম। সাধু আটাগুলো নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে তুলে সরাটা খুলল। দেখলাম তিনদিন পোড়ানোতে ভেতরের পাখিটা একদম ছাই হয়ে গিয়েছে। সেই ছাই একচিমটি নিয়ে মদে মেশাল সাধু, তারপর ঢক্ করে মদটা গলায় ঢেলে দিল।

খাওয়ার পরেই সাধুর আশ্চর্য পরিবর্তন দেখলাম। সাধুর চোখ দুটো ছোট ছোট কোটরে গিয়ে যেন দু'টুকরো কয়লার মত জ্বলতে লাগল। আমার দিকে ফিরে সাধু বলল, শুকনো কাঠ দিয়ে একটা ধুনি করো—

করলাম। ধুনি বেশ জ্বলে উঠতে সাধু রক্তচন্দন দিয়ে ধুনি পুজো করল। তারপর তামার কোষায় গাওয়া ঘি, একটা জবাফুল, আরো কি যেন মিশিয়ে মন্ত্র পড়ে আগুনে আহুতি দিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিকট পোড়া গন্ধে ভরে গেল চারদিক। সাধু বিকৃত গলায় হেসে উঠল। আর আমার মনে হল সেই ধোঁয়া আর অন্ধকারের ভেতরে ধুনির মধ্যে থেকে একটা যেন জমাট অন্ধকার দিয়ে তৈরি মূর্তি উঠে বাতাসে ভর করে ভেসে কোথায় মিলিয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে সেইদিকে তাকিয়ে রইলাম। মূর্তিটাকে খুব পরিষ্কারভাবে যে দেখেছিলাম, তা বলতে পারি না। তবে যেটুকু দেখতে পেয়েছিলাম, তাতেই বুক ঠাণ্ডা হয়ে আসে। বিশাল, স্থূল রাত্রির অন্ধকার দিয়ে তৈরি যেন একটা অপছায়া।

সাধু বলল, দেখলে? ওই বেতাল—

আমি বললাম, কোথায় গেল ও?

সাধু বসে বলল, এদিকে সরে এস। আমি আসল কথাটা এতদিন তোমাকে বলিনি। আজ বলি। আজ থেকে পনেরো-কুড়িদিন আগে এখান থেকে মাইল কুড়ি দূরে এক গ্রামে আমি মাধব ঘোষ বলে একজন লোকের বাড়ি রাত্তিরে আতিথ্য গ্রহণ করি।

আমার মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। মাধব ঘোষ! তাহলে এই কাপালিকই সেদিন মাধব ঘোষের বাড়িতে হাঙ্গামা করেছিল! বটে!

সাধু বলে চলেছে—সেই মাধব ঘোষের বড় মেয়েটির দেহে প্রকৃত সাধন-সঙ্গিনী হবার উপযুক্ত সমস্ত লক্ষণ বর্তমান ছিল। আমার বর্তমানে কোনো ভৈরবী নেই। আমি পরদিন সকালে মাধব ঘোষের কাছে সাধনার জন্য মেয়েটিকে চাইলাম। মাধব দিল তো না-ই, উপরন্তু আমাকে অকথ্য অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। সে অপমান আমার বুকে কাঁটার মত বিঁধে আছে। বেরিয়ে আসবার সময় মাধব আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে একটা ধাক্কাও দিয়েছিল। আমার গায়ে হাত! আচ্ছা! মাধব ঘোষ—এইবার দেখব তোমাকে—

আমি ভয় পেয়ে বললাম—কি করবেন আপনি?

—করবো কি? করেছি—এই যে বেতাল জাগিয়ে পাঠালাম, কোথায় গেল সে? পাঠালাম ওই মাধব ঘোষের বাড়ি। এইবার সে বুঝবে কাকে সে অপমান করেছিল।

—কি হবে মাধব ঘোষের?

—আজ তার নিজের ক্ষতি কিছু হবে না। আজ তার বাড়িতে একটা কিছু করে আসবে বেতাল। এক পক্ষ ধরে আমি বেতাল মন্ত্র জপ করে আজ আহুতি দিয়েছি। কাল অমাবস্যা, কাল পূর্ণাহুতি দেব হোম করে। ওই যে নিমকাঠের পুতুল দেখছ, ওটা হচ্ছে মাধব ঘোষের প্রতিমূর্তি। ওই পুতুলে কাল প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে বেতালকে চিনিয়ে দেব! তারপর বেতাল আবার কাল যাবে মাধবের বাড়ি। তারপর? তারপর পরশু মাধব ঘোষের মৃতদেহ পড়ে থাকবে উঠোনে, কি আমবাগানের মধ্যে। ভয়ঙ্কর—বীভৎস অপমৃত্যু! কেউ কিচ্ছুটি টের পাবে না কোথা দিয়ে কি হল।

সাধুর মুখখানা এখন আমার কাছে নেকড়ে বাঘের মত লাগছিল। আমি আর সহ্য না করতে পেরে বললাম, কিন্তু এ আপনি অন্যায় করছেন! এ ঠিক নয়—

সাধুর চোখ আবার ধ্বক করে জ্বলে উঠল। পৈশাচিক ক্রোধে মুখ বিকৃত করে সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কি বলতে চাস্ তুই? আমি অন্যায় করছি?

আমার যেন কেমন সাহস এসে গেল। বললাম, নিশ্চয় অন্যায়। আপনি এই কুকর্মে লিপ্ত আছেন জানলে আমি একদিনও থাকতাম না এখানে। প্রতিহিংসা সাধনের জন্য নরহত্যা মহা অধর্ম।

—মূর্খ। কাপালিকের পক্ষে প্রতিহিংসা সাধন অধর্ম নয়। তুই তার কি বুঝবি?

—থামুন! আপনার মত নরকের কৃমিকীটের কাছে আর নয়। আমি চললাম। আপনি থাকুন আপনার কুৎসিত সাধনা নিয়ে—

হনহন করে হেঁটে সেই রাত্তিরেই রওনা দিলাম শ্মশান থেকে। পেছনে সাধু ডেকে বলল, যাচ্ছিস যা! কিন্তু শুনে যা—আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে অপমান করে বেশিদিন পৃথিবীর আলো দেখেনি। মনে রাখিস—

অনেক দূর চলে এসেছি, তখনও পেছন থেকে রাত্তিরের নির্জনতা ভেদ করে সাধুর উন্মাদের মত হাসি শুনতে পাচ্ছিলাম।

পরের দিন দুপুর গড়িয়ে গেলে অবিশ্রান্ত হেঁটে আমি মাধব ঘোষের বাড়ি পৌঁছলাম। দেখি, সমস্ত বাড়িটা যেন কেমন ঝিমিয়ে আছে। ভেতরে কেউ যেন জেগে নেই। আমার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। না জানি বেতাল কাল রাত্তিরে কি করে গিয়েছে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাক দিলাম, মাধব! মাধব!

ডাক শুনে ভেতর থেকে মাধব বেরিয়ে এল। আমাকে দেখে সে যেন হাতে চাঁদ পেল। এগিয়ে এসে পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, ঠাকুরমশায়! ওঃ আপনি এসেছেন! আমি যেন একটু বল পেলাম। ভগবান পাঠিয়েছেন আপনাকে—

দেখলাম মাধবের চোখ বসে গিয়েছে, মুখ শুকনো। বললাম, কি হয়েছে? কোন বিপদ-আপদ হয়নি তো?

—আর বিপদ! গতকাল রাত্তিরে আমার দু-খানা গাই-গরু মরে গেল ঠাকুরমশাই!

—সে কি! গরু মারা গেল কি করে?

—তা কি করে বলি বলুন দিকিনি ঠাকুরমশাই? আশ্চর্য ব্যাপার! তখন অনেক রাত, হঠাৎ গোয়ালে কেমন একটা শব্দ শুনলাম, মনে হল গরুগুলো যেন ভয় পেয়ে ছটফট করছে। উঠে বাইরে যাবার আগেই মুংলি গাইটা চিৎকার করে উঠল। গিয়ে দেখি রাঙি আর মুংলি দুটোই মাটিতে শুয়ে ছটফট করছে। কি হল কে জানে! তক্ষুনি লোক পাঠালাম পাশের গাঁয়ে গো-বদ্যির জন্য। সে এল বটে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলে না। আজ সকালে মারা গেল গরু দুটো।

মাধবের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বলল, আজ সকাল থেকে আবার মেয়েটার জ্বর, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। এসব তো ভাল কথা নয় ঠাকুরমশাই। আপনি এলেন ভালই হল। ব্রাহ্মণ মানুষ, ভিটেয় বাস করলে আমার ভয় কেটে যাবে।

বুঝলাম সবই। কিন্তু আমার কি করার আছে কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি থাকলে যদি মাধব শান্তি পায়, তাহলে থাকতে পারি—এই মাত্র।

একটু পরেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

তখন বিকেল বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে। মাধব ঘোষ বেশ করে ফলারের আয়োজন করে দিয়েছিল। ফলার করে আমার একটু বাগানে যাবার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। মাধবের কাছ থেকে গাড়ু চেয়ে বাগান সারলাম। গাড়ু হাতে ফিরছি, হঠাৎ মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অনুভূতি জেগে উঠল। ঠিক কি রকম তা বোঝাতে পারব না। যেন আমার খুব বড় একটা বিপদ আসছে। খুব কাছে এসে গিয়েছে সে বিপদ। ভয়ের একটা বিচিত্র অনুভূতি বুকের মধ্যে ঠেলে উঠল। সেই অন্ধকার নির্জন আমবাগানে দাঁড়িয়ে হঠাৎই আমার বুক যেন হিম হয়ে গেল। কেন এরকম হচ্ছে আমার?

তাড়াতাড়ি ফেরবার জন্য এগুতে গিয়ে মনে হল কয়েক হাত দূরে একটা আমগাছের গুঁড়ির পাশে কে যেন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

আর একটু হলে বোধহয় ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠতাম, কিন্তু ততক্ষণে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে আমি চিনতে পেরেছি।

আমাদের গাঁয়ের বটতলার সেই সৌম্যমূর্তি সাধু। যিনি বলেছিলেন আমার বিপদ ঘনিয়ে এলেই আমাকে দেখা দেবেন। তাহলে কি সত্যিই আমার আজ সেই বিপদের দিন এসেছে?

দূর থেকেই আমি সাধুকে প্রণাম করলাম। সাধু হেসে হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন! তারপর হঠাৎ কোথায় সাধু কোথায় কি! কেউ নেই কোথাও? আমি একা অন্ধকারে গাড়ু হাতে দাঁড়িয়ে।

ফিরে এসে মাধব ঘোষকে ডাকলাম। বললাম, দেখ, আজ তোমার আমার দুজনেরই খুব বিপদ। কি বিপদ তা আমি তোমাকে বলব না। তোমার জেনেও কাজ নেই। মোট কথা আজ আর তুমি বা তোমার বাড়ির কেউ বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে পা দেবে না। চুপ করে বাড়িতে বসে ভগবানের নাম কর। আর আমাকে এক ঘটি জল এনে দাও তো—

মাধবের মুখ শুকিয়ে আরো ছোট হয়ে গেল। দৌড়ে এক ঘটি জল নিয়ে এল সে। আমি সাধুর দেওয়া গাত্রবন্ধনের মন্ত্র দিয়ে জলটা শোধন করে বাড়ির চারদিকে ঘুরে ছিটিয়ে গণ্ডি কেটে দিলাম।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম বিপদ শুধু আমার আর মাধবের। কাপালিক আমাকেও ছাড়বে না। আজ অমাবস্যা, আজই সে আমাদের দুজনকে বেতাল পাঠিয়ে শেষ করবে। অন্যরা হয়তো নিরাপদ! তবু সাবধানের মার নেই জেনে সারাবাড়ির চারদিকেই গণ্ডি দিয়ে দিলাম।

রাত্তিরে খাওয়া হলে আমি মাধবকে ডেকে বললাম, তুমি আমি আজ এক ঘরে থাকব। বাড়ির সবাই শুয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ঠাকুরমশাই।

—বেশ, এস আমার সঙ্গে।

ঘরে গিয়ে আমি মাধবকে বললাম, ওই ঘটি থেকে খানিকটা জল ঢাল মাটিতে। এই যে, খাটের পায়ার কাছে—এইখানটায় ঢাল—আচ্ছা, এবার ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে ওই জল থেকে রেখা টেনে খাটের চারদিকে একটা জলের গণ্ডি কাট। নাও, শুরু কর, আমি তোমার সঙ্গে মন্ত্র পড়তে পড়তে ঘুরছি। তুমি গৃহস্বামী, তোমাকেই করতে হবে। নইলে আমি করে দিতাম।

সেই গণ্ডির ভেতরে খাটে উঠে আমরা দুজন বসে রইলাম। সে কি ভয়ঙ্কর রাত। আমার বুকের ভেতরে এই বিচিত্র বিপদের ঘণ্টা বেজে চলেছে। কি যেন ঘটবে, কে যেন আসছে। আমার পাশে চুপ করে বসে মাধব।

ঠিক মাঝরাত পেরিয়ে যাবার পর হঠাৎ যেন একঝলক হাওয়ায় বাইরের আমবাগান কেঁপে উঠল। ঝড়ের সময় নয়, কিছু নয়—হাওয়া এল কোথা থেকে?

ক্রমে সেই হাওয়া বেড়ে রীতিমত ঝড়ে পরিণত হল। সমস্ত আমবাগান যেন ভেঙে পড়বে, বাড়ির জানলা-দরজা দড়াম দড়াম করে বন্ধ হতে আর খুলতে লাগল। বাড়ির ভেতর মেয়েরা শব্দ করে কেঁদে উঠল—আমি চেঁচিয়ে বললাম, কেউ বাইরে আসবেন না। সব ভেতরে বসে থাকুন।

ঝড়ের শব্দের মধ্যে কার যেন বীভৎস হুঙ্কার—বিকৃত জান্তব গলায় কে যেন অমানুষিক হুঙ্কার করছে। কে যেন ঝড়ের ছদ্মবেশে প্রাণপণ চেষ্টা করছে বাড়িতে ঢোকবার, বার বার অদৃশ্য কিসে বাধা পেয়ে ফিরে যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ এরকম চলার পর হঠাৎ ঝড়টা যেন এক মুহূর্তে থেমে গেল। আবার শান্ত আমবাগান, মৃদু হাওয়ায় বাড়ির কলাগাছের পাতা নড়ছে। যে বাড়িতে ঢোকবার চেষ্টা করছিল, সে যেন উদ্দেশ্য সফল হবে না বুঝে ফিরে গিয়েছে। আমার বুকের ভেতরে বিপদের ঘণ্টাও হঠাৎ থেমে গেল।

মাধব ঘোষ আতঙ্কিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি বললাম—আর ভয় নেই, বেঁচে গেলাম বোধ হয়।

সেদিন রাত্তিরটা আমরা খাটেই বসে রইলাম। পরের দিন সকালেই খবর পেলাম মাধবের মেয়ের জ্বর নেমে গিয়েছে। আমি সকালেই বিদায় চেয়েছিলাম, মাধব ঘোষ কিছুতেই ছাড়ল না। খালি বলে—আপনার দয়াতেই রক্ষা পেলাম। বেঁধে রাখতে পারব না জানি, তবু এ বেলাটা থেকে যেতেই হবে।

থেকে ভালই করেছিলাম। নইলে ঘটনার শেষটুকু জানতে পারতাম না।

বিকেলে মাধবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে প্রায় মাইলখানেক চলে এসেছি, দেখি ঘোড়ায় চড়ে এক দারোগাবাবু কোথায় যেন চলেছেন, পেছনে দুজন পাগড়ীওয়ালা সেপাই।

আমার কাছ দিয়ে যখন তাঁরা যাচ্ছেন, কি মনে হতে একজন সেপাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় চলেছ বাপু?

সেপাইটা বলল, সামনে বিরামখালিতে একটি শ্মশান আছে, জানেন? সেই শ্মশানে এক কাপালিক থাকত। সে খুন হয়েছে।

ধরা গলায় বললাম, খুন হয়েছে বোঝা গেল কি করে?

—মাথাটা নাকি একেবারে মুচড়ে উল্‌টোদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। অনেকে মিলে করেছে আর কি। একজনের কাজ না।

আমি তখন সব বুঝতে পেরেছি। কাপালিকই তো বলেছিল বেতাল বাধা পেলে ফিরে গিয়ে যে জাগিয়েছে তাকেই আক্রমণ করে। কি ভয়ঙ্কর মৃত্যু!

একবার তাদের সঙ্গে গিয়ে মৃতদেহটা দেখে আসবার ইচ্ছে হয়েছিল। পরে সে ইচ্ছে দমন করি। মনে মনে আমাদের গাঁয়ে দেখা সৌম্য সাধুকে প্রণাম জানিয়ে আবার রওনা দিলাম।

গল্প শেষ করে তারানাথ বললে, কি রকম শুনলে?

আমরা বললাম, ভালই।

পথে বেরিয়ে কিশোরীকে বললাম, বিশ্বাস হল?

সে-কথার জবাব না দিয়ে কিশোরী হেসে বললে, দিনটা তো ভাল কাটল?

বিকেল। তারানাথের বৈঠকখানার আড্ডা জমে উঠেছে। রোজ রোজ তারানাথের স্কন্ধে কণ্টকী ফল ভগ্ন করা উচিত নয় ভেবে আমি আর কিশোরী মোড়ের তেলেভাজার দোকান থেকে গরম গরম বেগুনী আর ফুলুরী কিনে নিয়ে এসেছিলাম। এখন শুধু শালপাতা কটা পড়ে আছে। ভেতর থেকে দ্বিতীয়বার চা-ও এসে উপস্থিত। তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে তারানাথ বলল—নাঃ, উড়েগুলো বেশ ভাল তেলেভাজা করে, বুঝলে?

কিশোরী বলল—সব কিছুর স্বাদ নির্ভর করে মনের অবস্থার ওপরে। আজ এখন আপনার কোনো কাজ নেই, বেশ নিশ্চিন্দি আড্ডার মেজাজ। এখন বাসি তেলেভাজা পচা বেসনের ঠাণ্ডা ফুলুরীও ভাল লাগবে। আবার মাথায় দুশ্চিন্তা থাকলে দেরাদুন চালের বিরিয়ানিও মুখে রুচবে না। তাই নয়?

তারানাথ মৃদু হেসে চায়ে চুমুক দিয়ে বলল—কথাটা তোমাদের পক্ষে সত্য হলেও আমার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ খাটে না বোধ হয়।

বললাম—কেন? আপনার এ ব্যাপারে বৈশিষ্ট্যটা কি?

—আছে। তোমাদের নিরাপদ তরঙ্গহীন জীবনে দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনা একটা অস্বাভাবিক অবস্থা। আর আমার সারাটা জীবনই কেটেছে নানা বিচিত্র ঘটনার ভেতর দিয়ে, সেখানে দুর্ভাবনা একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলেই গণ্য করতাম। রাত্তিরে একটা ভয়ানক কিছু ঘটবে জেনেও দুপুরে ভোজ খেতে বাধেনি।

পরপর কয়েকটা চুমুকে চায়ের কাপ শেষ করে নামিয়ে রেখে তারানাথ বহুদিন আগেকার কথা মনে পড়ে যাওয়ার সুরে বলল—ভোজ খাওয়ার কথা উঠলেই আমার রামদুলাল মিত্রের কথা মনে পড়ে যায়। তাদের বাড়ি অতিথি হয়ে কয়েক দিন যা খাওয়াদাওয়া করেছিলাম, তেমন সচরাচর কারও ভাগ্যে জোটে না।

কিশোরী বলল—বেড়াতে গিয়েছিলেন?

—আরে না না, আমার আবার বেড়াতে যাওয়া! গিয়েছিলাম কাজে। বিপদে পড়ে তারা ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। সে অনেক কাণ্ড!

বললাম—গল্পটা হোক বরং, শুনতে মন্দ লাগবে না মনে হচ্ছে।

তারানাথ মনে মনে একটু গুছিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করল।

বছর কুড়ি আগেকার কথা। মধুসুন্দরী দেবীর ব্যাপার মিটে গিয়েছে। বাড়িতে বসে ঘোরতর সংসার করছি। এর সঙ্গে হাত দেখি, কবচ দিই, মুখ দেখে ভাগ্যগণনা করি। আয় মন্দ হয় না, আবার খরচও হয়ে যায়। পয়সা জমাতে পারি নি কোন দিন। দেবী বলেই দিয়েছিলেন—অন্নের কষ্ট হবে না, কিন্তু ধনীও হতে পারব না।

একদিন সকালে বৈঠকখানায় বসে আছি, একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। কাঁচায়-পাকায় মেশানো চুল, বেশ বলিষ্ঠ ধাঁচের মাঝারি গড়নের চেহারা। পরনে দামী কাঁচি ধুতি, পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম। ডান হাতে অনেকগুলো পাথর বসানো আংটি। চেহারায় বড়মানুষীর ছাপ আছে। ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ।

ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনিই কি তারানাথ জ্যোতিষার্ণব?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কি দরকার বলুন?

ভদ্রলোক এগিয়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন—চেহারা দেখেই অবশ্য আন্দাজ করতে পেরেছিলাম।

বললাম—আহা থাক, হয়েছে। বসুন। কি চাই আপনার?

ভদ্রলোক বসে বললেন—আমার নাম রামদুলাল মিত্র। কোলকাতাতেই বড়বাজারের দিকে সামান্য ব্যবসাপাতি আছে। আপনাদের আশীর্বাদে মোটা ভাত-কাপড় হয়ে যায়। সম্প্রতি একটা বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। কিন্তু ঠাকুরমশায়, কি বিপদ তা আমি বলব না। শুনেছি আপনি মানুষের মুখ দেখে তার ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন। আপনি বলুন দিকিনি, আমার বিপদটা কি? কিছু মনে করবেন না, ঠিক লোকের কাছে এসেছি কি না তা তো আমার জানা দরকার।

ব্যবসাদার লোকের মত কথা বটে। আমি মনে মনে হাসলাম। এ লোক ঘরে ঢোকামাত্র আমি বুঝতে পেরেছি কি বিপদে পড়ে ও এখানে এসেছে। তবে মিথ্যে ভেল্‌কি দেখিয়ে লোককে চমকে দিতে আমার প্রবৃত্তি ছিল না বলে ওকে দিয়েই বলিয়ে নেবার চেষ্টায় ছিলাম। তা বাজিয়ে নিতে চায় যখন তখন আমার আর বলতে আপত্তি কি?

বললাম—বিপদ তো আপনার আপাতত তিনটি দেখতে পাচ্ছি। প্রথমত আপনার ব্যবসা হঠাৎ একটা টাল খেয়েছে, কেমন কি না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তারপর?

—এটার জন্য ভাবতে হবে না। এখানে বসেই বলে দিচ্ছি। আপনি নীল রঙের গণেশ গড়িয়ে পুজো করুন—আবার ব্যবসার মোড় ফিরবে।

রামদুলাল বললেন—আর?

—আপনার বাস্তুবিঘ্ন আছে দেখতে পাচ্ছি। বসতবাড়ি-সংক্রান্ত কোন গোলযোগে পড়বেন কিংবা পড়েছেন।

রামদুলাল চোখ বড় বড় করে বললেন—ধন্য! শুনেছিলাম, আজ চোখে দেখলাম। কিন্তু তিন নম্বরটা কি?

বললাম—বলবো? ওটা আপনি নিজেই মিটিয়ে নিতে পারবেন, আমার সাহায্য দরকার হবে না। কিছু টাকা এককালীন দিয়ে যাওয়া বন্ধ করুন।

রামদুলাল মাথা নিচু করে লজ্জিত মুখে বললেন—কি আর বলব ঠাকুরমশায়, প্রবৃত্তি বড় বলবান। অপরাধ করে ফেলেছি, এখন প্রায়শ্চিত্ত তো করতেই হবে। পাপ ছাড়ে না বাপকে।

বললাম—অনুতাপ যখন হয়েছে তখন পাপ আর নেই। ঘরে মা-লক্ষ্মী আছেন তো?

—আজ্ঞে তা আছেন।

—তাঁকে নিয়েই সুখী হতে হবে। মনে মনে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবেন।

—আজ্ঞে যা বলছেন করব। এখন আমার এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার পথ বলে দিন।

—খুলে বলুন।

রামদুলাল বললেন—ছোটবেলায় বড় কষ্টে মানুষ হয়েছি ঠাকুরমশায়। বাপ-মা অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন। কুলিগিরি করে, মাথায় মোট বয়ে, একটা-একটা করে পয়সা জমিয়ে ব্যবসা শুরু করি। প্রথম জীবনে থাকার জায়গা ছিল না, কখনও কখনও রাস্তায় শুয়েও রাত কাটিয়েছি। আজও আমার কোলকাতায় কোন বাড়ি নেই। বড় একখানা বাড়ি আস্ত নিয়ে থাকি বটে, কিন্তু সেটা ভাড়া-বাড়ি। বাড়ি কিনতে পারতাম, কিন্তু সত্যি বলতে কি, কোলকাতায় বাড়ি করতে ইচ্ছে যায় না। ছোটবেলায় গ্রামে মানুষ, আর কটা দিন পরে ছেলেদের হাতে ব্যবসা দিয়ে আবার গ্রামে গিয়ে বাস করব ঠিক করেছি। তা গত বছর শেষের দিকে এক দালাল খবর আনল রাজবলহাটের কাছে এক গ্রামে একটা খুব ভাল বাড়ি বিক্রি আছে। নতুন বাড়ি না হলেও সামান্য মেরামত করে নিলে নতুনের মতই দাঁড়াবে। সেখানকার জমিদারদের বাড়ি। জমিদার মারা গিয়েছেন, জমিদারি বিক্রি করে ছেলেরা কোলকাতায় উঠে আসতে চায়। বাড়িও আর রাখবে না, নামমাত্র দামে বেচে দিচ্ছে। দালালের মাধ্যমে দর করে বাড়ি তো কিনলাম ঠাকুরমশায়। অনেক আশার বাড়ি। কিন্তু এখন সে বাড়িতে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

বললাম—কেন, কি হয়েছে?

—আজ্ঞে বাড়িটায় অপদেবতার দৃষ্টি আছে। কেনবার পর আমরা সবাই কয়েকটা দিন থাকবার জন্য সেখানে গিয়েছিলাম। প্রথম দিনই আমার স্ত্রী কি দেখে রাত্তিরে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। জানলার কাছে নাকি ছায়ার মত কি দাঁড়িয়ে ছিল। অথচ দোতলার জানলা, কোন খাঁজ বা কার্নিশ নেই। চোর কিম্বা ডাকাত কি বেয়ে উঠবে? পরের দিন সন্ধ্যের দিকে আমার বড় ছেলে শচীদুলাল পায়খানা করতে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে বলল—বাবা, বাড়ির বাইরে কে বসে কাঁদছে বলুন তো? মেয়েছেলের গলা মনে হল—

কেমন সন্দেহ হওয়াতে তক্ষুনি চাকরবাকর নিয়ে লণ্ঠন জ্বেলে দেখতে বেরুলাম। পায়খানা বাড়ি থেকে একটু দূরে, উঠোন পেরিয়ে যেতে হয়। তার পরেই পাঁচিল। এদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঘুরে সেখানে পৌঁছে দেখি কোথাও কিছু না। পাঁচিলের পরেই ঘন ঝোপঝাড় আর আগাছার জঙ্গল। সেখানে বসে এই ভর-সন্ধ্যেয় কে কাঁদতে যাবে? কিন্তু কি বলব ঠাকুরমশায়, ফিরে আসতে গিয়ে পরিষ্কার শুনলাম কে যেন খুব আকুল হয়ে কাঁদছে, স্ত্রীলোকের গলা। খুব কষ্টের কান্না। আবার ফিরে যাই, আবার দেখি। নাঃ, কোথাও কিচ্ছু নেই। একবার মনে হল শব্দটা যেন বাড়ির ভেতর থেকে আসছে। কেমন ভয় ধরে গেল—এসব কি কাণ্ড? এমন হওয়া তো ভাল কথা নয়।

পরের দিন গিন্নীকে কোলকাতায় ফেরত পাঠালাম মেজ ছেলের সঙ্গে। আমি আর শচী আরও দুদিন থেকে গেলাম। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেবেলা সেই কান্নার শব্দ শুনেছি। আর, কি বলব, বাড়িটার মধ্যে যতক্ষণ থাকি মন যেন কেমন বিষণ্ণ হয়ে থাকে। বুকে যেন একটা পাহাড়ের মত

চাপ টের পাই। বাড়িটা ভাল নয় ঠাকুরমশায়। কিন্তু একগাদা টাকা খরচ করে কেনা বাড়ি—যাওয়া বন্ধ করলে তো পোড়ো হয়ে যাবে। অনেক শখ করে কেনা। এর কিছু উপায় হয়?

একটু ভেবে বললাম—আমাকে একবার নিয়ে যেতে পারেন সেখানে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা পারি বইকি। আর সত্যি বলতে কি, আমি জানতাম আপনি যেতে চাইবেন। আমার মনে হয়েছিল। আপনি ভাববেন না কিছু, আপনার যাতায়াত, খাওয়া-দাওয়া এবং গরিবের সাধ্যমতো দক্ষিণা আমি দেব। কবে যাবেন বলুন?

—আপনার কবে সুবিধা হয়?

—পরশু সকালে তৈরি হয়ে থাকবেন। আমি এসে নিয়ে যাব।

রাজবলহাট থেকে মাইল তিনেক দূরে মতিপুর গ্রাম। বিকেল তিনটে নাগাদ গিয়ে সেখানে পৌঁছলাম। নিতান্ত পাড়াগাঁ বটে, কিন্তু বাড়িখানা সত্যি দেখবার মত। বিরাট দোতলা বাড়ি। একটা বার-বাড়ি, একটা ভেতরের মহল। সব মিলিয়ে প্রায় তেইশ-চব্বিশখানা ঘর। কাছাকাছি আর অন্য বসতি নেই। মূল গ্রাম কিছুটা দূরে।

আদর করে রামদুলাল আর শচী আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল। কিন্তু কি জানো, বাড়িতে ঢুকেই আমার মনে হল—এখানে কোন গোলযোগ আছে। ঠিক কি যে হল, তা বলতে পারব না। তবে মনে একটা অস্বস্তির ভাব। চারদিকে বাতাস যেন এ বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে এসে আর বইছে না, একটাও পাখির ডাক নেই—গেরস্তর বাড়ি এমন শ্মশানের মত হবে কেন? ওই পাখির ডাক না শুনতে পাওয়াটা আমাকে সত্যি ভাবিয়ে তুলল। আমি দেখেছি মানুষের চেয়ে নিম্নস্তরের প্রাণীরা অশুভ প্রভাব সম্বন্ধে বেশি অনুভূতিপ্রবণ হয়। ভূমিকম্প হবার আগে পোষা পাখি খাঁচার মধ্যে ছটফট করে জানো? মোটের ওপর সেখানে পৌঁছে বুঝতে পারলাম রামদুলাল বাজে কথা বলেনি।

যাই হোক, চাকর তক্ষুনি হাত-পা ধোবার জল এনে দিল। জামা-কাপড় বদলে আমি, রামদুলাল আর শচী বৈঠকখানায় এসে বসলাম। কোলকাতা থেকে চাঙাড়ি করে একগাদা খাবার এনেছিল রামদুলাল। এবার চাকর সেগুলো আমাদের পরিবেশন করে দিল। প্রচুর খাঁটি ঘিয়ে ভাজা লুচি, আলুর দম, বড় বড় জোড়া সন্দেশ, ছানার মুড়কি ইত্যাদি। বেশ খিদে পেয়েছিল। এক নিঃশ্বাসে প্রচুর খেয়ে ফেলার পরে যখন একটা হাঁড়ি থেকে রাবড়ি বেরুল, ভয় পেয়ে বললাম—না, আর নয়। অনেক হয়েছে।

রামদুলাল হাত জোড় করে বলল—আজ্ঞে, কি আর এমন আয়োজন? খুদকুঁড়ো বই তো নয়। সামান্য একটু নিন। আপনার কথা ভেবেই আনা—

খাওয়া হলে রামদুলাল বলল—একটা কথা বলব।

—কি?

—কিছু বুঝতে পারছেন? বাড়িটায় কি সত্যি কোন দোষ আছে?

আসল কথা না ভেঙে বললাম—এখনই কিছু বলা কঠিন। দেখি আজ রাতটা।

সন্ধ্যের অন্ধকার যখন বেশ গাঢ় হয়ে এসেছে, তখনই আমি কান্নার শব্দটা শুনতে পেলাম। আমার সামনে বসেছিল রামদুলাল। দেখলাম তার মুখ নিমেষে রক্তহীন সাদা হয়ে গেল। আমাকে বলল—ওই, ওই শুনছেন? সেই শব্দ—

বেশি করে বলবার দরকার ছিল না। কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে একটা করুণ কান্নার শব্দ। স্ত্রীলোকের কান্নাই বটে। যেন খুব কষ্টে গুমরে গুমরে কাঁদছে। কোথা থেকে আসছে

শব্দটা? একবার মনে হচ্ছে বাইরে থেকে, আবার মনে হচ্ছে খুব বেশি দূরে নয়—কাছাকাছিই বসে কাঁদছে কেউ।

—বাবা!

দরজার কাছে শচীদুলাল এসে দাঁড়িয়েছে।—বাবা, শুনেছেন?

রামদুলাল কাঁপা গলায় বলল—শুনেছি, তুই ভেতরে চলে আয়।

বললাম—ভয় পেয়ো না, দাঁড়াও। আমাকে একটা লণ্ঠন দাও তো।

চাকরটাও ভয় পেয়ে চলে এসেছে। তার হাতে একটা হ্যারিকেন। সেটা নিয়ে ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বললাম—তোমরা এইখানে থাক। ঘর থেকে বেরিয়ো না। আমি একটু দেখে আসি।

কিন্তু দেখবটা কি? লণ্ঠন হাতে সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। আওয়াজের উৎস কোথায় ধরতে পারলাম না। এক এক সময় মনে হচ্ছিল যেন চারদিক থেকেই শব্দটা আসছে। এ কি ব্যাপার!

বৈঠকখানায় ফিরে আসবার পথে কান্নাটা থেমে গেল। ঘরে ঢুকে দেখি শচী আর রামদুলাল পাথরের মূর্তির মত চৌকিতে পা তুলে বসে আছে। ঝড়ে কাক মরলেও কেরামতি ফকিরের হয় জানো তো? আমার হল তাই। আমি লণ্ঠন হাতে বেরুবার একটু পরেই কান্নাটা থেমে যেতে ওদের দুজনের ধারণা হল আমিই তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাবে আওয়াজটা বন্ধ করেছি। আমাকে দেখে রামদুলাল বলল—ওঃ, কি ভয়ানক শব্দ। কি করে থামালেন ঠাকুরমশায়? ভাগ্যিস আপনি এসেছিলেন!

ব্যাপারটা বুঝে চুপ করে রইলাম। ওদের ভুল ভাঙিয়ে লাভ নেই। আমার ওপরে ভরসা করে যতটুকু সান্ত্বনা পায় পাক্ না।

রাত্তিরে ভেতর-বাড়ির বারান্দায় আসন পেতে বসে আবার এক বিপুল আয়োজনের সম্মুখীন হওয়া গেল। পুজোর পরাতের মত বড় বগী থালায় সরু চড়ুইপাখির নখের মত চালের ঘি-ভাত, ভেড়ার মাংসের কোর্মা, রুইমাছের কালিয়া, তিন-চার রকমের মিষ্টি।

বলরাম—করেছ কি! এত কখনও খাওয়া যায়? আর তাও বিকেলে ওই জলযোগের পর? তুলে নাও—এর অর্ধেকও আমি খেতে পারব না।

রামদুলাল বলল—আমার এই চাকরটি বড় ভাল রাঁধে। পাকা হাত। শুধু রান্নার জন্যই ষাট টাকা মাইনে দিয়ে ওকে রেখেছি। আপনাকে রেঁধে খাওয়াবে বলে ওকে নিয়ে এলাম। আপনি না খেলে আমরা কষ্ট পাব। এমন কিছু বেশি তো নয়, খেয়ে নিন।

খাওয়ার গল্প আর বার বার করব না। এই প্রসঙ্গেই রামদুলালের কথাটা মনে এল বলে তোমাদের ভোজের বহরটার একটু ইঙ্গিত দিলাম। এক কথায় এরপর দু-বেলা এরকম নানা বিচিত্র পদ তৈরি হতে লাগল আমার জন্য।

রাত্রেও শুয়ে ঘুম আসে না। একে চাপ খাওয়া হয়ে গিয়েছে, তার ওপর মনে কেমন একটা অমঙ্গলের ভাব। আমাদের গাঁয়ের সেই সাধুর কথা মনে আছে তো? সে বলেই দিয়েছিল, আমার এ ধরনের ক্ষমতা হবে।

পরদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। এইখানেই গল্পের আসল অংশের শুরু।

সকাল আটটা হবে। বৈঠকখানায় বসে আছি। রামদুলাল গিয়েছে স্নান করতে। শচী বাড়ি নেই। বিকেলে ক্ষীর দিয়ে কি একটা খাবার তৈরি হবে, তাই সে গিয়েছে খাঁটি দুধের সন্ধানে। বাড়ির ডানদিকের কোণে বারান্দার শেষে খুব সুন্দর একটা স্নানের ঘর আছে, জমিদার সখ করে বানিয়েছিল। তার মেঝে সাদা পাথরে বাঁধানো, বুক অবধি দেওয়াল মোজেক করা। কানাই চাকর

সকালে পুকুর থেকে স্নানের জল তুলে তাতে এনে রেখেছে। পুকুরেও অনায়াসেই স্নান করা চলত। কিন্তু নতুন বাড়ি কেনা হয়েছে, সব কিছু ব্যবহার করা চাই তো! রামদুলাল সেখানেই স্নান করছে।

হঠাৎ দরজার কাছে একটা আওয়াজ শুনে দেখি রামদুলাল এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। তার মুখ ভয়ে বিকৃত। বেচারি কাঁপছে ঠক্‌ঠক্ করে। স্নান করতে করতে মাঝপথে বেরিয়ে এসেছে বোঝা যাচ্ছে। কাপড় ভেজা, গায়ে জল—মোছবার সময় পায়নি। বললাম—কি হয়েছে? ভয় পেলে নাকি?

রামদুলাল প্রথমটা কথাই বলতে পারে না। এই সক্কালবেলা কি দেখে অত ভয় পেল ও? ধমকে বললাম—কি হয়েছে বলবে কিনা?

ও বলল—আমার সঙ্গে আসুন।

পেছন পেছন গেলাম। স্নানঘরের দরজার কাছে এসে ভেতরে মেঝের দিকে আঙুল দিয়ে কি দেখিয়ে রামদুলাল বলল—ওই, ওই যে—

প্রথমে কিছু বুঝতে পারলাম না। সাদা পাথরে বাঁধানো সুন্দর পরিষ্কার মেঝে। কি দেখাচ্ছে রামদুলাল?

তারপরে দেখতে পেলাম জিনিসটা।

মেঝের একটা পাথরের টালিতে যেন আবছা একখানা মুখ ফুটে উঠেছে। ঠিক পুরো মুখ নয়—মুখের আদল মাত্র। চেষ্টা করলে বোঝা যায়। স্ত্রীলোকের মুখ। কারণ লম্বা চুলের আভাস দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সে মুখ সুন্দর নয়। কেমন যেন ভাঙাচোরা অবয়ব। যেন কষ্টে মুখ বিকৃত করে আছে।

এ আবার কি? মেঝের পাথরে কে ছবি আঁকল? কি দিয়ে আঁকল?

রামদুলালকে জিজ্ঞাসা করলাম—এ ছবি এখানে কি করে এল?

—আজ্ঞে তা কি করে বলব?

—যখন বাড়ি কিনলে তখন ছিল না?

—আজ্ঞে বাড়ি কেনার কথা কি বলছেন, আজ সকালে কানাই জল তুলে রাখছিল, আমি দাঁড়িয়ে তদারক করছিলাম—তখনও ছিল না। এই এখন চান করতে করতে হাতফসকে সাবানটা পড়ে গেল, তুলতে গিয়ে একেবারে চোখাচোখি! কি হবে ঠাকুরমশায়? বড় শখের বাড়ি—

বললাম—আচ্ছা তুমি আগে স্নান শেষ করে নাও। ভয় নেই, আমি এই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ভয়ে ছিটকিনি না দিয়ে কোনমতে দরজা ভেজিয়ে বাকি স্নানটুকু সেরে বেরুল রামদুলাল। মানুষ ভয় পেলে কি রকম হয়ে যায় তা আজ দেখলাম। প্রথম দিন রামদুলালকে কত ব্যক্তিত্ববান পুরুষ বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু যা ধরাছোঁয়া যায় না, এমন অপ্রাকৃত ঘটনার সম্মুখীন হয়ে সে ব্যক্তিত্ব কখন বাতাসে উবে গিয়েছে।

বৈঠকখানায় বসে রামদুলাল বলল—এসেই ব্যবসার অবস্থা খারাপ যাচ্ছে! বাজারে অনেক দেনা। এক ব্যাটা মাড়োয়ারীকে প্রায় সত্তর হাজার টাকার মাল সাপ্লাই করেছিলাম—তার দরুণ বিল সে কিছুতেই দিচ্ছে না। কেবল আজ-কাল বলে ঘোরাচ্ছে। মাড়োয়ারীর সঙ্গে কি আমরা পারি? আমারই ভুল হয়েছিল ওখানে মাল দেওয়া। কি করব, লোভে পড়ে গেলাম। এখন যদি বিল না আদায় হয়, তাহলে আমার ব্যবসা ডুববে। নালিশ করে টাকা আদায় করতে করতে তো আর ব্যবসা থাকবে না। এদিকে এই চিন্তা, এত টাকা দিয়ে বাড়ি যদি বা কিনলাম—এখন তাতে বাস করতে পারছি না। আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে ঠাকুরমশায়।

বললাম—আরে দাঁড়াও। এত ব্যস্ত হলে চলবে কেন? ব্যবসায় লাভ-ক্ষতি, জোয়ার-ভাঁটা আছেই। ভেঙে পড়ার কিছু নেই। আর এ বাড়ির কথা বলি—আমার মনে হয় তোমাদের ভয়ের কিছু নেই।

—ভয়ের কিছু নেই?

—মনে হয়, না। ভেবে দেখ, যে আত্মাই এমন করুক না কেন, তার যদি তোমাদের ক্ষতি করবার ইচ্ছে থাকত, তাহলে সে তো তা অনায়াসেই করতে পারে। এতদিন চুপ করে আছে কেন?

রামদুলাল বলল—তাহলে ওই কান্নার শব্দ?

বললাম—হয়ত সেটা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য। সে হয়ত কিছু বলতে চায়।

—তাহলে এখন আমি কি করব?

—তুমি কিছুই করবে না। আমি আরও কয়েকদিন থাকব। দেখি কি হয়। যা করবার আমিই করব।

শচীদুলাল এসে স্নানঘরের মেঝেতে ছবিটা দেখল। তবে সে বাপের চেয়ে সাহসী। ভয় পেলেও মুখে কিছু বলল না।

রাত্তিরে আমি সাবধানের মার নেই বলে বড় একঘটি জল নিয়ে বাড়ির চারিদিকে ছিটিয়ে সাধুর দেওয়া সেই মন্ত্রে গণ্ডি দিয়ে রাখলাম। সেদিন রাত্তিরটা কারোই ভাল ঘুম হল না।

পরদিন সকালে উঠে আমি আর রামদুলাল গিয়ে দেখি স্নানঘরের মেঝেতে ছবিটা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এদিক-ওদিক দু-একটা রেখা বেড়ে গিয়ে এখন বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মুখখানা। সমস্ত মুখে একটা যন্ত্রণার চিহ্ন আঁকা। মুখ, নাক, চোখ যেখানে যা থাকার কথা ঠিক যেন সেখানে নেই। সমস্ত ছবিটা কে যেন টুকরো করে ভেঙে সামান্য অদলবদল করে বসিয়ে দিয়েছে। ফলে একটা অমানুষিক কষ্টের চিত্র ফুটে উঠেছে।

আমি এগিয়ে ভেতরে গিয়ে পা দিয়ে ঘষে ছবিটা মুছে ফেলবার চেষ্টা করলাম। কিছুমাত্র উঠল না। অথচ সাদা পাথরে কালোরঙের কিছু দিয়ে আঁকা জিনিসটা। তবে উঠছে না কেন? মনে হচ্ছে ছবিটা যেন পাথরের ভেতরে রয়েছে। বাইরে থেকে ঘষে তোলা যাবে না।

এরপর থেকে প্রত্যেক দিন ছবিটা একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। এখন বেশ বোঝা যায়, একজন অল্পবয়েসী মেয়ের ছবি। বেশ মিষ্টি দেখতে। কিন্তু কে যেন তাকে খুব অত্যাচার করেছে। ব্যথায়, কষ্টে তার মুখ বীভৎস হয়ে আছে। সত্যি, রামদুলালের আর দোষ কি? আমারই গা ছমছম করত সেদিকে তাকালে।

বেশ গরম পড়েছে। একদিন সন্ধ্যেবেলা আর সহ্য না করতে পেরে রামদুলালকে ডেকে বললাম—ওহে, তোমার কানাইকে বল তো একটু স্নানের জল দিতে। বড্ড গরম আজ, স্নান করে ফেলি—

—আজ্ঞে জল তোলাই আছে, আপনি চলে যান।

ঠাণ্ডা জল। আরাম করে গায়ে জল ঢালছি। পায়ের কাছে মেঝেতে সেই ছবিটা। এই তিন-চার-দিনে ছবিটা আমাদের অনেকখানি গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। না তাকিয়ে স্নান করে চলেছি। হঠাৎ আমার গা শিউরে উঠল।

সেই কান্নার শব্দটা!

এবার খুব কাছে। যেন এখানেই—এ ঘরেই কেউ কাঁদছে।

স্নানঘরে আমি একা। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। পায়ের কাছে পাথরে সেই মূর্তি আর বাতাসে করুণ কান্নার আওয়াজ।

গুমরে গুমরে কে যেন কাঁদছে কোথায়। তরুণী মেয়ের গলা।

বাইরে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে রামদুলাল—ঠাকুরমশায়, ঠিক আছেন তো?

বললাম—ঠিক আছি। ভয় নেই। যাও ঘরে গিয়ে বোস, আমি আসছি।

আওয়াজটা এ ঘরেই হচ্ছে বটে। যেন আমার পায়ের তলা থেকে আসছে। আমার মাথায় তখন একটা বুদ্ধি এসেছে। কি করতে হবে ভেবে ফেলেছি।

আমি স্নান সেরে বেরোবার আগেই কান্নার আওয়াজ থেমে গেল।

ঘরে এসে রামদুলালকে বললাম—আচ্ছা যখন এই বাড়ি কেনো, তখন মালিকরা তোমাকে এ ব্যাপারে কিছু বলেনি? বাড়িতে এ রকম কান্নার শব্দ শোনা যায় বা কিছু?

—না। তা বললে কি আর আমি বাড়ি কিনতাম?

—তা বটে। আচ্ছা তোমার বিশ্বাসী চাকর ক'জন আছে কোলকাতার বাড়িতে?

রামদুলাল ভেবে বলল—জনা দুই।

—তারা গোপন খবর চেপে রাখতে পারবে?

—তা পারবে। প্রাণ গেলেও তারা আমাকে বিপদে ফেলবে না।

—আর কানাই?

—কানাইও বিশ্বাসী।

বললাম—কাল শচীকে কোলকাতায় পাঠিয়ে সেই চাকর দুজনকে এখানে আনাও। কাজ আছে।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। পরের দিন শচী গিয়ে বাড়ি থেকে দুজন বলিষ্ঠ চাকরকে নিয়ে এল। তাদের নিয়ে স্নানঘরে গেলাম। রামদুলাল চুপ করে থাকতে জানে। এতক্ষণ কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। এবার বলল—কি হবে ঠাকুরমশায়?

—এখনই দেখতে পাবে। এ বাড়িতে শাবল আর কোদাল আছে?

—তা আছে।

—আনতে বল।

তিনজন চাকর শাবলের চাড় দিয়ে মেঝের কয়েকখানা পাথরের টালি তুলে ফেলতে তলার সুরকি আর মাটির সোলিং বেরিয়ে পড়ল। বললাম—মাটি খোঁড়।

হাত চারেক মাটি খোঁড়া হতে একজন চাকর হঠাৎ অস্ফুট আর্তনাদ করে হাতের কোদাল ফেলে দিয়ে কাঁপতে লাগল।

রামদুলাল গর্তের মধ্যে উঁকি দিয়ে ভীত গলায় বলল—ঠাকুরমশায়! এ কি ব্যাপার?

বললাম—কঙ্কাল তো?

—কোথা থেকে এল?

—পরে বলছি। আগে ওটা তুলতে বল।

আস্ত তোলা গেল না। তুলতে যেতেই হাড়গুলো খসে আলাদা হয়ে যেতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে মেঝেতে ছোট একটা হাড়ের স্তূপ হয়ে গেল।

এতক্ষণ বাদে কিশোরী বলল—তারপর?

—তারপর আর কি? সেই হাড় বস্তায় করে এনে গঙ্গায় ফেলে দেবার পর ও বাড়িতে আর কোনদিন কান্নার আওয়াজ শোনা যায়নি। রামদুলাল আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—কার কঙ্কাল ঠাকুরমশায়?

বললাম—এতদিন পরে তা আর বলা সম্ভব নয়। এদেরই পূর্বপুরুষদের মধ্যে কারও কাণ্ড আর কি! সেকালে জমিদাররা কি রকম অত্যাচারী হত জানোই তো? কাকে মেরে পুঁতে ফেলেছিল বলা কঠিন। বাড়ির বৌ হতে পারে, আবার গাঁয়ের মেয়েও হতে পারে। যেই হোক, তার আত্মা সদ্‌গতির জন্য কেঁদে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করত। গঙ্গায় দেওয়ায় মুক্তি পেয়ে গেল। আর হ্যাঁ, এ বাড়ি যারা তোমাকে বিক্রি করেছিল, তাদের ওপর রাগ কোরো না। তারা খুব সম্ভবত কিছুই জানে না। পূর্বপুরুষ যে অন্যায়টা করেছিল সে গোপনেই করেছে। সাক্ষী দাঁড় করিয়ে রেখে কেউ খুন করে না।

রামগোপাল বলল—ওরা কান্না শুনতে পেত নিশ্চয়, অথচ আমাকে বলেনি—সেটা তো একটা অপরাধ।

বললাম—ওরা কান্না শুনতে পেত কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

—কেন বলুন তো?

—যাদের পূর্বপুরুষের হাতে মেয়েটি মারা গিয়েছিল, তাদের হাতে মেয়েটির আত্মা হয়তো মুক্তি পেতে চায়নি। তাই বাড়ি বিক্রি হবার পর তোমার কাছেই মুক্তি চেয়েছে। যাও, এ বাড়িতে আর ভয় রইল না। বরং একটি আত্মা সদ্‌গতির অভাবে কষ্ট পাচ্ছিল, তার আশীর্বাদ পেলে।

রামদুলাল আমাকে আদর করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে পাঁচশোটা টাকা দিয়ে প্রণাম করল। আমি আপত্তি করেছিলাম, বাধা দিয়ে সে বলল—আপনি বুদ্ধি না দিলে আমরা কি মেঝে খুঁড়তে যেতাম?

এর দিন দশেক পরে রামদুলালকে আবার একবার দেখেছিলাম। আমার বাড়িতে এসেছিল দুই ছেলেকে নিয়ে, মুখে হাসি। বললাম—কি হে, কি খবর?

—আজ্ঞে, আত্মার আশীর্বাদ সত্যিই আছে।

—কি রকম?

রামদুলাল খুশির হাসি হেসে বলল—মাড়োয়ারী ব্যাটা গতকাল বিল পেমেন্ট করেছে।

তারানাথ গল্প থামাল। রাত বেড়ে চলেছে। রামদুলালের সত্তর হাজার টাকা হল বটে, কিন্তু আমাদের কাল আবার আপিস যেতে হবে। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে বাড়িমুখো রওনা হলাম।

তারানাথ বলল—রামরাম চৌধুরীর মৃতদেহ নিয়ে যখন গ্রাম থেকে বেরুলাম তখন দিনের আলো নিভে এসেছে। শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহ। সেবার বৃষ্টি হয়েছিল খুব, মাঠে-ঘাটে জল থৈ থৈ করছে। পথ পেছল, সারাদিন জল হয়ে সবে একটু ক্ষান্তি দিয়েছে। কিন্তু বিশেষ ভরসা পাওয়া গেল না, আকাশে মেঘের কোলে কোলে চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ—ঠাণ্ডা শিরশিরে বাতাস দিচ্ছে পুব দিক থেকে। গাঁয়ের মাতব্বর যতীন ঘোষাল ডেকে বলল—তাড়াতাড়ি পা চালাও হে সব, জল তো আবার এল বলে!

যতীন ঘোষাল বললে কি হবে, তাড়াতাড়ি পা চালাবার উপায় নেই কোনো। আলের ওপর দিয়ে রাস্তা, তারপর কিছুদুর গিয়ে মাইলখানেক মাঠ ভাঙতে হবে। এঁটেল মাটি বৃষ্টিতে ভিজে বিউলির ডালের মত হড়হড়ে হয়ে আছে, তাতে কাঁধের ওপর চৌধুরীমশায়ের দুধ-ঘি-খাওয়া শরীরের ভার। অনেক বয়েসে মারা গেলে কি হয়, রামরাম চৌধুরী বিশাল পুরুষ ছিলেন। যদি

পা হড়কায় এবং স্বর্গত চৌধুরীমশায় আমাদের কারও ওপরে পড়েন, তাহলে তাকেও এযাত্রা চৌধুরী মশাইয়ের সঙ্গী হতে হবে।

আমরা দলে রয়েছি পনেরো-ষোলো জন মানুষ। খাটিয়ার সামনের দিকে ডাইনে-বাঁয়ে কাঁধ দিয়েছেন রামরাম চৌধুরীর দুই ছেলে---ঘনরাম আর কৃষ্ণরাম। তাঁদের দুজনেরই বয়েস হয়েছে পঞ্চাশের ওপরে। কয়েক পা গিয়ে হাঁপিয়ে যাচ্ছেন, গাঁয়ের ব্রাহ্মণ ছোকরারা এগিয়ে পালা করে তাঁদের রেহাই দিচ্ছে।

চৌধুরীরা ঠিক জমিদার না হলেও আমাদের গ্রামের সবচেয়ে ধনী ভূস্বামী ছিলেন। ধনোপার্জনের ব্যাপারে রামরামের কোন নীতির বালাই ছিল না। সুদের ব্যবসাতেও প্রচুর টাকা করেছিলেন। রামরাম মারা গেলেও তাঁর খাতকদের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার কোন কারণ ঘটল না। ঘনরাম এবং কৃষ্ণরাম বৈষয়িক ব্যাপারে উপযুক্ত ছেলে। পিতৃব্যবসায় সমান তেজে বজায় থাকবে।

রামরাম চৌধুরী হঠাৎ মারা গেলেন। চুয়াত্তর বছর বয়েস হয়েছিল বটে, কিন্তু দিব্যি স্বাস্থ্য, সপ্তাহে দু-দিন পাঁঠার মুড়ো খান। দেড়সের দুধ জ্বাল দিয়ে আধসের করে সকালের জলখাবার। একটা গোটা ইলিশ কিম্বা ভরপেট খাওয়ার পর কুড়িটা বড়মাপের ল্যাংড়া আম তো কোনো ব্যাপারই ছিল না। জীবনে একটা চোঁয়া ঢেঁকুরও তোলেন নি। এইরকম মানুষ রামরাম তিন-চারদিন আগে খেতে বসে কয়েক গ্রাস মুখে তুলে তারপর খাওয়া থামিয়ে কেমন ভাবে যেন ভাতের থালার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বড় পুত্রবধূ কমলা, ঘনরামের স্ত্রী, পাশে বসে পাখা নেড়ে হাওয়া করছিলেন। শ্বশুরের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল দেখে তিনি মনে মনে শঙ্কিত হলেন। ভোজনবিলাসী বদমেজাজী লোক, কি ত্রুটি হল কে জানে। নিজের হাতে পাকা রুই মাছের কালিয়া, সরষে-বেগুন, পোস্তর বড়া—এসব করেছেন। রান্না খারাপ হলে সারাদিন এর জের চলবে।

মৃদু গলায় কমলা জিজ্ঞেস করলেন, রান্না কি ভাল হয়নি?

উত্তর না দিয়ে রামরাম গেলাসের জল দিয়ে পাতের ওপরেই হাত ধুয়ে ফেলে শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে কমলাকে বললেন, ঘনা আর কেষ্টকে আমার ঘরে আসতে বল—

এসব ঘটনা আজই সকাল থেকে ঘনরাম আর কৃষ্ণরামের মুখে শুনেছি। ঘনরাম খিড়কির পুকুরে ছিপ ফেলে বসেছিলেন, কৃষ্ণরাম বৈঠকখানায় বসে সামনের মোকদ্দমার সাক্ষীদের তালিম দিচ্ছিলেন। বাপের তলব আদালতের সমনের চেয়েও ভয়ানক—দুই ছেলে ধড়মড় করে উঠে ভেতরবাড়িতে হাজির হলেন।

শোবার ঘরে রাতের আগে আসেন না রামরাম। দু'ছেলে গিয়ে দেখলেন বাবা বিছানায় শুয়ে। ঘনরাম বললেন, কি হয়েছে বাবা?

—এখানে এসে বোস দুজনে।

—কি হয়েছে? শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

একটু চুপ করে থেকে রামরাম বললেন, আমার যেখানে যা আছে তোরা বুঝে নে, আমার আর বেশি সময় বাকি নেই।

অবাক হয়ে কৃষ্ণরাম বললেন—সে আবার কি? শরীর কি অসুখ বলে মনে হচ্ছে? বলো তো কালীগতি কবিরাজকে একটা খবর দিই?

—থাম্। এ কবিরাজ ডাকবার ব্যাপার নয়। আমি টের পেয়েছি আমার ডাক এসেছে। দুপুরবেলা খেতে বসে আমার মুখে ভাত তেতো লাগল।

—ভাত তেতো লাগল। তাতে কি? রান্না পুড়ে গিয়েছিল?

—না, এ সে-রকম তেতো না। এ অন্যরকম তেতোভাব। মানুষ মরবার আগে তার মুখে ধানের ভাত তেতো লাগে। তোরা সব বুঝে নে—নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবি না—আমি সব চুলচেরা ভাগ করে দিয়ে গেলাম। উইল রেজেস্ট্রি করা আছে। ওই দেয়াল আলমারি খুলে মোটা লম্বা খামটা নিয়ে আয় দেখি—

মোটামুটি এই ঘটনা। ছেলেরা বিষয়টাকে আমল দেয়নি। তিনদিন পর আজ সকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হচ্ছে দেখে কমলা ডাকতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন রামরাম ঘুমের মধ্যেই কখন পরপারে রওনা হয়েছেন।

সত্যি বলতে কি, লোক-দেখানো শোক কিছুটা করতে হলেও রামরামের মৃত্যুতে কেউই খুব একটা ব্যথিত হয় নি। ছেলেরা পঞ্চাশ পার করেও সম্পত্তির পুরো কর্তৃত্ব হাতে পাচ্ছিলেন না—প্রৌঢ় বয়েসে বাপের অধীন থাকা বড় কষ্টের। পুত্রবধূরাও শ্বশুরের বিখ্যাত মেজাজ ও সময় অসময়ে নানান উদ্ভট ফরমায়েস খাটা থেকে রেহাই পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। রাত বারোটার সময় হয়ত জেলেরা মাছ ধরে ফেরবার পথে সবচেয়ে বড় ইলিশখানা নামিয়ে দিয়ে গেল। তখন খাওয়াদাওয়া শেষ করে যে যার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। রামরাম ইলিশ হাতে ডাকাডাকি করে দুই পুত্রবধূকে ডেকে তুললেন। তারা ঘুমজড়িত চোখে ক্লান্ত-শরীরে বেরিয়ে এসে বলল—কি বলছেন বাবা?

—এই দেখ, কানাই জেলে কত বড় মাছ দিয়ে গিয়েছে। রাত্তিরেই রান্না করে খেয়ে না ফেললে এই গরমে পচে যাবে। যাও, উনুনে আঁচ দাও দেখি। ছোটবউমা মশলা বেটে ফেল। মাছটা কিছুক্ষণ পড়ে থাক—একেবারে তাজা ইলিশ খেতে ভাল লাগে না। একটু সময় গেলে স্বাদ হয়। যাও, জালা থেকে পাটনাই বালাম চাল সের দুই বের করে নাও। খোকাদের এখন ডেকে কাজ নেই। রান্না হয়ে গেলে ওরা উঠে খাবে এখন।

সময় যায়। উনুন ধরে গেল। মশলা বাটা হয়ে গিয়েছে। দুই বৌ গালে হাত দিয়ে বসে আছেন রান্নাঘরে। খড়ম পায়ে টানা বারান্দায় পায়চারি করছেন রামরাম। মাঝে মাঝে এসে মাছটার পেটে আঙুলের চাপ দিয়ে পরীক্ষা করছেন। দুই বৌ আশায় আশায় তাকাচ্ছেন শ্বশুরের দিকে। রামরাম মাথা নেড়ে বলেন, উঁহু, আরও এক টিপ্ বসবে।

আবার পায়চারি। আবার অপেক্ষা।

রাত তিনটেয় হয়ত হুকুম হল রান্না শুরু করবার।

কাজেই ঠিক সময়ে গেছেন রামরাম। আরও আগে গেলেও কেউ দুঃখ করত না।

দুপুরের মধ্যে দেহ নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারলে ভাল হত। কিন্তু বেলা ন'টা থেকে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি হল বিকেল অবধি। একটু করে থামে, সবাই মিলে বেরুবার উদ্যোগ করি, আবার ঝুপঝুপ করে শুরু হয়।

যতীন ঘোষাল বলল, আকাশের গতিক তো ভাল না। চৌধুরীমশায়, আবার বৃষ্টি আরম্ভ হলে বিপদ—

ঘনরাম উত্তর দিলেন, কি আর করা যাবে? গিয়ে তো পৌছোই—

কৃষ্ণরাম বললেন, সেখানে কোনো ছাউনি-টাউনি কিছু নেই? জল এলে মাথা বাঁচানো যাবে তো?

যতীন ঘোষাল বললেন, আহা, সে রয়েছে। কিন্তু সেটা তো বড় কথা নয়—আমরা না-হয় বৃষ্টিতে না ভিজলাম, কিন্তু জল হলে তো আর দাহ করা যাবে না। সারারাত বসে থাকলে মৃতদেহ বাসী হয়ে যাবে। বিপদ হল—

কৃষ্ণরাম বললেন, একটু পা চালিয়ে এগোন—

গ্রামের ধার দিয়েই নদী। শ্মশান নদীর ধারে হলেও গ্রামের কাছে নয়। নদীর উজানে মাইল দেড়েক গিয়ে তবে। সেখানে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে পেরিয়ে গেল।

কেউ কোথাও নেই। কাছে দূরে অপার্থিব স্বরে শেয়াল ডাকছে। মেঘ থমকে আছে সারাটা আকাশ ভরে। আমার তখন যদিও সতেরো-আঠারো বছর বয়েস, কিন্তু শ্মশানে সেই নিয়ে বোধ হয় পনেরো-কুড়িবার যাতায়াত হয়ে গিয়েছে। বলতে কি, শ্মশান জায়গাটা আমার কোনদিনই খুব একটা ভীতিকর বলে মনে হয় নি—বরং বেশ পবিত্র বলে মনে হত। কিন্তু সেদিন আমার কেমন যেন গায়ে কাঁটা দিতে লাগল। আজ এখানে যেন একটা খারাপ কিছু ঘটবে, একটা অমঙ্গলজনক কিছু দেখতে পাব।

শ্মশানবন্ধুদের জন্য একটা চালাঘর বাঁধা আছে। তার নিচে মৃতদেহ নামানো হল। ওসব দেশে দাহ করার কাঠ কিনতে পাওয়া যায় না। চৌধুরীবাড়ির চারজন চাকর মাথায় করে কাঠের বোঝা বয়ে আনছিল। ঘনরাম আর কৃষ্ণরাম তামাক খেতে লাগলেন। যতীন ঘোষাল দায়িত্ব নিয়ে কাজে লাগলেন—এই ছেলেরা! আর বসে কেন বাবা? চট্‌পট একটা লম্বা গর্ত খুঁড়ে কাঠ সাজিয়ে ফেলো—ভালোয় ভালোয় কাজটা হয়ে গেলে বাঁচি! আর বিশ্রাম করতে হবে না, দেখছ না আকাশের অবস্থা?

নিঃশব্দে কাজ হতে লাগল। কেবল পুরুত ভবেশ ভট্‌চাযের গুনগুন করে গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের পাঠ শোনা যাচ্ছে। আর হুঁকোর সুরসুর শব্দ।

আমরা ক'জন ক্লান্ত হয়ে চালাঘরের আড়ালে তামাক খেতে গিয়েছি—আমাদেরই বন্ধু হরেন, সে তামাক খায় না, একা চিতা সাজাচ্ছে। চালা থেকে বেশ কিছুটা দূরে চিতা সাজানো হয়েছে—যাতে বর্ষার জোরালো হাওয়ায় আগুনের ফুলকি উড়ে এসে না পড়ে। আমরা তামাক খেতে খেতে হঠাৎ শুনলাম হরেনের ভীত গলা—কে? কে রে ওখানে?

আমরা দৌড়ে গেলাম, চালার তলা থেকে ঘনরাম, কৃষ্ণরাম, যতীন ঘোষাল এরা সব বেরিয়ে এলেন। ঘনরাম তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভারী গলায় হেঁকে বললেন, কি হয়েছে হরেন?

কয়েকটা লণ্ঠন মাত্র সম্বল। বিরাট প্রান্তরের অন্ধকার তাতে আর কতটুকু দূর হয়? লণ্ঠন উঁচু করে তুলে দেখলাম হরেন ফ্যাকাশে মুখে পাশের ঝোপ-ঝাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

বললাম, কি হয়েছে রে?

পাংশু মুখে হরেন বলল, ওই ঝোপের মধ্যে কে দাঁড়িয়ে ছিল। স্পষ্ট নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনলাম। আমি চেঁচিয়ে উঠতেই জলা ভেঙে ওইদিকে পালিয়ে গেল।

শুনেই আমাদের গ্রামের সাহসী ছেলে বলে খ্যাত ঈশ্বর বাগচী হইহই করে একটা লাঠি হাতে ঝোপটার ওপর বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। একটা ব্যাঙও বেরুল না সেখান থেকে।

আমরা বললাম, কোথায় কি রে?

হরেন সাহসী বলে খ্যাত না হলেও নিতান্ত ভীতু নয়। দেখলাম সে ঠকঠক করে কাঁপছে। সে বলল, না ভাই, তোমরা বললে তো হবে না, পায়ের শব্দ আর নিঃশ্বাসের আওয়াজ আমি স্পষ্ট শুনেছি। একেবারে গা ঘেঁষে ওই জল-জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল।

যতীন ঘোষাল বললেন, আচ্ছা থাক্ থাক্, এখন কাজ শুরু করে দাও। আর তোমরাও বাপু বিদ্‌ঘুটে। অসময়ে তোমাদের ইয়ে চাগিয়ে উঠল। বন্ধুকে একলা ফেলে যাবার কি দরকার ছিল?

এত গোলমালেও একমাত্র ভবেশ ভট্‌চায গীতাপাঠ থামান নি। শান্ত হয়ে বসে একই ভাবে গুনগুন করে পড়ে চলেছেন—ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ—

ঘনরাম এবং কৃষ্ণরাম পিতার যা যা শেষকৃত্য সব করলেন। দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

যতীন ঘোষাল রামরাম চৌধুরীর কাছে বেশ কিছু টাকা ধারতেন। ছেলেদের সুনজরে থাকলে সেটা মাপ হয়ে যেতে পারে এই আশায় ক্রমাগত বলে চলেছেন, সেই থেকে বৃষ্টি আটকে আছে! হবে না কেন? কতবড় একটা পুণ্যবান মানুষ! তাঁর শেষ কাজে কি ভগবান বাধা দিতে পারেন? আহা, গ্রাম একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। অমন মানুষ আর হবে না—

আবার সব চুপচাপ। নলখাগড়ার বনে একটা শেয়াল ডেকে উঠল। জোলো হাওয়ায় শীত-শীত করছে। চৌধুরী ভাইদের ভুড়ুক ভুড়ুক হুঁকোর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আচম্কা আমাদের সকলের বুকের রক্ত হিম করে দিয়ে একটু দূরে জলার মধ্যে থেকে একটা বিকট অট্টহাসির আওয়াজ জেগে উঠল। সে হাসির মধ্যে স্বাভাবিক মানুষী উল্লাস নেই—যেন কোন বদ্ধ উন্মাদ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখটির সন্ধান পেয়ে হাসি আর চেপে রাখতে পারছে না। নির্জন শ্মশানের শ্রাবণরাত্রির একাকীত্বকে ওই অপার্থিব হাসি যেন আরো প্রেতায়িত করে তুলল।

ভয়ে সবার মুখ পাংশু হয়ে গিয়েছে, কারো মুখে কথা নেই। চিতা থেকে কাঠের গাঁট ফাটার ফট্‌ফট্ আওয়াজ ভেসে আসছে।

ঘনরাম স্থিরবুদ্ধি লোক, সবার আগে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তিনি বললেন, এগিয়ে দেখ না কি ব্যাপার—ভয় কি? না-হয় আমিও যাচ্ছি। লণ্ঠন নাও—

ঈশ্বর বাগচী লজ্জা পেয়ে বলল, না, ভয়ের কি আছে? তবে রাত্তিরে অমন আওয়াজ শুনে—বুঝলেন কি না?

লণ্ঠন নিয়ে আমরা সবাই যেদিক থেকে হাসির শব্দ এসেছিল সেদিকে এগিয়ে গেলাম। কিছু পাওয়ার আশা ছিল না। কিন্তু জীবনে মাঝে মাঝে বেশ অভাবনীয় ঘটনা ঘটে থাকে। আমরা এগিয়ে কাছাকাছি ঝোপগুলো লাঠি দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে দেখা শুরু করতেই দলের বিনোদ বলে একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলে উঠল, এ কি! তুমি কে?

সবাই ছুটে গিয়ে দেখি সেখানে হাঁটুসমান জলকাদায় ঝোপের মধ্যে একটা পাগলাটে চেহারার লোক দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে জ্বলন্ত চিতার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার চোখের মণিতে প্রতিফলিত হচ্ছে আগুনের শিখা। লোকটার রঙ কালো, গাল তোবড়ানো—গালে অনেকদিনের না-কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি, শীর্ণ দেহ। খালিগায়ে কেবলমাত্র একটা অধোবাস পরে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দাহকাজ দেখছে। কোন সন্দেহ নেই যে এই লোকটাই হেসে উঠেছিল।

ঈশ্বর বাগচী বলল, এই, তুমি এখানে কি করছ?

লোকটা কোন জবাব দিল না।

ওধার থেকে কৃষ্ণরাম বললেন, আঃ! ও জঙ্গলে দাঁড়িয়ে কিসের কথা হচ্ছে? কে ওটা? টেনে এদিকে বার করে আনো না—

লোকটাকে হাত ধরে টেনে খোলা জায়গায় নিয়ে আসা হল। সে কোন কথা বলছে না।

হরেন বলল, এই লোকটাই তখন ঝোপের মধ্যে ছিল নিশ্চয়। ব্যাটা মহা পাজী! অত করে ডাকাডাকি করা হল, তা কোনো সাড়াশব্দ নেই—

যতীন ঘোষাল বললেন—পাগল বোধ হয়, চোখের দৃষ্টি দেখছ না?

লোকটা এতক্ষণ আগুনের দিকে তাকিয়ে ছিল। এবার চোখ ফিরিয়ে প্রথমে ঘনরাম ও পরে কৃষ্ণরামের দিকে তাকাল।

হঠাৎ ঘনরাম বললেন, আরে! তুমি শ্রীপদ না?

কৃষ্ণরামেরও ভ্রূ কুঁচকে গেল। সম্ভবত তিনিও চিনতে পেরেছেন।

শ্রীপদ ঘনরামের দিকে তাকিয়ে তর্জনী নির্দেশ করে বলল, চিতার আগুন থেকে ফুলকি উড়ে গিয়ে তোমার বাড়ির চালে পড়বে—আমি বলে দিলাম। বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না। চিতার আলো ছড়িয়ে পড়বে তোমাদের বংশে—

সেই জনহীন শ্মশানে জ্বলন্ত শবের সামনে দাঁড়িয়ে বলা শ্রীপদর কথাগুলো ভয়ানক গুরুত্ব বহন করে আনল। ঘনরাম রাশভারী লোক, কারো সামনে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করবার মানুষ নন। তিনি বললেন, যা ভাগ্, পাগল কোথাকার! যতীন, তোমরা এটাকে ভাগাতে পারছ না?

যতীন ঘোষাল ইতস্তত করতে লাগলেন। কালো, রোগা শ্রীপদ চকচকে চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা দেহধারী প্রেতের মত—কোমড়ে কেবল একটা ন্যাকড়া জড়ানো। তার গায়ে আগুনের আভা চমকে চমকে উঠছে। নিতান্ত অকিঞ্চন একটা উন্মাদ। কিন্তু যতীন ঘোষাল বোধ হয় ভাবছিলেন যে গতবছরও এই মানুষটা গ্রামের সম্পন্ন চাষীগৃহস্থ ছিল। রামরাম চৌধুরীর সঙ্গে দেওয়ানী মামলা লড়তে গিয়ে জমি-জমা টাকা পয়সা সব গিয়েছে। সর্বস্বান্ত হবার পরও শ্রীপদর তেজ কমল না। শুধু ভিটেটুকু আর বিঘে দুই খাস জমি সম্বল করে লোকটা সমান দম্ভে মাথা উঁচু করে বেড়াতে লাগল। রামরাম চৌধুরীর এটা একেবারেই ভালো লাগল না। যার পেছনে লাগা হয়েছে তাকে একেবারে মাটির সঙ্গে না মিশিয়ে দিতে পারলে আর সুখ কি? যে সব বিষয়ে হেরে গিয়েছে সে পায়ে ধরে না কাঁদলে আর জেতবার আরাম কোথায়? এর মধ্যে পথে একদিন রামরাম এবং শ্রীপদের বেদম ঝগড়া হয়ে গেল। শেষের দিকে শ্রীপদ বলেছিল—যান যান চৌধুরীমশায়, আমরা চাষের কাজ জানি—আরো চার বিঘে রায়বাবুদের কাছ থেকে পত্তনি নিয়ে নিলে ভাতে মরব না। আপনার যা করবার করে নিয়েছেন, আর আপনাকে ভয় পাই না। আপনার চালের নিচেও থাকি না—নিজের বাড়িতে বসে শাক ভাত খাই। আমার নিজের ঘরে আমিই কর্তা—

রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজের চেয়ে পদে খাটো কারো সঙ্গে বাড়াবাড়ি করা রামরামের স্বভাব নয়। সেদিনের মত ঘটনাটা ওইখানেই মিটে গেল।

সপ্তাহখানেক বাদে শ্রীপদর বাড়িতে আগুন লাগল। শ্রীপদ সে সময় হাটে গিয়েছিল। সে ফেরার আগেই এক ঘন্টার মধ্যে সব শেষ। হাট থেকে ফিরে শ্রীপদ দেখল, তার বৌ আর একমাত্র ছেলে দুর্গাপদ উঠোনের জামরুল গাছটার নিচে চুপ করে বসে আছে। ছেলে কাঁদছে—বৌ পাথর। যেখানে তার বাড়ি ছিল, সেখানে কেবল কয়েকটা আধপোড়া খুঁটি দাঁড়িয়ে তখনও ধোঁয়াচ্ছে।

শ্রীপদ বৌয়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, কিছু বেঁচেছে?

—না।

—খাটের তলায় টিনের তোরঙ্গে সেই যা রেখেছিলাম?

—জানি না। বোধ হয় গলে গিয়েছে।

তারপর শ্রীপদর বৌ কেমন যেন চমকে উঠে সম্বিৎ ফিরে পাবার মত করে চারদিকে তাকাল—যেন সে এতক্ষণে টের পেল তার স্বামী এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। কোনো বিশেষ একদিকে না তাকিয়ে তার বৌ বিহুল গলায় বলল, কি আগুন! উঃ! হুস্ হুস্ করে জ্বলছে একেবারে।

শ্রীপদর বৌ পাগল হয়ে গেল। টিনের তোরঙ্গে তার সাধের কিছু সামান্য গয়না রাখা ছিল—তার মত অবস্থার মানুষের এতেই যথেষ্ট শোক হতে পরে। তার ওপর চোখের সামনে

সে নিজেদের বসতবাড়ি পুরো জ্বলে যেতে দেখেছে, সে ধাক্কাও সামলানো কঠিন। শ্রীপদও থাকলে তার কি হত বলা যায় না। এর পরের কিছুদিন শ্রীপদর বৌ একদম কথা না বলে চুপ করে বসে থাকত, কখনো কখনো বলত—উঃ! বড্ড আগুন! হুস্ হুস্ করে জ্বলছে। তার বাপের বাড়ির লোকেরা তাকে আর তার ছেলেকে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। বাপের বাড়ি থেকে আর ভালো হয়ে ফেরে নি শ্রীপদর বৌ। কিছুদিন পরে খবর পাওয়া গেল সে স্নান করতে গিয়ে নদীতে ডুবে মরেছে।

শ্রীবৎস-চিন্তার গল্পটা একেবারে অলীক নয়, মানুষের দুঃসময় পড়লে ভাগ্য-দেবতা তাকে অবনতির শেষ ধাপ অবধি না নিয়ে গিয়ে স্বস্তি পান না। বিপদ একবার ঘটতে শুরু করলে পর পর ঘটতে থাকে। বৌ মারা যাবার মাস দুই পরে শ্রীপদ খবর পেল কলেরার মড়কে পুরো মামার বাড়ির পরিবারের সঙ্গে তার ছেলেও মারা গিয়েছে। যে শ্রীপদ কয়েক মাস আগে একজন হাসিখুশি ফুর্তিবাজ মানুষ ছিল, দিনে চাষ ও রাতে সখের যাত্রাদলে গান গাইত, যে লোকটার গোয়ালে গরু, ক্ষেতে ধান ও বাড়িতে নম্র বৌ আর ফুলের মত শিশু ছিল—সে মানুষটা ভাগ্যের আশ্চর্য বিপর্যয়ে একটা মরা গাছের মত একেবারে শুকিয়ে গেল। তার বৌ এবং ছেলের মারা যাবার ব্যাপারে অবশ্যই রামরামের কোনো হাত ছিল না, থাকলেও পরোক্ষ— কিন্তু মনে মনে শ্রীপদ ঠিক করল রামরাম চৌধুরীই সমস্ত কিছুর জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী। শ্রীপদ আর উঠলও না, মাঠেও গেল না। কেমন খ্যাপা মত হয়ে গেল। সারাদিন নদীর ধারে বসে বিড়বিড় করে কি বলে, এর-ওর বাড়ি খেতে চায়। পাড়াগাঁয়ে তখন ভাত জিনিসটার অভাব ছিল না। শ্রীপদকে সবাই ভালবাসত—খেতে দিত। ক্রমে তার জমি হাতছাড়া হয়ে গেল, হাল-গরু অন্য লোকে নিয়ে গেল। এখন শ্রীপদ গ্রামের একজন চিহ্নিত পাগল। সবাই দয়া করে, খেতেও দেয়—কিন্তু সময় যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার সম্বন্ধে গ্রামের লোকের বেদনার বোধ কমে গিয়েছে। এটাই নিয়ম। মানুষ এইরকমই।

ভোলে নি শ্রীপদ। আজকের ব্যাপারে সেটা বোঝা গেল। তার অব্যবস্থিত মনের অসংলগ্নতার মধ্যেও কোথাও এই হাহাকারের সুরটুকু অনবরত বেজে চলেছে।

হঠাৎ ঘনরামের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া রক্ত গরম হয়ে উঠল। ভারী গলায় তিনি হেঁকে বললেন, সঙের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন যতীন? আমার পিতার পারত্রিক ক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে, তার সামনে এই পাগলটা যা-তা কথা বলছে—ছেলেদের বলো না ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে।

যতীন ঘনরামের বিরূপতা কোনো কারণেই অর্জন করতে চান না। তাছাড়া তিনি বোধ হয় ভাবলেন—এ লোকটা এখন পাগল, এককালে আলাপ ছিল বটে—কিন্তু এখন আর ওর কোন জ্ঞানগম্যি নেই। এখন ওকে ধাক্কা দিলে চক্ষুলজ্জায় বাধে না। যতীন ঘোষাল মুখে 'এই, হট্ হট্' গোছের একটা শব্দ করে শ্রীপদর দিকে তেড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপদ 'খবরদার'! বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, হঠাৎই দপ্ করে লাফিয়ে উঠল আগুনের শিখা। যতীন ঘোষাল থতমত খেয়ে থেমে গেলেন। শ্রীপদ ক্ষিপ্ত গলায় বলল, ওরে বড়লোকের পা-চাটা কুত্তা! আমাকে আর তোরা কেউ ধরতে পারবি নে! তারপর ঘনরামের দিকে তাকিয়ে বলল, বাপ মরেছে তাই কি, এই তো সবে শুরু! তোর বংশ লোপ পাবে—

যতীন ঘোষাল সাহস সংগ্রহ করে আবার এগুনোর আগেই শ্রীপদ ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা নদীর দিকে দৌড়ে গেল, পাড়ের কাছে একমুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়েই লাফিয়ে পড়ল জলে। বর্ষার খরস্রোতা নদী—কোথায় ভেসে গেল শ্রীপদ কে জানে! এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল ব্যাপারটা যে বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার আগে কেউ বুঝতেই পারল না কি হয়েছে। ঈশ্বর বাগচী বলল, আরে! শ্রীপদদা তো সাঁতার জানত না, মরে যাবে যে!

কেউই অবশ্য এগুলো না শ্রীপদর কি হল দেখতে। যা স্রোত। যে সাঁতার জানে না সে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই কোথায় ভেসে গেছে তার ঠিক কি? এছাড়া শ্রীপদর মত হতভাগ্য আর বেঁচে কি করবে—এমন ভাবনাও হয়ত কারো কারো মনে কাজ করে থাকবে।

ঘনরাম কেবল একবার বললেন—ন্যাকামো! সাঁতার জানে নিশ্চয়! নইলে আর ঝাঁপ দিতে সাহস হত না।

আর কোন বিভ্রাটের সৃষ্টি না হয়েই কাজ মিটে গেল। বৃষ্টি পড়ি-পড়ি করেও আটকে রইল। নদী থেকে মাটির কলসী করে জল এনে আমরা চিতা ভালো করে নিভিয়ে দিলাম। ভবেশ ভট্চায জল ঢালার সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগলেন, ঠাণ্ডা হোন চৌধুরীমশাই, ঠাণ্ডা হোন। পেছন ফিরে মাটির কলসীতে শাবলের বাড়ি মেরে ভেঙে দিলেন ঘনরাম। এবার ফেরা। কলসী ভাঙার পর আর পেছনে তাকাতে নেই।

গ্রামের দিকে হাঁটতে শুরু করার সময়েই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। গ্রামের লোক, আমরা কেউই ভিজতে ভয় পাই না। ঘনরাম আর কৃষ্ণরামের জন্য দুটো ছাতা এসেছিল, ভবেশ পুরুতও তার তলায় ঢুকে গেলেন। আমরা ভিজতে ভিজতে চললাম। এবার আর লণ্ঠন জ্বলছে না জলের জন্য। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমকে পথ দেখে নিচ্ছি। জনপ্রাণী নেই কোথাও। শেয়ালগুলোও বোধ হয় ভেজবার ভয়ে গর্তে ঢুকে বসে আছে।

অনেকটা চলে এসেছি, প্রায় আধ মাইল, হঠাৎ যতীন ঘোষাল যেন কেমন ভয়ার্ত গলায় বললেন, ও কি? কি হল ওখানে?

তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, এই ভয়ানক বৃষ্টির মধ্যেও রামরাম চৌধুরীর নিভিয়ে দেওয়া চিতা আবার দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে।

আমাদের মাথার ওপর ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, আমরা স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখছি ওই অলৌকিক দৃশ্য। যেভাবে আমরা আগুন নিভিয়ে দিয়ে এসেছি তাতে তা আর জ্বলে ওঠার সম্ভাবনা খুবই কম। আর এই প্রবল বর্ষণের ভেতর আগুন জ্বলছেই বা কি উপায়ে?

আমাদের গা বেয়ে জল পড়ছে। এত ভিজে গিয়েছি যে শুকোতে এক হপ্তা লাগবে মনে হচ্ছে। কতক্ষণ ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতাম জানি না, একসময় ভবেশ ভট্চায বললেন—কৃষ্ণরাম, চল। এ সময় পথে দেরি করতে নেই। ঈশ্বরের নাম নাও—ঈশ্বর পরমকারুণিক।

চৌধুরীবাড়ি পৌঁছে সবাই নিমপাতা দাঁতে কেটে লোহা ছুঁয়ে শুদ্ধ হলাম। এতরাতে এই বৃষ্টিতে আর কেউ বাড়ি গেল না, চৌধুরীদের বৈঠকখানায় বসে নানা গল্প হতে লাগল। ভেতরবাড়ি থেকে শ্মশানবন্ধুদের জন্য গৃহিণীরা আলাদা আলাদা কাঁসার জামবাটিতে ঘন দুধ, মর্তমান কলা, আখের গুড় আর চিঁড়ে পাঠিয়ে দিলেন ফলার করবার জন্য। ঘনরাম কিছু পরে বৈঠকখানায় এসে বসলেন। তাঁর মুখ গম্ভীর। যতীন ঘোষাল কয়েকবার সময়োচিত কি সব কথা বলতে গিয়ে তেমন সাড়া না পেয়ে দমে গিয়েছেন। ঘনরাম কেবল মাঝে মাঝে বলছেন, বাবার চিতা ফের জ্বলে উঠল কেন পণ্ডিতমশাই? কিছু বলতে পারেন? ভবেশ ভট্টাচার্য উত্তর দিচ্ছেন, ঈশ্বরকে ডাকো। কোনো প্রশ্ন করো না, তাঁকে বিশ্বাস করো—

কিছুদিন কেটে গেল। দুই ভাই বিষয়সম্পত্তির কাজ নিজেদের হাতে নিয়েছেন। দুজনে খুব ভাব, সম্পত্তি ভাগ করার প্রশ্ন ওঠে নি। তাছাড়া ঘনরাম অপুত্রক, তাঁর মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবেই তাঁর অংশ কৃষ্ণরামের ওপর বর্তাবে। কৃষ্ণরামের একটিমাত্র ছেলে—শিবরাম। সে বর্তমানে কলকাতায় থেকে কলেজে পড়ে। পিতার মৃত্যুদিনের ঘটনা আস্তে আস্তে সবাই ভুলে যাচ্ছে।

এ কাহিনীর কিছু কিছু ঘটনা পরে আমি লোকের মুখে শুনেছি, কারণ চৌধুরী বাড়ির ভেতরে কি ঘটছে তা বাইরে থেকে আমার জানা সম্ভব নয়। তবে একটা কথা ভুলে যাবার আগেই এখানে বলে রাখি, রামরামের মৃত্যুর দুদিন পরে গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল দূরে নদীর উজানে হবিবপুরের বাঁকে শ্রীপদর মৃতদেহ ভেসে উঠেছিল।

একদিন সন্ধ্যেবেলায়, তখন কাছারির আমলাদের ছুটি হয়ে গিয়েছে—ঘনরাম নিচে রয়েছেন, কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে এখনই ওপরে আসবেন। কৃষ্ণরাম দোতলার বারান্দায় কুশাসন পেতে আহ্নিকের উদ্যোগ করছেন, হঠাৎ নিচে থেকে দাদার ক্রুদ্ধ গলা শুনতে পেলেন। ঘনরাম যেন রেগে গিয়ে কাকে বলছে—না! না! যাও—

তখনো আহ্নিক শুরু করেন নি, একটু অবাক হয়ে পায়ে পায়ে নিচে নেমে এলেন কৃষ্ণরাম। দেখলেন একতলার টানা বারান্দায় একটা মোটা থামের পাশে অন্ধকারের মধ্যে ঘনরাম দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর মুখ পাংশু। আশেপাশে আর কেউ নেই। বিকেল পাঁচটা-সাড়ে-পাঁচটায় কাছারি শেষ হবার পর এই সময়টা চারকবাকরদেরও একটু ছুটি থাকে। তারা বাগানের শেষে নিজেদের ঘরে বসে হয়ত তামাক খাচ্ছে। তাহলে কাকে বকছিলেন ঘনরাম?

—কি হয়েছে দাদা?

ঘনরাম প্রথমে কোনো উত্তর দিলেন না। কৃষ্ণরাম বললেন, চল, ওপরে চল—

দাদার হাত ধরে ওপরে আনবার সময় কৃষ্ণরাম লক্ষ্য করলেন দাদার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ঘরে এনে দাদাকে বসিয়ে কৃষ্ণরাম বললেন, কি ব্যাপার? চেঁচালে কেন?

নিতান্ত সংকটেও ঘনরাম নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করতে লজ্জা পেতেন। একটু ইতস্তত করে বললেন, শ্রীপদকে দেখলাম।

আশ্চর্য হয়ে কৃষ্ণরাম বললেন, শ্রীপদ! সে কি কথা? কোথায়?

—কাছারি শেষ করে ওপরে আসছি, একতলার বারান্দায় উঠতেই একটা থামের পেছন থেকে বেরিয়ে এল। সেই চেহারা, বুঝলি? সেদিন যেমন দেখেছিলাম—

—কিন্তু তা কি করে হবে দাদা? আমাদের সামনেই তো—পরে দেহও ভেসে উঠেছিল, সে খবর তো জানো? তুমি আলো-আঁধারিতে ভুল দেখেছ—

ঘনরাম দৃঢ় গলায় বললেন, না, আমি ঠিকই দেখেছি। শ্রীপদ আমার সঙ্গে কথাও বলল।

—কথা বলল? কি রকম?

—সেদিনের মত আঙুল তুলে আমাকে বলল, চৌধুরীমশাই, মনে আছে তো?

কৃষ্ণরামের গা ছমছম করে উঠল। ঘনরাম বললেন, কেষ্ট, তুই কলকাতা থেকে শিবুকে আনিয়ে নে, কিছুদিন বাড়িতে রাখ্। লোকের আশীর্বাদ ফলে না, কিন্তু অভিশাপ ফলে যায়। বাড়ির ছেলে বাড়িতে এসে থাকুক—

বাবার জরুরি তার পেয়ে শিবরাম বাড়ি এল। সে আধুনিক ছেলে, এসব কুসংস্কারে তার বিশ্বাস নেই। তবু বাবা-জ্যাঠার সঙ্গে তর্ক না করে মাসখানেক দেশের বাড়িতে রয়ে গেল।

আঘাতটা এল অন্য দিক দিয়ে।

শিবরাম বাড়ি আসার সাত-আটদিন পর চৌধুরীবাড়িতে আগুন লাগল। মুল বাড়ি পাকা, আগুনের আঁচে কিছু ক্ষতি হলেও বড় রকমের বিপর্যয় কিছু হল না। কিন্তু উঠোনের দশ-বারোটা ধানের গোলা পুড়ে একদম ছাই হয়ে গেল। সব-মিলিয়ে প্রায় চারশো মণ ধান। পাড়াগাঁয়ে দমকল থাকে না, আগুন দেখে আমরা দৌড়ে গেলাম, সমস্ত গ্রাম ভেঙে পড়ল। পেছনের দীঘি থেকে বালতি বালতি জল নিয়ে ছুঁড়ে দেওয়া হতে লাগল অগ্নিকুণ্ডের ভেতরে— কিন্তু আগুন

ততক্ষণে বেশ ভালরকম ধরে উঠেছে, দু-এক বালতি জলে কিছু হবার নয়। লম্বা লাইন করে দাঁড়িয়ে আমরা জলের বালতি হাতে হাতে আগুনের কাছে পৌছে দিচ্ছিলাম। আমার পাশে ছিল হরেন, সে বলল—একটা ব্যাপার কিন্তু অদ্ভুত, বুঝলি?

বললাম, কি?

—সবগুলো গোলায় একসঙ্গে আগুন ধরলো কিভাবে? একেবারে গায়ে গায়ে তো দাঁড়িয়ে নেই। আশ্চর্য! এ যেন মনে হচ্ছে কেউ নুড়ো হাতে সবগুলোতে আগুন দিয়ে বেড়িয়েছে। হ্যাঁরে তারানাথ, চাকরগুলোর ভেতর কেউ করেনি তো?

—যাঃ, তা কেন করবে?

—কোন কারণে হয়ত মালিকের ওপর রাগ আছে।

—না রে। এরা সবাই পুরনো আর বিশ্বাসী লোক। দেখছিস না মালিকের এতবড় ক্ষতি হয়ে গেল বলে সবাই সার দিয়ে বসে কাঁদছে। এরা কেউ নয়—

—তা হলে?

—জানি না।

ধন্য ঘনরামের স্থৈর্য! চুপ করে দাঁড়িয়ে তিনি আগুনের বিধ্বংসী কাণ্ড দেখলেন। তাঁর মুখ দেখে এমন কি যতীন ঘোষালও কোনো সমবেদনার কথা বলতে সাহস করল না।

আগুন যখন প্রায় নিভে এসেছে, ঘনরাম ভৃত্যদের মধ্যে কাউকে হাঁক দিয়ে বললেন, এই, কে আছিস? বাড়ি থেকে গোটাকতক সুপুরি নিয়ে আয় তো—

যতীন ঘোষাল ভয়ে ভয়ে বললেন, সুপুরি কি হবে চৌধুরীমশাই?

ঘনরাম উত্তর দিলেন না।

কে একজন কাগজের ঠোঙায় সুপুরি নিয়ে এল। ঠোঙা হাতে ঘনরাম ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক নিভে আসা অগ্নিকুণ্ডে দু-একখানা করে সুপুরি ছুঁড়ে দিতে লাগলেন। কৃষ্ণরাম এগিয়ে এসে ভীত গলায় বললেন, এসব কি হচ্ছে দাদা?

ঘনরাম ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে শুকনো হাসি হাসলেন। বললেন, আগুনকে দিচ্ছি। সবই তো খেলো, এবার একটু মুখশুদ্ধি করুক—

কৃষ্ণরাম হাত ধরে দাদাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন!

এরপর ঘনরাম জেদ ধরলেন শিবরামের বিয়ে দেবেন। দাদার জেদ দেখে বিপন্ন হয়ে কৃষ্ণরাম বললেন, কিন্তু দাদা, শিবু এখনো পড়ছে। এ সময়ে বিয়ে দিলে ওর পড়াশুনো আর হবে না—

ঘনরাম ভাইয়ের আপত্তিতে কান দিলেন না। বললেন, বোকামি করিস না কেষ্ট। বুঝে দেখ্, আমাদের বংশের বৃদ্ধি নেই একদম! ওই শিবুই যা কিছু—তোর-আমার ভালোমন্দ কিছু হলে শিবু ভেসে যাবে। ওকে তাড়াতাড়ি সংসারী করে দেওয়াই ভাল।

শিবরামের বিয়ে হয়ে গেল।

এর বছরখানেক পরে এক জ্যোৎস্নারাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পরে পান মুখে দিয়ে শুতে এসে একবার জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন ঘনরাম। পিক ফেলবার জন্য জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ঘনরাম দেখলেন বাগানে নতুন লাগানো কলমের আমগাছটার নিচে চাঁদের আলোয় ক্ষুধিত দৃষ্টি নিয়ে শ্রীপদ দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর দিকে তর্জনী নির্দেশ করে শ্রীপদ বলল, মনে আছে তো?

তাঁর ডাকে কমলা ছুটে এলেন।—কি হয়েছে গো?

—দেখ দেখি বাগানে আমগাছের তলায় ও কে দাঁড়িয়ে?

কমলা তাড়াতাড়ি জানালার কাছে গেলেন!—কই, কেউ নেই তো?

ঘনরাম বিহ্বল গলায় বললেন, নেই? তাহলে কোথায় গেল?

—কে?

—যে দাঁড়িয়েছিল ওইখানে?

ভীত কমলা স্বামীকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

সেদিন ছিল শুক্লা ত্রয়োদশী।

কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীতে ঘনরাম মারা গেলেন। মাত্র তিপ্পান্ন বছর বয়েস হয়েছিল তাঁর।

কৃষ্ণরাম ভয় পেলেন কিনা জানি না, কিন্তু কেমন যেন উদাস মত হয়ে গেলেন।

সময় গড়িয়ে যেতে লাগল। বছর দুই পরে একটি ছেলে হল শিবরামের। এই সময়টা আমি গ্রামে ছিলাম না, সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গ করে বেড়াচ্ছিলাম শ্মশানে-মশানে! এই সময়ে বীরভূমের এক শ্মশানে মাতু পাগলীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়—সে গল্প তো তোমরা জানো!

ঘনরাম মারা যাবার পর বছর দশেক আর কোনো ঘটনা ঘটল না চৌধুরী বাড়িতে। বাড়ির এবং গ্রামের লোকেরাও আগের সমস্ত ঘটনাকে নেহাত সমাপতন বলে মেনে নিল।

কৃষ্ণরামের বয়েস এখন ষাট। একদিন দুপুরে বসে তিনি কি সব কাগজপত্র দেখছেন, বেলা আড়াইটে-তিনটে, ঝাঁ ঝাঁ করছে চৈত্রমাসের দুপুর—তাঁর আট বছরের নাতি বলরাম এসে বলল, দাদামশাই, একটা লোক আপনাকে খুঁজছিল—

কৃষ্ণরাম বললেন, কে রে? কোথায়?

—বাইরে। আপনার নাম করে বলছিল—

কৃষ্ণরাম একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, যা, এখানে নিয়ে আয়। তোর মামার বাড়ির কেউ না তো—

—নাঃ, তাদের সবাইকে আমি চিনি। এ লোকটা ভিখিরিমতন, নোংরাপানা—

কৃষ্ণরাম রীতিমত অবাক হয়ে বললেন, ভিখিরি এসে নাম ধরে আমার খোঁজ করছিল?

—হ্যাঁ। কালোমত লোকটা, খালি গা। চোখদুটো দেখলে ভয় করে দাদামশাই! আমাকে দেখে একটা আঙুল তুলে লোকটা বলল—কৃষ্ণরামকে গিয়ে বোলো, তার মনে আছে তো? ও হ্যাঁ, লোকটা নিজের নাম বলল শ্রীপদ, শ্রীপদকে মনে আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে বলল। কে লোকটা দাদু?

বিবর্ণমুখে কাজ ফেলে নাতিকে কোলে নিয়ে ভেতরবাড়িতে উঠে গেলেন কৃষ্ণরাম।

এক মাসের মধ্যে সন্ন্যাসরোগে কৃষ্ণরাম গত হলেন।

দেশের জমিজমা ভাগচাষীদের দিয়ে ছেলে-বৌ আর মাকে নিয়ে শিবরাম কলকাতায় চলে গেল। সেখানে সে বড় চাকরি করে। আধুনিক ছেলে, চাষবাসে বা বিষয়কর্মে তার তেমন উৎসাহ নেই। কমলাও সঙ্গে গেলেন।

এ কাহিনী বলতে আমার ভালো লাগছে না। রামরামের মৃত্যুর পর থেকে সবটাই মরে যাবার, উড়ে-পুড়ে যাবার ইতিহাস। যতই দোষ থাক, কিছু মানুষ খুব কষ্ট পাচ্ছে—এ দেখতে বা ভাবতে ভালো লাগে না। তবু শুরু যখন করেছি, শেষ অবধি বলি।

কৃষ্ণরাম সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করার পর বছরদশেক সব শান্ত। গল্প বলার সময় দশ বছর কথাটা এক নিঃশ্বাসে বলা গেলেও দশ বছর কাটতে ঠিক দশ বছরই লাগে। এই দীর্ঘ সময়ে পারিবারিক অভিশাপের স্মৃতিটা আবছা হয়ে এল। মানুষ দুঃখের স্মৃতি ভোলবারই চেষ্টা করে, বা একটা অবচেতন প্রচেষ্টা সব সময়েই থাকে—তার সঙ্গে কালের ব্যবধান মিলে চৌধুরী পরিবার থেকে কালো ছায়াটা একেবারে মুছে গেল।

এখন বলরামের বয়েস ষোলো, শিবরামের বয়েস বছর চল্লিশ। কলকাতায় যে বাড়িটা ভাড়া নিয়ে শিবরাম ছিল, তার তিনদিকে ঘর মাঝখানে উঠোন। উঠোনে চৌবাচ্চা। স্নান করা, বাসনমাজা বা কাপড়কাচা ইত্যাদি উঠোনেই সারা হয়। উঠোন থেকে রোয়াকে ওঠবার সিঁড়িতে বড্ড উঁচু উঁচু ধাপ। কমলা আর নিরুপমার (কৃষ্ণরামের স্ত্রী) বয়েস অনেক হল, অত উঁচু ধাপ ভেঙে বারান্দায় উঠতে কষ্ট হয়! শিবরাম জনাতিনেক মিস্ত্রি ডাকিয়ে পুরনো সিঁড়ির দু-দিক দিয়ে নতুন করে কয়েকটা ধাপ গাঁথাবার ব্যবস্থা করল। সেদিন তার অফিসে জরুরি কাজ আছে, না গেলেই নয়। অফিস থেকে সন্ধ্যেবেলা ফিরে শিবরাম দেখল গাঁথনির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। বলরাম বলল, তোমার আজ ফিরতে দেরি হল বাবা?

—হ্যাঁ, কাজের চাপ ছিল। মিস্ত্রিরা গেল কোথায়?

—কাজ শেষ করে জলখাবার খেতে গিয়েছে। আমি বলে দিয়েছি তুমি এলে আসতে—

—বেশ করেছিস। তুই ওপরে গিয়ে একটা লণ্ঠন নিয়ে আয় দিকি, হাত-মুখটা একেবারে ধুয়েই নি—

বলরাম ওপরে যেতেই মিস্ত্রিদের একজন এসে দাঁড়াল উঠোনে। শিবরাম বারান্দা থেকে বলল, কত মজুরী দেব হে? একটা দর ঠিক করে দাও—

খালি-গা লোকটা, কোমরের কাছে যেমন-তেমন করে একটা কাপড় জড়ানো, জ্বলজ্বলে দুই চোখ তুলে বলল, আমাকে মনে আছে তো? মনে করিয়ে দিতে এলাম—

শিবরামের ভয়ার্ত চিৎকারে বলরাম দৌড়ে নেমে এল লণ্ঠন হাতে। কি হয়েছে বাবা? কি হয়েছে?

শিবরাম ফ্যালফ্যাল করে চারদিকে তাকিয়ে বলল, একেবারে চোখের সামনে উবে গেল লোকটা—এ কি!

—কে উবে গেল? কে এসেছিল?

কমলা আর নিরুপমাও পেছন পেছন নেমে এসেছিলেন, তাঁরা এই পরিবারের এই লক্ষণ বহুদিন থেকে দেখছেন। নিরুপমা কেঁদে উঠে শিবরামকে জড়িয়ে ধরলেন, কমলা দুর্গানাম জপ করে সারাগায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। সবাই ধরে বিহ্বল শিবরামকে দোতলায় নিয়ে গেল।

খানিক পরে মিস্ত্রিরা এলে বলরাম নিচে এসে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মধ্যে কেউ কি একটু আগে এসেছিল?

তারা অবাক হয়ে বলল, না তো, আমরা তো এই চা-বিস্কুট খেয়ে এলাম। কেন বাবু?

—না, কিছু না।

ভয়ে ভয়ে কিছুদিন যাবার পর বোঝা গেল শিবরামের প্রাণের আশঙ্কা বোধ হয় নেই। তার থেকেও বড় ক্ষতি এবার হয়ে গিয়েছে।

শিবরাম আজকাল চুপচাপ বসে থাকে, অফিস যেতে চায় না। মাঝে মাঝে কেবল বলে ওঠে, তাহলে আর বাকি রইল কি? জলজ্যান্ত মানুষই যদি উবে যেতে পারে, তাহলে আর কি বাকি রইল?

অদ্ভুত এক বাতিক গড়ে উঠল তার—সবকিছু ঢাকা দেবার বাতিক। টাকা পয়সা, জুতো, খাবারদাবার—সব ঢাকা দিয়ে বেড়ায় সারাদিন। বলরাম গিয়ে বাবার হাত ধরে, ছিঃ, ওদিকে চল তো। কি হচ্ছে কি?

শিবরাম ব্যস্ত হয়ে বলে, আরে দাঁড়া দাঁড়া, এটুকু ঢেকে দিয়ে যাই—আজকাল সবকিছু কর্পূরের মত উবে যাচ্ছে।

মাঝরাত্রে স্ত্রীর গায়ে লেপ নামিয়ে এনে চাপা দেবার চেষ্টা করে। স্ত্রী ভয় পেয়ে বলে, করছ কি?

—লেপটা নিয়ে এলাম তাক থেকে নামিয়ে। যা দিনকাল পড়েছে, চাপা দিয়ে শোও—কে কখন উবে যায় ঠিক কি?

তারপর সস্নেহে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি না হলে আমার চলে না যে! চাপাচুপি দিয়ে থাকো। আমি দেখে আসি খোকার গায়ে ঢাকা আছে কি না—

স্ত্রীর চোখে জল আসে। হাত ধরে স্বামীকে জোর করে বসায়, বোসো দেখি, এই গরমে আর বলুর গায়ে লেপ দিতে হবে না—

—গরম তাই কি, ছেলে যদি উপে যায়?

বাতিক বাড়তে লাগল। প্রথমে তবু কথা বলত শিবরাম, তারপর ক্রমে কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়ে এল। একদিন একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। রয়ে গেল শুধু সবকিছু ঢাকা দিয়ে বেড়াবার বাতিক।

দেহ ফেলে রেখে শিবরামের চেতনা পূর্বপুরুষের কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে কোথায় গেল কে জানে!

এ অবস্থায় আর কলকাতায় থাকা চলে না। শিবরাম আর উপার্জন করে না, কলকাতার খরচ চালাবে কে? দেশে যা জমি আছে তার আয়ে চলে যাওয়া উচিত, কিন্তু মালিক অনুপস্থিত থাকলে কে আর তার প্রাপ্য দিতে ব্যস্ত হয়? কাজেই মায়ে-ছেলেতে-ঠাকুমাতে মিলে পরামর্শ করে চৌধুরীপরিবার বেশ অনেক বছর পরে আবার গ্রামে ফিরে এল। বলরামের বি. এ. পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, এখন একটু বিষয়কর্ম দেখলে ক্ষতি কি?

এই সময়েই এই ঘটনার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে। আমার বয়েস তখন বছর পঁয়তাল্লিশ। মাঝে মাঝে গ্রামে আসি, আবার উধাও হয়ে যাই। দাড়িগোঁফ রেখেছি—তন্ত্রমতের সাধক বলে বেশ একটু খাতিরও হয়েছে। একবার বলরাম আমাকে ডেকে বলল, কাকাবাবু, আমাদের পারিবারিক দুর্ভাগ্যের কথা তো সবই জানেন, এর কোনো বিহিত হয় না?

বললাম, কি বিহিতের কথা বলছ?

—দেখুন, আমি কলকাতায় পিয়ার্সন সাহেবের ছাত্র ছিলাম, আজগুবী ব্যাপারে বিশ্বাস করতে মন চায় না। কিন্তু ঠাকুর্দা মারা যাবার সময় আমার নিজেরই অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল, আমিই ঠাকুর্দাকে বলেছিলাম শ্রীপদের কথা। তারপর বাবার এই অবস্থা—সবটাই কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দিতে পারছি কই? আমার মা-ঠাকুমা-জেঠিমার কথা ভাবুন তো? এই অভিশাপ কি কাটানো যায় না?

একটু ভেবে বললাম, অলৌকিক উপদ্রব দূর করবার জন্য একটা বিশেষ হোম করা যায়। তুমি ইংরেজী-পড়া ছেলে, বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, যদি ওই হোম আমি শেষ করতে পারি তাহলে হয়ত তোমাদের বিপদ চিরদিনের জন্য কেটে যাবে।

বলরাম আমার কথার সুরে একটু অবাক হয়ে বলল, কেন, শেষ করতে পারার অসুবিধে কি?

—সে তোমাকে এখন বলব না। তুমি কি চাও আমি ওই হোম করি?

—নিশ্চয়। সবার মঙ্গল হবার যদি কিছুমাত্র সম্ভাবনাও থাকে তাহলে আমার বিশ্বাসের জন্য আমি তাতে বাধা দেব না—

—ঠিক আছে। এ মাসের শেষ অমাবস্যার রাত্তিরে আমি হোম করব। তুমি ব্যবস্থা কর। আমি ফর্দ দিয়ে দিচ্ছি, যোগাড় করে ফেল। কিছু জিনিস লাগবে যা তুমি যোগাড় করে উঠতে

পারবে না। সেগুলো আমিই নিয়ে যাব এখন। রাত দশটায় পুজোয় বসব, বারোটা থেকে হোম শুরু হবে। কিন্তু আমার একজন সঙ্গী চাই যে—

বলরাম বলল, কাকে চাই বলুন?

—তোমাদের কুলপুরোহিত ছিলেন ভবেশ ভট্‌চায, তার ছেলে নরেশ তো পুজো-আচ্চা করে। তাকে বলে রেখো—

—বেশ তাই হবে।

নির্দিষ্ট দিনে চৌধুরীবাড়ি পৌঁছে দেখি আয়োজন সব সম্পূর্ণ। বাড়ির সামনে বিরাট উঠোনে সামিয়ানা টাঙিয়ে তার নিচে হোমের জায়গা করা হয়েছে। কুশাসন, সমিধ ও অন্যান্য জিনিস রাখা হয়েছে। তার একদিকে বিষণ্ণমুখে নরেশ ভট্টাচার্য বসে। আমি গিয়ে নরকপাল, হাড়ের মালা আর ফলসুদ্ধ কুচগাছের ডাল নামিয়ে রাখছি দেখে সে কাতর হয়ে বলল, চক্কত্তিমশাই, আমি কি পারব? আমি তো ইয়ে, মানে আপনাদের মতের হোম কিছু জানি নে—বললামও বলরামকে, তবু আমাকে জোর করে নিয়ে এল—

হেসে বললাম, কিছু ভয় নেই ভট্‌চাযমশাই, আপনাকে কিছু করতে হবে না—কেবল মাঝে মাঝে এটা-ওটা একটু হাতে এগিয়ে দেবেন। বড় হোম আর পুজো একহাতে করা যায় না।

বলরামকে ডেকে বললাম, হোম আরম্ভ করার পরে বাড়িতে নানারকম উপদ্রব আর উৎপাত হতে পারে। ভয় পেয়ো না। স্থির হয়ে এক জায়গায় বসে ঈশ্বরের নাম করবে। বিরুদ্ধশক্তি চেষ্টা করবে যাতে আমি হোম শেষ না করতে পারি।

পুজো শুরু করে সবে দেহবন্ধন আর আসনশুদ্ধি করেছি, বাড়ির ছাতে দড়াম্ করে বিকট এক আওয়াজ হল। বলরাম দৌড়ে দেখতে গেল কি ব্যাপার। ফিরে এসে বলল, কি আশ্চর্য। একটা থানইট এসে পড়েছে কোথা থেকে। বাড়ির ছাদে ছুঁড়ে থানইট পাঠানো কি সোজা কথা!

আমি ততক্ষণে ঘটস্থাপন করে মঙ্গলভৈরবের ধ্যান শুরু করেছি।

ভৈরবকে সামান্যার্ঘ দেবার সময় বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া বিরাট চটকাগাছ থেকে অসংখ্য কাক জেগে উঠে কা-কা শব্দে চারদিকে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল। ব্যাপারটা শুনতে সামান্য লাগছে—কিন্তু যার অভিজ্ঞতা নেই সে বুঝতে পারবে না রাত এগারোটার সময় হাজারখানেক কাক মাথার ওপরে উড়লে কেমন লাগে। সেই অমাবস্যার নিকষ-কালো অন্ধকার উড়ন্ত কাকেদের অপার্থিব ডাকে খান্ খান্ হয়ে যেতে লাগল। এসব অশুভ ইঙ্গিত দেখে বাড়ির মেয়েরা একতলার বারান্দায় বসে কাঁদছেন। আমার মন বারে বারে পুজো থেকে সরে যাচ্ছে, বীজমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে অভিনিবিষ্ট হবার চেষ্টা করছি।

পুজো শেষ হয়ে আসছে, এবার ভৈরবের আরতি করবো, তারপর হোম হবে। প্রথমে দীপ এবং পরে ধূপ-ধুনোর আরতি। নরকপালে শবের আচ্ছাদন থেকে আহৃত বস্ত্রের সলতে পাকিয়ে তেল দিয়ে দীপ জ্বালালাম। নরেশ ভট্টাচার্য গাব-ফলের মত চোখ করে পুজোর প্রক্রিয়া দেখছিল, তাকে বললাম, ধুনুচি জ্বালান, এবার ধুনোর আরতি করব।

দীপের আরতি চলছে, নারকেলের ছোবড়ার আগুন করে তাতে অনেকখানি ধুনো ছড়িয়ে দিতেই গলগল করে ধোঁয়া উঠতে লাগল।

এবং আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল নরেশ ভট্টাচার্য।

ধুনোর পবিত্র, মিষ্টি গন্ধের বদলে বিষম পূতিগন্ধে বাতাস ভরে গিয়েছে!

যারা নরেশ ভট্‌চাযের আর্তনাদ শুনে ব্যাপার কি দেখবার জন্য এগিয়ে আসছিল তারা নাকে কাপড় দিয়ে পিছিয়ে গেল। বিদ্যুৎবেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল মড়াপচা দুর্গন্ধ!

মহিলারা চিৎকার করে কাঁদছেন, নরেশ আচ্ছন্নের মত এলিয়ে আছে একদিকে, দোতলার বারান্দা থেকে আকুল হয়ে চেঁচাচ্ছেন শিবরাম, ঢাকা দিয়ে দে! ঢাকা দিয়ে দে!

দীপ নামিয়ে ভৈরবের ধ্যান করে একটি রক্তজবা ছুঁড়ে দিলাম ধুনুচিতে। সঙ্গে সঙ্গে বিকট গন্ধ মিলিয়ে গিয়ে ধুনোর নিজস্ব গন্ধ ফুটে উঠল বাতাসে। আস্তে আস্তে হল না, কেউ যেন জাদুবলে এক মুহূর্তে সব জায়গায় একই সঙ্গে গন্ধটাকে বদলে দিল।

বলরাম পাংশুমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দেখে মনে হয় তার অবিশ্বাস কেটে এসেছে। আমার তখন কেবল এক চিন্তা—হোম শেষ হবে তো?

পুজো শেষ করে হোমের বেদীতে বালির ওপর যোগিনীমণ্ডল আঁকলাম। হাড়ের মালা গলায় দিয়ে বসে শুরু করলাম হোম।

বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে আহুতি দিয়ে চলেছি, নরেশ বসে সমিধ এগিয়ে দিচ্ছে—হঠাৎ দেখলাম আগুনের তেজ যেন কমে আসছে। শুকনো বেলকাঠ জ্বলছে, অনেকখানি করে ঘি এক-একবারে আহুতি দিচ্ছি—আগুন নিভে আসার তো কোন কারণ নেই!

নরেশ ভাল করে কি দেখবার ভঙ্গিতে সামনে ঝুঁকে পড়ে বলল, আরে। এ আবার কি? দেখুন দেখুন!

তাকিয়ে দেখি হোমের বেদীর শুকনো বালি ভিজে উঠেছে, যেন তাতে বেশ খানিকটা জল ঢেলে দিয়েছে কেউ। কি করে তা হবে? বিঘৎপ্রমাণ উঁচু মাটির বেদী করে তার ওপর পুরু করে বালি বিছিয়ে হোমের জায়গা হয়েছে—কাজেই স্যাঁতসেঁতে জমি ভিজে গিয়ে জল উঠবে তাও সম্ভব নয়। এ যেন মনে হচ্ছে মাটির তলা থেকে জল উঠছে। কেউ যেন তলা থেকে পিচকিরি করে জল দিয়ে ভেজাচ্ছে বালি।

এই শুরু। আমি বুঝতে পেরেছিলাম হোম শেষ করতে পারব না। বলরামের জন্য মায়া হচ্ছিল। সে বেচারা এখনো আমার ওপর নির্ভর করে তাকিয়ে রয়েছে।

এর পর মাটির তলা থেকে যজ্ঞবেদীর নিচে হুড়হুড় করে জল উঠতে লাগল। যেন কোন ঝরনার উৎসমুখে পুজোয় বসেছি। আমার আসন ভিজে গিয়ে জল গড়াতে লাগল। শেষদিকে যেন হঠাৎ একটা জলের ঢেউ তলা থেকে উঠে বালি, সমিধ সব ভাসিয়ে নিয়ে গেল—আগুন গেল নিভে।

তারানাথ থামল।

কিশোরী আর আমি একসঙ্গে বললাম, তারপর?

বিষণ্ন হেসে তারানাথ বলল, তারপর আর কি? আমার জয়ের গল্প তো অনেক শুনেছ, এটা আমার ব্যর্থতার গল্প।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, চৌধুরী পরিবারের কি হল?

তারানাথ খুব মৃদু গলায় বলল, এখন সত্যিই তাদের বংশে বাতি দিতে কেউ নেই।

আমরা দুজন চুপ করে রইলাম।

তারানাথ বলল, কি, শেষটা পছন্দ হল না, কেমন? ভাবো তো, জিতটা তো নিপীড়িতজনেরই হল? চৌধুরীপরিবার বেঁচে গেলে সেটা ঈশ্বরের ন্যায়বিচার হত কি? পৃথিবীর আদালতে এই মানুষগুলো বিচার পায় না, বড় আদালতে যে এখনো সুবিচার হয়, তা তো প্রমাণিত হল।

একটু থেমে বলল, অবশ্য অনেকগুলো মানুষ—যারা শ্রীপদর ভাগ্যবিপর্যয়ের ব্যাপারে সরাসরি জড়িত ছিল না—তারাও কষ্ট পেল। তা সে আর কি করা যাবে, এসব নিয়তির অখণ্ড বিধান।

আমরা উঠে আসছি, তারানাথ বলল, হিন্দু বিধবা সহজে পরিত্রাণ পায় না। কমলা আর নিরুপমা অতিবৃদ্ধা হয়ে এখনও বেঁচে আছেন। থাকেন কাশীতে। সম্বল খুব সামান্যই, কষ্টেসৃষ্টে চলে যায়।

সান্ধ্য আসরে একদিন তারানাথকে বললাম, আপনার ছোটবেলার গল্প বলুন। শুনতে ইচ্ছে করছে।

তারানাথ হেসে বলল, তোমাদের কথায় অনেকদিন বাদে মনে পড়ল আমারও একটা ছোটবেলা ছিল বটে। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েই বাউণ্ডুলে নই। কি গল্প শুনতে চাও?

দেখলাম তারানাথের চোখ কেমন স্বপ্নিল আর ভাসা-ভাসা হয়ে এসেছে। শৈশবের স্মৃতি সব মানুষকেই উদাস করে দেয়। কিশোরী বলল—যা ইচ্ছে বলুন। তুচ্ছ ঘটনাও আপনার বলার গুণে ভাল লাগে। আচ্ছা, আপনার পরবর্তী জীবন যে এইরকম হবে, ছোটবেলায় তার কোনো আভাস পাননি?

উত্তরে তারানাথ কিশোরীর দিকে তাকিয়ে বলল, আমার সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছে।

তৎক্ষণাৎ কিশোরী বেরিয়ে গিয়ে মোড়ের দোকান থেকে একবাক্স সিগারেট এনে তারানাথের সামনে নামিয়ে রাখল। একটা সিগারেট ধরিয়ে চোখ বুজে তৃপ্ত মুখে ধোঁয়া ছেড়ে তারানাথ বলল, সত্যি কথা বলতে কি, আজ দু'দিন একটা পয়সাও আমদানি হয়নি। না হাত দেখা, না স্বস্ত্যয়ন, না কিছু। সংসারের নৌকো একেবারে বালির চড়ায় ঠেকে গিয়েছে। তাই আর লজ্জা করলাম না, সিগারেটটা চেয়েই নিলাম—

কিশোরী বলল, পৃথিবীতে কিছু না দিলে কিছু পাওয়া যায় না। গল্প শোনারও একটা দক্ষিণা আছে বইকি। আপনি রোজ রোজ গল্প বলবেন, আর পরিবর্তে আমরা কিছুই দেব না?

তারানাথ হেসে বলল, ভাল। তোমার দেওয়াটা তুমি সুন্দর কথা দিয়ে ঢেকে দিলে। ফাঁকিটা ধরতে পারলাম বটে, তবুও আমার নেওয়ার লজ্জাটা ঢাকা পড়ল। বেশ, কথকের দক্ষিণা বলেই নিলাম না হয়।

বাইরে শেষ বিকেলের আলো গাঢ় হয়ে এসেছে। বৈঠকখানার জানালা দিয়ে কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকল তারানাথ, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ছোটবেলার কথা মনে পড়লে বুকের ভেতরটা কেমন করে। কোথায় গেল সেইসব সবুজ মাঠ, মুক্ত হাওয়া, আমতলায় ছুটোছুটি করে বেড়াবার দিন? আর এই এখন কোথায় পড়ে আছি দেখ—নোংরা পরিবেশ, ঘরের মধ্যে দিনের বেলা অন্ধকার, নর্দমা থেকে পাঁকের গন্ধ ভেসে আসে সারাদিন। নাঃ, সে-সব দিন আর ফিরবে না, ফেরে না।

তারপর সবকিছু ঝেড়ে ফেলবার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে তারানাথ বলল—যাক্, যা গিয়েছে তা তো আর ফিরবে না। বরং আমার স্মৃতিতেই সমস্ত উজ্জ্বল হয়ে থাক।

সিগারেট শেষ করে ছাইদানী হিসেবে ব্যবহৃত একটা নারকেলের মালার মধ্যে গুঁজে দিয়ে তারানাথ বলল, একটা ঘটনা বলি শোন। বহুদিন আগেকার কথা, আমার আট-নয় বছর বয়সের। একে ঠিক অলৌকিক বা অপ্রাকৃত ঘটনা বলা যায় কিনা জানি না, কারণ বাহ্যত তেমন কোন কাণ্ড ঘটেনি। তবে শ্রেণীবিভাগ না করতে পারলেও গল্পটা তোমাদের ভালই লাগবে।

তোমরা তো জানো আমি গ্রামের ছেলে। বিরাট ধনী না হলেও আমাদের অবস্থা নিতান্ত খারাপ ছিল না। ঠাকুর্দার তো ছোটখাটো একটা তালুকই ছিল। আমি সংসারী না হওয়ায় আমার দুই ভাই বাবার মৃত্যুর পর সব নষ্ট করে ফেলে।

ঠাকুর্দা ছিলেন ভয়ানক রাশভারী মানুষ। সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপার তিনিই দেখতেন। তিনি বেঁচে থাকতে বাবা কেবল মাছ ধরে বেড়াতেন, আর কিছু করবার ছিল না বলে। ঠাকুর্দা যে কেবল পয়সা চিনতেন বা মামলা করে বেড়াতেন তা নয়। তাঁর ঘরে অনেকগুলো সেকেলে ধরনের আলমারিতে ঠাসা ছিল নানা ধরনের বই। হাতে-লেখা পুঁথিও ছিল কত! তখন বোঝবার বয়স হয়নি, এখন আন্দাজ করতে পারি কি অমূল্য সম্পদ ছিল সেই সব বই। কিন্তু সে সমস্তও আমার ভাইয়েরা নষ্ট করেছে। কে কোথা দিয়ে নিয়ে গিয়েছে তা আর বলা সম্ভব নয়। রোজ রাত্তিরে ঠাকুর্দা লণ্ঠনের আলোয় বসে পড়াশুনো করতেন। কথা বলতেন কম, কিন্তু যখন বলতেন বোঝা যেত যে বিষয়ে বলছেন তাতে তাঁর গভীর জ্ঞান রয়েছে। নিদারুণ ব্যক্তিত্ব ছিল। কারো সঙ্গে মতবিরোধ হলে তিনি ঝগড়াও করতেন না, যুক্তিও দেখাতেন না—কেবল মুখ থেকে ফরসীর নলটা নামিয়ে তার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকতেন। তাতেই কাজ হত।

আমি ছিলাম সবার আদরের ছেলে। কাকারা তখনো বিয়ে করেননি—আমার ভাইয়েরাও জন্মায়নি। কোনো কিছু ভাগ করে নেবার অভ্যেস হয়নি তখনো। এই সময় আমাকে নিয়ে বাড়ির সবাই খুব বিব্রত হয়ে পড়ল।

বললাম, কেন?

তারানাথ বলল, সেইটেই গল্প। মনোযোগ দিয়ে শোন। আট বছর বয়েস থেকে আমার হঠাৎ এক অদ্ভুত জ্বর আরম্ভ হল। খেলাধুলো করে এসে রাত্তিরে ঠাকুমার পাশে শুয়ে রূপকথা শুনছি, হঠাৎ ঠাকুমা বললেন—দেখি, তোর গা যেন গরম-গরম লাগছে—

হাতের উল্টোদিক দিয়ে কপাল আর গলা দেখে বললেন, হ্যাঁ, তোর বেশ জ্বর হয়েছে। কি করে হল? চুরি করে আচার খেয়েছিলি?

বললাম, না তো!

—তাহলে জ্বর হল কেন? যাক্ গে, আজ রাত্তিরে তোর ভাত খেয়ে কাজ নেই। দুধ-সাবু করে দিচ্ছি, খেয়ে শুয়ে থাক। কাল দুপুরে রুটি খাবি। শরীর একটু টেনে গেলে জ্বর কমে যাবে এখন—

তাই করা হল। কিন্তু পর পর তিন দিন রোগীর পথ্য করার ফলেও জ্বর কমল না। তখনকার যুগে লোকে কথায় কথায় ডাক্তার দেখাত না, আর গ্রামে-গঞ্জে অত ডাক্তারই বা কোথায়? বাবা কেবল একবার বললেন, ছেলেটা বড় দুষ্টু হয়েছে। টো টো করে ঘুরে অসুখটা বাধাল। ওকে একটু শিউলিপাতার রস খাইয়ে দিয়ো তো—

মোটের ওপর কেউ আমার অসুখটাকে বিশেষ আমল দিল না। দেবার কথাও নয়। জ্বরজারি বাচ্চাদের হয়েই থাকে, আবার সেরেও যায়।

কিন্তু দিনদশেক বাদেও যখন আমার জ্বর কমল না, তখন সবার টনক নড়ল। ঠাকুর্দার কানে সহসা সংসারের কোনো খবর পৌঁছয় না, নিজের ঘরে বইপত্র আর দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে মগ্ন থাকেন। আমার জ্বরের দশম দিনে ঠাকুর্দা এসে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে গায়ের উত্তাপ দেখলেন। ঠাকুমা লম্বা ঘোমটা দিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁকে বললেন, আগে আমাকে খবর দাওনি কেন? তারপর বাবার দিকে ফিরে বললেন, কাল সকালে উঠে মহকুমা শহর থেকে জীবন ডাক্তারকে ডেকে আনবে—

বাবা ক্ষীণস্বরে বললেন, আজ্ঞে, জীবন ডাক্তার?

—হ্যাঁ। ঘোড়ার গাড়ি করে নিয়ে আসবে। আরো আগে আনা উচিত ছিল। টাইফয়েডে দাঁড়ালে কি হবে ভেবে দেখেছ?

বাবার মুখ শুকিয়ে গেল। তখন টাইফয়েড একটা কালান্তক রোগ বলে গণ্য হত। ব্যাকটিরিও ফাজ আবিষ্কার হয়নি। শুধু জলচিকিৎসা হত। বাবা পরের দিনই দুপুরের মধ্যে শহর থেকে বড় ডাক্তার নিয়ে এলেন। ডাক্তারবাবু বুকে নল বসিয়ে, পেট টিপে, জিভ দেখে এবং মা আর ঠাকুমাকে অনেক প্রশ্ন করে তারপর বললেন, টাইফয়েড বলে মনে হচ্ছে না।

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, ম্যালেরিয়া?

—উঁহু। কাঁপুনি নেই, লিভার-টিভার নয়—জ্বরও তো একই ভাবে চলছে, ছাড়ছে না। ম্যালেরিয়াও নয়—

—তাহলে?

—বলতে পারছি না। আরো ক'দিন দেখতে হবে। একটা থার্মোমিটার কিনে রাখুন, রোজ তিন-চারবার জ্বর দেখে লিখে রাখবেন। আপাতত একটা ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি, সেটা খেয়ে কেমন থাকে জানালে তারপর দেখা যাবে।

অর্থাৎ আন্দাজে চিকিৎসা শুরু হল। এই সবে আরম্ভ, এর পরে কত যে ডাক্তার এল আর কত যে ওষুধ খেলাম তার ইয়ত্তা নেই। পেটের মধ্যে ডাক্তারখানা খোলবার যোগাড় করে ফেললাম। কিন্তু বিচিত্র জ্বর কিছুতেই কমল না। প্রায় দু'মাস হয়ে গেল। আমি তখন হাড়সার রোগা হয়ে গিয়েছি, মুখের ভেতর একটা তেতো স্বাদ সব সময় থাকে। জানালার ধারে শুয়ে দেখি গ্রামের হরেন, রামু, শিবেন—এরা সবাই গুলতি হাতে পাখি মারতে যাচ্ছে কিংবা ছিপ হাতে চৌধুরীদের পুকুরের দিকে চলেছে। আমাকে দেখে ওরা জিজ্ঞাসা করে, কিরে, জ্বর কমল?

আমি মাথা নাড়ি। ওরা চলে যায়।

মা আর ঠাকুমা প্রায় খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। বাবার থমথমে মুখ দেখলে আমার বুকের মধ্যে কেমন করে। এর ভেতর একদিন তিনি কোলকাতা থেকেও বড় ডাক্তার ধরে আনলেন। সবই হল, কিন্তু আমার অসুখ সারল না। জ্বর খুব একটা বাড়ে না, কিন্তু গায়ে থেকেই যায়—ছেড়ে যায় না একেবারে। ওঃ, সে বড় ভয়ানক সময় গিয়েছে। একদম কাহিল হয়ে পড়েছিলাম। বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না। প্রথম দিকে ঠাকুমা কোলে করে বাথরুমে নিয়ে যেতেন, তারপর থেকে ওগুলো বিছানাতেই সারতে হত। আমার কোনো মৃত্যুভয় হয়নি, কারণ ওই বয়েসে শিশু মৃত্যুকে চেনে না। কেবল খেলতে যেতে পারি না বলে, বাড়ি থেকে বেরুতে পারি না বলে মন খারাপ লাগত।

একদিন কেবল ভয় পেয়েছিলাম। বিকেলের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছি—তখন আমার ঘুমোবার সময়ের কোনো ঠিক ছিল না, সব কেমন উলটোপালটা হয়ে গিয়েছিল। সারাদিনই শুয়ে থাকা তো—যখন-তখন ঘুমিয়ে পড়তাম। একদিন বিকেলে জেগে উঠে দেখি আধো অন্ধকার ঘরে মা আর ঠাকুমা দুজনে পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে কেমন অদ্ভুতভাবে যেন আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ভয় পেয়ে বলে উঠলাম, মা, কি হয়েছে?

মা প্রথমে উত্তর দিতে পারলেন না—এখন বুঝতে পারি কান্নায় তাঁর গলা বুজে গিয়েছিল। উত্তর না পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, কি হয়েছে? তোমরা অমন করে তাকিয়ে রয়েছ কেন?

ঠাকুমা এগিয়ে এসে আমাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে বললেন, কিছু হয়নি, চিৎকার করছিস কেন? থাম, শরীর অস্থির করবে—

—মা কথা বলছে না কেন?

—পুজো করতে যাবে কিনা, তাই। এই তো চান করে এল, আজ যে বৃহস্পতিবার। পুজো না করে কথা বলতে নেই—

তখনকার মত চুপ করে গেলাম বটে, কিন্তু আমার বালকমনে ঘটনাটা গভীর ছাপ ফেলল। জ্বরের ঘোরে ঘুম থেকে উঠলে এমনিতেই মস্তিষ্ক যথাযথ কাজ করে না, তার ওপর অন্ধকার ঘর—মায়ের অমনভাবে তাকিয়ে থাকা—এই প্রথম আবছাভাবে অনুধাবন করতে পারলাম আমার জটিল কিছু একটা হয়েছে, এবং সেজন্য বাড়ির সবাই খুব চিন্তিত।

দু-মাস হয়ে যাবার পর ঠাকুর্দা বাবাকে আবার কোলকাতা পাঠালেন। যে বড় ডাক্তার আমাকে একবার দেখে গিয়েছিলেন তাঁকে আবার নিয়ে আসা হল। ডাক্তারবাবু অনেকক্ষণ ধরে আমাকে দেখলেন, নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, তারপর চুপ করে বসে রইলেন।

খাটের এধারে ঠাকুমা দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বললেন, কেমন বুঝলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার হাত জোড় করে বলেন, আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সব রকম পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, জ্বর ছাড়া অন্য কোনো উপসর্গও নেই। এ অবস্থায় কি চিকিৎসা করব? অন্য ডাক্তার হলে লজ্জা বাঁচানোর জন্য যাহোক কিছু প্রেসক্রিপশন করে দিয়ে যেত। কিন্তু তা করতে আমার বিবেকে বাধে।

অনেক অনুরোধেও তিনি ফী নিলেন না। বললেন, না মশাই, টাকা নিতে পারব না। এখনও পুরোপুরি চশমখোর হতে পারিনি। যদি একান্তই না ছাড়েন, তবে আমার ফেরবার ভাড়াটা বরং দিন।

গ্রাম্য বাঙালী পরিবারের যা বৈশিষ্ট্য, এরপর সবাই দৈব ওষুধের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নারাণপুরে কে নাকি ঠাকুর পেয়েছে, সেখানে গিয়ে ধর্না দিলে ওষুধ পাওয়া যায়। নারাণপুর আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরে। অন্য কেউ গেলে হবে না, রোগীকেও অবশ্যই যেতে হবে। তা অম্লশূলের বা মৃগীর রোগী হলে না হয় গেল, কিন্তু দু মাস ভুগে আমি তখন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারি না, আমি অত পথ যাব কি ভাবে?

বাবা ভেবে ভেবে উপায় বের করলেন। ঘোড়ার গাড়িতে যেতে পারব না, কারণ ঝাঁকুনিতেই মরে যাব তাহলে। বাবা বললেন, ওকে পালকিতে করে নিয়ে যাব। দাঁড়াও পালকির ব্যবস্থা করি।

পালকিতে আমাকে নিয়ে ঠাকুমা চললেন, বাবা-ঠাকুর্দা পেছন পেছন এলেন গরুর গাড়িতে।

মন্দিরের ভেতর ঠাকুমার কোলে সারারাত শুয়ে রইলাম। সেসময় অতিরিক্ত ভুগে আমার যেন মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। প্রায়ই রাত্তিরবেলা আবোলতাবোল স্বপ্ন দেখতাম। এখানেও শেষরাত্তিরে কি একটা হিজিবিজি স্বপ্ন দেখলাম, তার কোনো মাথামুণ্ডু নেই—এমন কি সকালে মনেও করতে পারলাম না। সেবায়েৎ সকালে জিজ্ঞাসা করল, কিছু আদেশ-টাদেশ পেয়েছ খোকা?

আদেশ কাকে বলে? ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, আজ্ঞে না তো, তবে একটা স্বপ্ন দেখেছি—

—কি স্বপ্ন?

—তা এখন আর মনে পড়ছে না।

সেবায়েৎ বলল, তা যাক গে, ওই দেখলেই হবে।

কি সব পুজো দেওয়া হল, একটা মাদুলি ঝুলিয়ে দেওয়া হল আমার হাতে। সেবায়েৎ কোশায় করে অনেকখানি চরণামৃত এনে আমাকে হাঁ করিয়ে খাইয়ে দিল। তাতে বহুদিনের ফুল-বেলপাতার গন্ধ।

আবার পালকি করে বাড়ি। মাদুলিতে কি ফল হল তা বুঝতে পারা গেল না, কিন্তু চরণামৃত খেয়ে জ্বরের ওপর আমার হল ভয়ানক পেটখারাপ। অসুখ চলতেই লাগল। দিনদশেক বাদে বাবা একদিন টান দিয়ে মাদুলিটা ছিঁড়ে বাইরে ফেলে দিলেন।

একদিন—সময় সন্ধ্যেবেলা—পরিষ্কার মনে পড়ছে দৃশ্যটা, ঠাকুর্দা এসে আমার বিছানার পাশে দাঁড়ালেন। বাবা বাইরের কাজকর্ম সেরে আগে থেকেই এসে বসেছিলেন। ঠাকুর্দা কিছুক্ষণ চুপ করে আমাকে দেখে বললেন, কেমন আছিস আজ?

ভুগে ভুগে কেমন আছি বোঝবার ক্ষমতা লুপ্ত হয়েছিল। তাই বললাম, ভাল আছি।

ঠাকুর্দা বললেন, হুঁ। তোর জন্য একটা পুজো করা হবে, বুঝলি? তাহলেই তোর অসুখ সেরে যাবে।

বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পুজো? কি পুজো?

ঠাকুর্দা আমার পায়ের কাছে বিছানায় বসলেন, বললেন, কাল রাত্তিরে পড়তে পড়তে একটা জিনিস পেলাম—ভগবানই পাইয়ে দিলেন বলতে পার। আমার ঠাকুর্দা নরনাথ ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন, তা তো তোমরা জানোই। তন্ত্রসাধনার ওপর অনেক বই ছিল তাঁর। তার মধ্যে বেশির ভাগই হাতে লেখা পুঁথি। কিছু কিছু নষ্ট হয়েছে, কিছু চুরি গিয়েছে—আবার কিছু রয়েও গিয়েছে। তারই একটা বই পড়তে গিয়ে কাল রাত্তিরে একটা ঘটনা পড়লাম, বুঝলে?

ঠাকুমা বললেন, কি?

—লেখক বলছেন, যদি কারও দীর্ঘদিন ধরে কালান্তক জ্বর চলতে থাকে, এবং কিছুতেই সে জ্বর না সারে তাহলে বুঝতে হবে তাকে জ্বরাসুরে আক্রমণ করেছে।

—জ্বরাসুর আবার কে?

ঠাকুর্দা বিব্রত হয়ে বললেন, সে তোমাকে বোঝানো কঠিন হবে। জ্বরাসুরকে দেবতাও বলতে পার, আবার উপদেবতাও বলতে পার। এরা শুধু অনিষ্টই করতে পারে। পুঁথিতে লিখছে জ্বরাসুরের বিধিমত পুজো করলে জ্বর কমে যায়।

ঠাকুমা শঙ্কিত গলায় বললেন, না, ও পুজো তোমায় করতে হবে না।

ঠাকুর্দা বললেন, কেন?

—না, ওসব ঠাকুরের নামই শুনিনি কখনো। আর কিবা নামের ছিরি, শুনলেই শরীর হিম হয়ে আসে। দরকার হলে চেনাজানা ভাল ঠাকুরের পুজো করো—ও তোমায় করতে হবে না।

ঠাকুর্দা বাধা পেয়ে রেগে গেলেন। তিনি কারো পরামর্শে মত বদলাবার পাত্র ছিলেন না, নিজে যা ভাল বুঝতেন তাই করতেন। বললেন, ব'কো না, আমি কি আমার নাতির খারাপ চাই। আমি ঠিকই করছি। আমার ঠাকুর্দার পুঁথি, বহুদিন আগেকার মস্ত এক সাধকের লেখা। তা কি কখনো ভুল হতে পারে? ভগবান পাইয়ে দিয়েছেন।

—তা এ পুজো করবে কি করে? মন্তর-তন্তর পাবে কোথায়?

ঠাকুর্দা খুশি হয়ে বললেন, ওইটেই তো মজা! জ্বরাসুরের পুজোর সমস্ত বিধি ওই বইতেই সংস্কৃতে লেখা রয়েছে। দেখবে? দাঁড়াও, দেখাই—

একটু বাদেই ঠাকুর্দা তাঁর পুঁথি নিয়ে ফিরে এলেন। পুরনো দিনের হাতে তৈরি কাগজের পুঁথি, তাতে মোটা খাগের কলমে কালো কালিতে লেখা অক্ষর। বলা বাহুল্য, মা বা ঠাকুমা কেউই বিন্দুবিসর্গ বুঝলেন না—কিন্তু ঠাকুর্দা মহা উৎসাহে গড়গড় করে দুর্বোধ্য সংস্কৃত পড়ে গেলেন অনেকখানি। তারপর এক জায়গায় থেমে গিয়ে বললেন—এই হল পুজোর নিয়ম আর মন্ত্র, বুঝতে পারলে তো?

দেবভাষার মোহ বড় সাংঘাতিক। ঠাকুমা মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালেন। ঠাকুর্দা বললেন, আমার ভাগ্যও খুব ভাল। ঠিক এর পরেই পুঁথির এই পাতাটা কিছুটা পুড়ে গিয়েছে। এই দেখ—

দেখলাম সত্যিই পাতার অর্ধেকটা কিভাবে যেন পুড়ে গিয়েছে বটে।

ঠাকুর্দা বললেন, তাতে অবশ্য কোনো ক্ষতি হবে না। পোড়া জায়গায় আগেই পূজাবিধি সম্বন্ধে লেখাটা শেষ হয়ে গিয়েছে। আর বারোদিন বাদে অমাবস্যা, ওদিনই পুজো দেব।

বাবাকে বললেন, হরিশ কুমোরকে খবর দিস তো কাল আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য—ঠাকুর গড়াতে দিতে হবে।

বাবা বললেন, ঠাকুরও গড়ানো হবে নাকি?

—তা হবে বইকি! নইলে পুজো হবে কি করে?

—কেমন ঠাকুর?

ঠাকুর্দা একটু কেশে বললেন—ইয়ে, পুঁথিতে যা বর্ণনা রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে জ্বরাসুরের চেহারা—মানে, খুব একটা সুন্দর নয় আর কি। তা সে আর কি করা যাবে—

পরের দিন হরিশ কুমোর এসে হাজির হল। ঠাকুর্দা আদৌ ভূমিকা না করে তাকে বললেন, তোমাকে একটা নতুন ধরনের মূর্তি বানিয়ে দিতে হবে পুজোর জন্য। পারবে তো?

—আজ্ঞে, কিসের মূর্তি?

—জ্বরাসুরের।

—জ্বরাসুর? সে কি জিনিস?

ঠাকুর্দা তাকে ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত বুঝিয়ে দিলেন। সময় নেই মোটে। এগারো দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। বারোদিন পরে পুজো।

—কর্তামশাই, মূর্তি দেখতে কেমন হবে?

ঠাকুর্দা একটু ইতস্তত করে বললেন, তিনটে মাথা হবে, বুঝলে? ছ'টা পা, ছ'টা হাত—পেছনে একটা মোটা ল্যাজও থাকবে।

—আজ্ঞে—ল্যাজ?

—হ্যাঁ। ল্যাজে আর গায়ে বড় বড় কাঁটা। গায়ের রঙ ঘোর কালো। তিনটে লালরঙের বড় বড় চোখ হবে, তার ভেতর একটা চোখ থাকবে কপালে। লাল জিভ বের করে দাঁড়িয়ে আছেন জ্বরাসুর। কি, পারবে তো?

একটা নিঃশ্বাস ফেলে হরিশ বলল, আজ্ঞে পারব। তবে কথা হচ্ছে কি, এ পুজো কি না করলে হত না? কেমন কেমন ঠেকছে যেন—

—আরে রাখ তো, তুমিও দেখি মেয়েদের মত আরম্ভ করলে। যে রোগের যে ওষুধ, বুঝলে না? যাও, কাজ করো গে—

জ্বরাসুরের পুজো নাকি বসতবাড়ির ভেতরে করতে নেই। তাই আমাদের বাড়ির বাইরে যে বড় মাঠের মত জমি পড়েছিল, সেইখানে সামিয়ানা খাটিয়ে জ্বরাসুরের মূর্তি বানানো আরম্ভ করে দিল হরিশ কুমোর। ইতিমধ্যে গ্রামে এবং গ্রামের বাইরে রটে গিয়েছে ঠাকুর্দা নাতির অসুখের জন্য কি এক বিকট মূর্তি বানিয়ে পুজো করছেন। রোজ সকাল থেকে সামিয়ানার তলায় ব্যাপারটা চাক্ষুষ দেখবার জন্য ভিড় লেগে থাকত। হরিশ কুমোরও ওস্তাদ লোক। এখন বুঝি মানুষটা খাঁটি শিল্পী ছিল। কেবলমাত্র বর্ণনা শুনে অভূতপূর্ব কিছু সৃষ্টি করা চাট্টিখানি কথা নয়। সুন্দরকে যে সৃষ্টি করে সে যেমন বড় শিল্পী, আবার ভয়ানক বীভৎস রস যে সৃষ্টি করতে পারে সেও বড় শিল্পী বইকি। হরিশ মাথা ঘামিয়ে এমন এক বিকট মূর্তি তৈরি করল, যা দেখে পুজোর দিন আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছিল।

এদিকে সব আয়োজন মোটামুটি হয়ে গেল। শুধু পুরুত ঠিক করা বাকি। ঠাকুর্দা নিজেই পুজো করবেন ঠিক করেছিলেন—কিন্তু এবার ঠাকুমা স্বমূর্তি ধরে ঝাঁঝালো গলায় জানিয়ে দিলেন যে ঠাকুর্দা বিপত্নীক হবার পর যা খুশি তাই করতে পারেন—তার আগে নয়। ঠাকুর্দা—সামান্য

হলেও—ঠাকুমাকে ভয় করতেন। ফলে তিনি গ্রামের তিন-চারজন পুরুত বামুনের থেকে বেছে বেছে সবচেয়ে দরিদ্র রামজীবন চক্রবর্তীকে পাকড়াও করলেন। তখন জ্বরাসুরের মূর্তি প্রায় তৈরি হয়ে এসেছে। সে বেচারি ঠাকুরের চেহারা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে বলল—আজ্ঞে, এ আমার সাধ্যে কুলোবে না—

ঠাকুর্দা কার্যোদ্ধারের নানা বাস্তব উপায় জানতেন। তার মধ্যে সবচেয়ে ফলদায়ী উপায়টি প্রয়োগ করলেন। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, ও, তোমার অসুবিধে হবে বলছ? থাক তাহলে। জোর করে কাউকে দিয়ে কোন কাজ করানো উচিৎ নয়—বিশেষত পুজো-আচ্চা। সাঁতরাগাছি থেকেই তাহলে পুরুত আনাতে হবে দেখছি। আসলে অনেকগুলো কাপড়, থালা-বাসন, ফল-ফলাদি—তাছাড়া এক মুঠো টাকা দক্ষিণা—এসব বাইরের গ্রাম থেকে এসে কেউ নিয়ে যাবে—এটা চাই না বলেই তোমাকে বলছিলাম। বরং দক্ষিণা কিছু বেশি লাগলেও গ্রামের পুরুত করলেই ভাল হত। তা তোমার যখন অসুবিধে—

রামজীবনের দুই বয়স্কা মেয়ে তখনও অবিবাহিতা। একমাত্র ছেলে পড়াশুনা এবং পৈতৃক ব্যবসা ছেড়ে গ্রামে গ্রামে সখের যাত্রা করে বেড়ায়। কাজেই রামজীবন ইতস্তত করে বললেন—আজ্ঞে না, অসুবিধে আর কি। তবে নিয়মকানুন জানিনে, তাই—এ পুজো তো বড় একটা হয় না।

—নিয়ম আমি তোমাকে বলে দেব।

তিন দিন ঠাকুর্দা পুঁথি নিয়ে বসে সকাল-সন্ধ্যা রামজীবনকে জ্বরাসুরের পূজার বিধি বোঝালেন। শেষদিন বললেন—এবার একটা দরকারী কথা বলি, শোন। এ ঠাকুরের মূর্তি কিন্তু বিসর্জন হবে না।

রামজীবন বললেন—বিসর্জন হবে না? তবে কি থাকবে?

—না, থাকবেও না।

—তবে?

ঠাকুর্দা কিছুক্ষণ চুপ করে বোধ হয় ভাবলেন কিভাবে ব্যাপারটা বললে ভাল হয়। তারপর বললেন, রামজীবন, পূজো হয়ে গেলে জ্বরাসুরের মূর্তিটা গলিয়ে ফেলতে হবে।

—গলিয়ে ফেলতে হবে! মানে, ওপর থেকে জল ঢেলে মাটি গলিয়ে—

বাধা দিয়ে ঠাকুর্দা বললেন, জল দিয়ে নয়, রক্ত দিয়ে।

—রক্ত!

—হ্যাঁ। বলির পশু আগে থেকেই এনে রাখতে হবে। পুজো হয়ে গেলে একের পর এক বলি পড়বে, আর সেই রক্ত দিয়ে স্নান করানো হবে ঠাকুরকে। বলি চলবে যতক্ষণ না সমস্ত মাটি গলে কাঠামো বেরিয়ে পড়ছে। যত পশু লাগে লাগুক।

রামজীবন নির্বাক হয়ে বসে রইলেন। ঠাকুর্দা বোধ হয় তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন, হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, রামজীবন, আপত্তি করো না ভাই। আর তোমাকে টাকার লোভ দেখাব না। আমার নাতির অসুখ—তার কথা ভাবো। আমার বিশ্বাস এ পুজো না করলে সে বাঁচবে না। রাজী হও ভাই—

মাথা নিচু করে রামজীবন বললেন, ভয় পাবেন না। কথা যখন একবার দিয়েছি, কোনো কারণেই আর ফেরত নেব না। আপনার নাতিকে আমি আশীর্বাদ করছি—

এইভাবে অমাবস্যা এল। ভোর থেকে বাইরে পুজোর জায়গায় জোড়া ঢাক বাজছে। আগের রাত থেকে বাড়ির কেউ আর ঘুমোয় নি। মা এবং ঠাকুমা সারারাত জেগে পুজোর সাজ করে দিয়েছেন। সাধারণত সে সময়ে কারও বাড়ি কোনো কাজ উপস্থিত হলে পাড়ার সবাই সাহায্য

করতে আসত। কিন্তু জ্বরাসুরের মূর্তি দেখে কারও সে সদিচ্ছা জাগেনি। তবে আগে না এলেও পুজোর দিন সকাল থেকেই আশেপাশের চার-পাঁচখানা গ্রাম থেকে লোকজন এসে ভিড় করল। তাদের মধ্যে মূর্তির সামনে কুশাসনের ওপর স্নান করে গরদের কাপড় পরে বসে আছেন রামজীবন চক্রবর্তী। তাঁর হাতে কোষ্ঠীর মত গোল করে পাকানো কাগজ—তাতে তিনি ঠাকুর্দার পুঁথি থেকে পুজোর মন্ত্র নকল করে নিয়েছেন।

বেলা ন'টা নাগাদ ঠাকুর্দা আমার বিছানার পাশে এসে কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখলেন। তারপর নরম গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, খুব কি কষ্ট হচ্ছে দাদু?

বললাম, হ্যাঁ।

মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ঠাকুর্দা বললেন, আর ভয় নেই। এইবার সেরে যাবে। নে, ওঠ দেখি—আমার সঙ্গে চল—

ঠাকুমা বললেন, না না, ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? ও এখানেই থাক—

ঠাকুর্দা মৃদু গলায় বললেন, কিন্তু পুজোর জায়গায় ওকে থাকতে হবে যে।

—না, ও যাবে না—

ঠাকুর্দা আমার মায়ের দিকে ফিরে বললেন, বৌমা, ওঁকে বোঝাও তো। বলো যে আমার নাতিকে আমি কারও চেয়ে কম ভালবাসি না।

মা চুপ করে রইলেন।

আমি বিছানা থেকে কোনোমতে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চল, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

বাড়ির পেছনদিকে খিড়কির পুকুর। তার পাড়ে এনে ঠাকুর্দা বাবাকে বললেন, যাও, ওকে ধরে চান করিয়ে দাও। হাত ধরে নামাও পৈঠা দিয়ে—

পরিবারের সবাই আপত্তি করার ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমার গায়ে তখন কম করে একশো তিন জ্বর। বাবা বিনা বাক্যব্যয়ে আমাকে পুকুরে ডুব দিইয়ে আনলেন। ঠাকুর্দার হাতে গামছা আর নতুন কাপড় ছিল। সেই কাপড় পরে পুজোর জায়গায় গেলাম।

সব লোক যেন কেমন ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ঠাকুরের মূর্তির সামনে বসে ওপরদিকে তাকালাম।

এই প্রথম জ্বরাসুরের মূর্তির সঙ্গে চোখাচোখি হল।

ওঃ, কি ভয়ানক মূর্তিই না বানিয়েছে হরিশ কুমোর। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ শরীরে বড় বড় তিনটে ভাঁটার মত লাল চোখ। গায়ে পেরেকের মত খোঁচা খোঁচা কাঁটা। তিনটে মাথা, ছ'টা পা। পৃথিবীর সব কুশ্রীতাকে একত্র করে এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের জন্ম দিয়েছে এর স্রষ্টা।

বাবা-ঠাকুর্দা আগেই স্নান সেরে নিয়েছিলেন। তাঁরা দুজনে আমার দু'পাশে বসলেন। পুজো শুরু হল।

চারদিকে বেদম ঢাকের আওয়াজ। ধুনোর ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার। রামজীবন চক্রবর্তী দৃপ্তস্বরে মন্ত্রপাঠ করে চলেছেন। আমি দুর্বল শরীরে কোনোমতে আসনে বসে আছি মাত্র। ঠাকুর্দা একহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে রয়েছেন।

ঘণ্টাখানেক বাদে পুজো শেষ হল। রামজীবন হেঁকে বললেন, সরে যাও সব এবার বলি—

ঠাকুর্দা কত করেছিলেন আমার জন্যে। অত বড় মূর্তি গলাতে কত ছাগল বলি দিতে হবে তার ঠিক কি? কাজেই নিখুঁত দেখে বহু ছাগল যোগাড় করে রাখা ছিল। ঠাকুর্দার ইঙ্গিতে নিবারণ কামার রামদা হাতে এগিয়ে এসে কাজ শুরু করল।

সমবেত সবাই নির্বাক আতঙ্কে তাকিয়ে দেখছে। অত মানুষ জড়ো হয়েছে সেখানে, কিন্তু এতটুকু শব্দ নেই কোথাও। জ্বরাসুরের শরীর বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে টাটকা রক্তের ধারা। সেই

লাল রক্তে স্নান করে বিকট মূর্তিকে যেন বিকটতর লাগছে। একটু একটু করে ধুয়ে যাচ্ছে রঙ, গলে যাচ্ছে চোখ-মুখ—বিকৃত অর্ধগলিতাঙ্গে কি বীভৎস হাসি হাসছে দুঃস্বপ্নের দেবতা! বেশিক্ষণ তাকাতে পারলাম না, চোখ সরিয়ে নিলাম। পেছনে তাকিয়ে দেখি অনেকেই এ দৃশ্য সহ্য করতে পারেনি। কখন নিঃশব্দে পূজামণ্ডপ শূন্য হয়ে এসেছে। সেই শূন্যতার মধ্যে কেবল একটু বাদে বাদে উঠছে নামছে নিবারণ কামারের রামদা। তারও চোখ জ্বরাসুরের মত লাল হয়ে উঠেছে, সর্বাঙ্গে চকচকে ঘাম।

একসময় চারদিকের রঙিন থক্‌থকে কাদার মধ্যে জ্বরাসুরের মূর্তির অবয়বহীন কাঠামোটা দাঁড়িয়ে রইল কেবল। আর সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আমি এলিয়ে পড়েছি ঠাকুর্দার কোলের ভেতর। ঠাকুর্দা বুকের মধ্যে ধরে আমাকে বাড়িতে নিয়ে এলেন। আবার আমাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। অবস্থা দেখে ঠাকুমা আমার মাথা কোলে নিয়ে বসলেন, বাবা নিজে বাতাস করতে লাগলেন পাখা দিয়ে। মা চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদছেন। কেবল ঠাকুর্দা অবিচলিত, তিনি তখনই আবার বেরিয়ে গেলেন। জ্বরাসুরের কাঠামোটা নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে দাহ করে ফেলতে হবে। তাই নাকি নিয়ম।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার কি জানো—জ্বরাসুর জাগ্রত দেবতা বলেই হোক, বা ঠাকুর্দার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির ফল হিসেবেই হোক—সবাইকে অবাক করে পরদিন আমার জ্বর ছেড়ে গেল। গেল এবং আর এল না। তারপরও কিছুদিন বাড়ির সবাই ভয়ে ভয়ে থাকত, একটু বাদে বাদে আমার কপালে হাত দিয়ে দেখা হত। কিন্তু সত্যিই জ্বর আর এল না।

ঠাকুর্দার সম্মান দারুণ বেড়ে গেল। শুধু পরিবারের ভেতরে নয়, আশেপাশের বহু গাঁয়ের লোক তাঁকে একজন বিচক্ষণ মহাপুরুষ বলে মনে করতে লাগল। সারাদিন ধরে বিস্তর লোক নানান পরামর্শ নিতে আসত। ফূর্তির চোটে ঠাকুর্দা অর্ডার দিয়ে কাশী থেকে উৎকৃষ্ট অম্বুরী তামাক আনালেন। অবশ্য এ সম্মান বেশিদিন ভোগ করতে পারেননি তিনি। আমার জ্বর সারার ঠিক ছ'মাসের মাথায় ঠাকুর্দা মারা যান। যন্ত্রণাহীন মৃত্যু, কাউকে কষ্ট দিলেন না, বিছানাতেও পড়ে রইলেন না। একদিন সকালে তাঁকে ডাকতে গিয়ে দেখা গেল বিছানায় তাঁর প্রাণহীন দেহ পড়ে। রাত্তিরে ঘুমের মধ্যে কখন প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে। বোধ হয় মৃত্যু আসন্ন অনুভব করে ইষ্টমন্ত্র জপ করছিলেন, কারণ ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে কর ধরা ছিল। সবাই বলল—সন্ন্যাস রোগ। এইভাবে ঠাকুর্দা চলে গেলেন।

ঘটনাটা এইখানেই শেষ হতে পারত, কিন্তু হল না। বিধাতাপুরুষ বড় রসিক। আমি জানতাম না যে এই ঘটনার একটা বৃহত্তর উপসংহার রয়েছে। জানলাম প্রায় পঁচিশবছর পরে। তখন আমার অনেক সাধুসঙ্গ করা হয়ে গিয়েছে। পাকা ভবঘুরে তান্ত্রিক তখন। একদিন ঘুরতে ঘুরতে এক গ্রামের প্রান্তে একজন সাধুর মঠে আশ্রয় নিয়েছি সন্ধ্যেবেলা। বেশ সৌম্যদর্শন সাধু। ভারী ভাল ব্যবহার করলেন আমার সঙ্গে। তাঁর আদেশে তাঁর শিষ্যরা আমাকে যত্ন করে খাওয়াল রাত্তিতে। সুন্দর শোবার জায়গা করে দিল। পরদিন সকালেই আমি চলে যাব। তাই রাত্তিরে খাওয়ার পরে সাধুর কাছে তাঁর আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিতে গেলাম। প্রাথমিক আলাপের পর নানা বিষয়ে কথাবার্তা আরম্ভ হল। অনেক রাত অবধি গল্প চলল, কথায় কথায় সাধুকে জ্বরাসুরের পুজোর ব্যাপারটা বললাম।

শুনে সাধু চমকে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, সে কি! তোমার ঠাকুর্দা জ্বরাসুরের পুজো করেছিলেন! সে যে বড় সাংঘাতিক দেবতা! তার কথা তোমার ঠাকুর্দা জানলেন কি করে?

বললাম, ঠাকুর্দার অনেক পুরনো পুঁথি ছিল। আমাদের পারিবারিক সম্পত্তি, তাতেই পেয়েছিলেন।

সাধু বললেন, কিন্তু সমস্ত বিবরণ পড়েও তিনি পুজোয় নেমেছিলেন? পুজোর সংকল্প কার নামে হয়েছিল?

বললাম—ঠাকুর্দার নামেই। বাবা নিজের নামে করতে চেয়েছিলেন, ঠাকুর্দা রাজী হননি—

—পুঁথিটা আস্ত ছিল?

এবার আমার মনে পড়ে গেল! বললাম, না, শেষের পাতার অর্ধেকটা কিভাবে যেন পুড়ে গিয়েছিল। অবশ্য তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি—

সাধু বললেন, হয়েছে। ক্ষতি হয়েছে।

অবাক হয়ে বললাম, কি রকম?

সাধু উঠে গিয়ে ভেতর থেকে একটা পুঁথি নিয়ে এলেন। আমাকে বললেন, এই দেখ। আমার কাছেও একখণ্ড আছে। শেষ পাতা পুড়ে না গেলে ঠাকুর্দা দেখতে পেতেন, জ্বরাসুরের পুজোর নিয়মের শেষে সাবধান করে দিয়ে লেখা আছে—যার নামে সংকল্প হবে, ছ'মাসের মধ্যে তার মৃত্যু হবেই। ছ'মাস পরেই তো তোমার ঠাকুর্দা মারা গিয়েছিলেন বলছ?

আমি নির্বাক হয়ে বসে রইলাম। আজ কোথায় বা স্নেহময় ঠাকুর্দা, কোথায় বা ঠাকুমা—মা—বাবা? সব স্বপ্নের মত মিলিয়ে গিয়েছে।

একটু পরে বললাম, সাধুজী আপনার বোধ হয় একটু ভুল হচ্ছে—

উনি বিস্মিত হয়ে বললেন, ভুল?

—হ্যাঁ। ও পাতাটা আস্ত থাকলেও ঠাকুর্দা পুজো করতেন। আমি ঠাকুর্দার নয়নের মণি ছিলাম।

সাধু চুপ করে রইলেন।

আমিও আর কিছু বললাম না। কিন্তু আর একটা কথা আমার মনে ঘোরাফেরা করছিল। এখন তা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তা হচ্ছে এই যে, ঠাকুর্দা নিজেই ও পাতার শেষটা পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। পাছে কেউ পড়ে ফেলে তাঁকে বাধা দেয়—তাই। আমাকে ঠাকুর্দা বড়ই ভালবাসতেন।

তারানাথ গল্প থামিয়ে চুপ করে রইল। জল চক্‌চক করছে নাকি তার চোখে? এই প্রথম আমি আর কিশোরী তারানাথের গল্পের শেষে বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠাতে পারলাম না।

তারানাথ বলল—ক্ষমতার অপব্যবহার করতে নেই। শুধু তন্ত্রমন্ত্রের মাধ্যমে পাওয়া ক্ষমতার কথা বলছি না, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই সংযমের খুব প্রয়োজন। নইলে বিপদ ঘনিয়ে আসে। তোমরা তো কলেজে পড়া ছোকরা, ইতিহাসে পড়েছ নিশ্চয়, ক্ষমতার অযথা ব্যবহার করতে গিয়ে বড় বড় রাজা-রাজড়াদেরও কি অবস্থা হয়েছে?

তারানাথের চাইতে বয়েসে অনেক ছোট হলেও আমি বা কিশোরী আর ঠিক যাকে ছোকরা বলে সে দলে পড়ি না। তবু তারানাথ আমাদের মাঝে মধ্যে ছোকরা বলে সম্বোধন করে এবং আমরা মেনে নিয়ে থাকি।

কিশোরী বলল—তত্ত্বকথা শুনতে ইচ্ছে করছে না, বরং ক্ষমতার অপব্যবহার বিষয়ক কোনো জমাট গল্প বলেন তো শুনি।

তারানাথ হেসে বলল—কারো সর্বনাশে কারো পৌষ মাস হয় এ কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। একটা জমাট গল্প মানে কোনো একজনের ভয়ানক বিপদের গল্প তো? তোমাদের গল্পের যোগান দিতে হলে দেশে হাহাকার পড়ে যাবে।

বললাম—অনেকদিন ভাল গল্প হয়নি। আজ কোনো ফাঁকি চলবে না। আজ গল্প বলতেই হবে।

তারানাথ বলল—একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। কিন্তু কারো কষ্ট নিয়ে বা দুঃখের ইতিহাস নিয়ে গল্প ফেঁদে বসতে আমার সঙ্কোচ হয়। তবু বলছি এই কারণে যে, এর ভেতর দিয়ে একটা জনশিক্ষার কাজও হয়ে যাবে।

কিশোরী বলল—জনশিক্ষার ব্যাপারটা গল্পের শেষে মর‍্যালের মত জুড়ে দেবেন এখন। আপাতত গল্পে আসুন।

তারানাথ আমাদের দিকে ইঙ্গিতবহ উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাতেই কিশোরী তার পকেট থেকে পাসিং শো-র প্যাকেট বের করে সামনে রাখল। মৌজ করে কয়েকটা টান দিয়ে বলতে শুরু করল—দেখ, আমি একজন সাধারণ মানুষ। যাকে সাধক বলে আমি তা নই। কারণ সত্যিকারের সাধনা করবার সুযোগও আমি কোনোদিন পাইনি, পেলেও করতাম কিনা সন্দেহ। আসল ব্যাপারের চেয়ে এই পথে পথে বেড়িয়ে বেড়ানো, নানা বিচিত্র চরিত্রের মানুষের সঙ্গে আলাপ হওয়া—জীবনের এই দিকটাই আমাকে বেশি মুগ্ধ করত। নইলে সত্যিকারের সাধনা করলে আমি অনেকদূর উঠতে পারতাম। তোমাদের এতদিন বলিনি, আমার একবার প্রকৃত তান্ত্রিক দীক্ষাও হয়েছিল! গুরুর নাম বলব না, তাঁর বারণ আছে। এবং আমার দীক্ষাও হয়েছিল শুভলগ্নে। তান্ত্রিক দীক্ষা অনেক বিচার করে লগ্ন দেখে দিতে হয়। শুক্লপক্ষে দীক্ষা হয় না। কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী, সপ্তমী—এসব তিথি খুব ভাল। অক্ষয় তৃতীয়া বা দশহরার দিন হতে পারে। কিন্তু তন্ত্রমতে এসবের চেয়েও প্রশস্ত দিনে আমার দীক্ষা হয়।

কিশোরী বলল—যেমন?

—আমার দীক্ষা হয়েছিল সূর্যগ্রহণের সময়। গুরু যজ্ঞ শেষ করে আমার কপালে তিলক এঁকে যখন গলায় পদ্মবীজের মালা পরিয়ে দিলেন, তখন মাথার ঠিক ওপরে সূর্যে গ্রহণ লেগে রয়েছে। গুরু আমার কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন—তোর উন্নতি হবে। এমন লগ্ন সবাই পায় না। উন্নতি অবশ্য কিছু হয়নি, তবে কয়েকটা ক্ষমতা পেয়েছিলাম সে তো তোমরা জানোই। গুরু এ-ও বলে দিয়েছিলেন—বেটা, সাধনা করলে অসীম শক্তি পাবি। কিন্তু সেই শক্তি নিজের স্বার্থে অপরের ক্ষতি করবার জন্য কাজে লাগালে সর্বনাশ হবে। তন্ত্রের এই নিয়ম। সাবধান থাকিস্—পা যেন না ফসকায়।

গুরুর কথামত চলতে পারিনি। অপরের ক্ষতি করিনি বটে, কিন্তু লোভে পড়ে আধ্যাত্মিক উন্নতির বদলে বৈষয়িক উন্নতি চেয়েছিলাম। ফলে শক্তি কমে গিয়েছে। নেহাত মধুসুন্দরী দেবী বলেছিলেন, কোনোদিন ভাত-কাপড়ের জন্য ভাবতে হবে না—তাই চলে যায় একরকম করে।

যাক্ এসব কথা। একদিন বসে আছি এই বৈঠকখানা ঘরে। সময়টা সকাল। আগের দিন এক ব্যাটা মাড়োয়ারীকে কোন্ শেয়ার ধরে রাখলে লাভ হবে বলে দিয়ে বেশ কিছু নগদ লাভ করেছিলাম। পড়তির মুখেও আমার কথায় ভরসা করে সে শেয়ার ধরে রেখে দেয়। পরের দিন মাঝরাতে বম্বে থেকে ট্রাঙ্ককল পায়—ওই শেয়ারের দর হঠাৎ বাড়তির দিকে। সাত দিনে কয়েক লাখ টাকা মুনাফা করে গতদিন সে এসে বেশ মোটা প্রণামী দিয়ে গিয়েছে। মনটা বেশ ফুর্তি-ফুর্তি লাগছে। এমন সময় দরজার কাছে একজন লোক এসে দাঁড়াল। পরনে ধুতি আর টুইলের শার্ট, পায়ে পাম্পশু। বয়েস আমারই মত হবে। আমাকে দেখে লোকটা বলল—আচ্ছা, এটা কি—

বললাম—আজ হাত দেখা হবে না।

—তারানাথ কার নাম?

লোকটা 'তারানাথবাবু' বা 'ঠাকুরমশাই' বলল না দেখে তার অভদ্রতায় নিতান্ত চটে গিয়ে বললাম—আমারই নাম। কেন, কি চাই?

লোকটা কাছে এসে একটু সামনে ঝুঁকে ভাল করে আমাকে দেখে বলল—হ্যাঁ, তাই বটে। তুই তো তারানাথ। আমাকে চিনতে পারছিস না?

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে সে বলল—অবশ্য তোরই বা দোষ কি? সে কি আজকের কথা? চিনতে পারলি না? আমি বিরজাভূষণ—বিরজাভূষণ তালুকদার।

আরো কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকবার পর আমার মনে পড়ে গেল। আমাদের ইস্কুল-জীবনের সেই ভূষণ! পেছনের বেঞ্চিতে বসত, আর অনর্গল পকেট থেকে ডাঁশা পেয়ারা বের করে চিবোতো। তার পুরো নাম বিরজাভূষণই তো ছিল বটে।

আমি তক্তাপোশ থেকে উঠে তার হাত ধরে বললাম—মাপ কর ভাই, সত্যিই প্রথমটা চিনতে পারিনি। কবেকার কথা সব! চেহারাও একেবারে বদলে গিয়েছে। তারপর কি খবর বল? বোস—

বিরজা চৌকিতে বসে বলল—খবর ভালই। রাজাগজা কিছু হইনি, কিন্তু বেশ কেটে যাচ্ছে, বুঝলি? তুই কেমন আছিস বল—

সংক্ষেপে বললাম—ভালই। আমারও কেটে যাচ্ছে।

—শুনলাম তুই নাকি নামকরা জ্যোতিষী হয়েছিস? লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে নাকি ভাগ্য বলে দিস্? কলকাতায় এসে ভাবলাম তোর সঙ্গে দেখা না করে যাব না।

—বেশ করেছিস। থাক না আমার কাছে ক'দিন।

বিরজা মাথা নেড়ে বলল—থাকা হবে না। আজকের রাতটা হয়তো থাকব, কিন্তু কাল সকালেই রওনা দিতে হবে।

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া সেরে দুই বন্ধু বাইরের ঘরের চৌকিতে এসে বসলাম। ঘুম আর হল না, গল্প করতেই রাত ফুরিয়ে গেল।

বিরজাভূষণ কলকাতায় এসেছিল একটা মামলার তদারক করতে। ওদের সমস্ত সম্পত্তি বাবা মারা যাবার পর দু' ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। এক ভাগ পেয়েছে বিরজা, অন্য ভাগ পেয়েছে তার আপন দাদা অম্বিকাভূষণ। দাদাকে পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে দিয়ে নিজে একটু দূরে আলাদা বাড়ি তৈরি করে নিয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি ভাগাভাগির ব্যাপারে কি একটা ত্রুটি বের করে অম্বিকাভূষণ ভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করেছেন। যে সম্পত্তি নিয়ে মামলা, তার মূল্য বিশ হাজার টাকার চেয়ে বেশি। কাজেই মামলা এসেছে হাইকোর্টে। এ নিয়ে অনেক দুঃখ করল বিরজা। দেখলাম ওর সেই পুরনো দিনের ভালমানুষী এখনো যায়নি। যে দাদা তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে, তার জন্যই সে দুঃখ করছে।

পরের দিন যাবার সময় বিরজা বলল—একবার আমাদের গাঁয়ে চল্ না, বেড়িয়ে আসতে পারবি। দেশের দিকে যাস্‌ও না অনেকদিন। যাবি?

কথাটা ঠিক। গ্রামে আমাদের বাড়িও প্রায় ধূলিসাৎ হয়ে পড়েছে। থাকার বা দেখাশুনো করবার কেউ নেই। কাজেই কিসের টানে আর সেখানে যাব? অবশ্য বিরজার বাড়ি আমাদের গ্রামে নয়, মধ্যে আর একটা গ্রাম পেরিয়ে প্রায় মাইল তিনেক দূরের চড়ুইটিপ নামের এক গ্রাম থেকে সে পড়তে আসতো। স্কুলে পড়ার সময় মাত্র একবারই তার গ্রামে গিয়েছিলাম। এখন আর ভালো মনে পড়ে না।

বললাম—আচ্ছা, যাব এখন। দেখি, একটু সময় করে উঠতে পারলেই—

বিরজা বলল—দেখ্ ওসব ছেঁদো কথায় আমাকে ভোলাতে পারবি না। সময় করে উঠতে পারলে মানে কি? তুই কি কারো চাকরি করিস? ওসব বললে চলবে না। সামনের মাসের প্রথম দিকে আমায় আবার কলকাতায় আসতে হবে। মামলার তারিখ পড়েছে। সেদিন তোর এখানেই এসে উঠব। তুই আগের থেকে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখিস, ফেরবার সময় তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

বললাম—বেশ, তাই হবে।

পরের মাসে বিরজার সঙ্গে আমাদের গ্রামের স্টেশনে গিয়ে নামলাম কত বছর পরে! সেই হারানো শৈশবের সোনালী দিনগুলো স্বপ্নের মত মনে আসে। হায়, যা যায় তা একেবারেই যায়।

স্টেশন থেকে আমাদের গ্রাম সাত মাইল, আর বিরজার গ্রাম মাইল দশেক। স্টেশনে নেমে দেখি আমাদের জন্য গরুর গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিরজা ব্যবস্থা করে রেখেছিল আগে থেকে। গরুর গাড়ি চেপে অনেক বছর পরে আবার কাঁচা রাস্তা দিয়ে দুলতে দুলতে যাওয়া! এত ভালো লাগছিল যে, বিচার করে দেখে বুঝতে পারলাম শহরে বাস করলেও শহরকে আমি আদৌ ভালোবাসি না। গ্রাম আমার রক্তে মিশে রয়েছে।

চড়ুইটিপ গ্রামটা দেখতে ভালো। গ্রামের প্রান্ত দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ছোট্ট একটি নদী। নদীর ধারে ঝোপঝাড়। সমস্ত গ্রামে কোথাও খুব ঘন জঙ্গল না থাকলেও ছাড়া ছাড়া গাছপালা প্রচুর। তিন-চারটে পাকা বাড়ি চোখে পড়ল। এ ছাড়া সবই হয় চালাঘর, নয়তো করোগেট টিনের ছাদওয়ালা বাড়ি।

বিরজা আর তার দাদার বাড়ি পাশাপাশি, মধ্যে একটুকরো জমি। পাশাপাশি, কিন্তু মুখ দেখাদেখি নেই। যে বাড়িতে বিরজা আমাকে এনে তুলল, সে বাড়ি সে নতুন করেছে। ছোটবেলায় আমি এসেছিলাম পাশের ওই পুরনো বাড়িতে, যেখানে এখন অম্বিকাভূষণ থাকেন।

শৈশবের স্মৃতিমণ্ডিত কোনো জায়গায় অনেকদিন পরে গেলে যে আনন্দ অনুভব করা উচিত, সেরকম খুব একটা হল না। কারণ গ্রামে ঢুকতেই আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। তোমরা তো জান, দেবী আমাকে কিছু অতিমানবিক ক্ষমতা দান করেছিলেন। গ্রামে ঢুকেই আমার মনে হল—এখানে একটা অমঙ্গলজনক কিছু ঘটছে। সেটা কি, তা তখনই বুঝতে পারলাম না বটে, কিন্তু মনের ভেতর কেমন অস্বস্তি পাক খেতে লাগল।

বিরজা জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে? অমন মুখ করে রইলি কেন?

বললাম—কিছু না। এমনি।

বিরজার বৌটা ভারি ভালো, বেশ সাধ্বী মেয়ে। আমাকে আগে কখনো দেখেনি বটে, কিন্তু হাবভাব দেখে বুঝতে পারল আমি তার স্বামীর খুব বড় বন্ধু। চড়ুইটিপ গাঁয়ে এখনো শহুরে চালচলনের ঢেউ এসে দোলা দেয়নি। সেকালের মত একটা জলভর্তি গাড়ুর ওপরে পাটকরা গামছা এনে রেখে গেল বিরজার বৌ। হাতমুখ ধুয়ে দুই বন্ধু বাইরের ঘরে তক্তাপোশে বসে গল্প করতে লাগলাম। সবই আমাদের সেই রঙিন হারিয়ে যাওয়া ছোটবেলার গল্প।

গল্প করছি, কিন্তু পোকায় খাওয়া দাঁতের ব্যথা যেমন সর্বদা সব কাজের মধ্যে জানান দেয়, তেমনি মনের ভেতরকার অস্বস্তিটাকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারলাম না। বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, আমার এ অনুভূতি সচরাচর ভিত্তিহীন হয় না। এ গ্রামে কোথাও একটা খারাপ কিছু ঘটছে। কি সেটা?

আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছি দেখে বিরজা ভাবল আমি বোধ হয় ক্লান্ত। সে গল্পে ক্ষান্ত দিয়ে উঠে খাওয়ার কতদূর দেখতে গেল।

পরের দিন খুব ভোরে উঠে আমি আর বিরজা নদীর ধারে বেড়াতে গেলাম। ছোট গ্রাম্য নদী, কিন্তু কচুরিপানায় তার স্রোত বন্ধ হয়ে যায়নি। বেশ কাকচক্ষু জল ধীরগতিতে বয়ে চলেছে। সকালের স্নিগ্ধ হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে যায়। একটু পরিষ্কার জায়গা দেখে দুজনে বসলাম। আমার বাঁ-পাশে একটা বড় বাব্‌লা গাছ। তার ডালপালা অনেকখানি জলের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। গুঁড়ি থেকে কিছু ওপরে এক জায়গায় তিনটে মোটা ডাল তিন দিকে বেরিয়েছে। সেখানে একটা কাকের বাসা। কাকের বাচ্চা হয়েছে বোধ হয়। মা-কাক বসে বাচ্চা পাহারা দিচ্ছে, আর বাবা-কাক একটু বাদে-বাদেই কি মুখ করে এনে বাচ্চাদের খাইয়ে যাচ্ছে। ওপারে চাষীরা জমিতে লাঙল দেবার উদ্যোগ করছে। গ্রামে এত সকালেই দিন শুরু হয়ে যায়। শহরে অর্ধেক লোক বোধ হয় এখনো বিছানা ছেড়ে ওঠেনি।

খোলা জায়গা, বেলা বেশি না হলেও রোদ্দুর ওঠার পর আর বসা গেল না। বিরজা বলল—চল্ উঠি। মমতা খাবার করে বসে আছে এতক্ষণ—

ফেরবার সময় আগে পড়ে অম্বিকাভূষণের বাড়ি। দেখলাম একজন প্রৌঢ় মানুষ, পরনে খাটো ধুতি, বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, গলায় একছড়া মোটা রুদ্রাক্ষের মালা—বসে বসে তামাক খাচ্ছেন। সেদিকে না তাকিয়ে বিরজা চুপিচুপি বলল—ওই আমার দাদা।

অম্বিকাভূষণ আমাদের দিকে তাকিয়েও দেখলেন না। আমরা বাড়ির সামনে দিয়ে পার হয়ে যাবার আগেই ভেতরবাড়ি থেকে একজন লাল কাপড় পরা সন্ন্যাসী গোছের চেহারার লোক বেরিয়ে এসে অম্বিকাভূষণের পাশে বসে একবার আমাদের দিকে তাকাল। বিশ্রী দৃষ্টি লোকটার। মাথায় সামান্য জটাও আছে। নিম্নশ্রেণীর তন্ত্রসাধকের মত চেহারা। জায়গাটা পার হয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—ওই লোকটা কে রে? বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল? তোর দাদার গুরু নাকি?

পেছন ফিরে একবার দেখে বিরজা বলল—নাঃ, দাদা মন্ত্র নেয়নি। তবে সাধু-সন্নিসি করার খুব ঝোঁক। মঝে-মাঝেই এমন দু'চারটেকে এনে পোষে। এ ব্যাটাকে দেখছি আজ কয়েকদিন যাবৎ। কিছুদিন শুষে চলে যাবে আর কি!

দুপুরে দুজনে বৈঠকখানায় বসে কথাবার্তা বলছিলাম। বহুদিন পরে শহর থেকে বাইরে বেরিয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। কোলাহল নেই, লোকজনের ঝামেলা নেই, রোজ সকালে বাজার থেকে শুঁটকো তরকারি আর আধপচা মাছ কিনে আনবার তাড়া নেই। এখানে সকাল-বিকেল শুধু খাচ্ছি আর বৈঠকখানায় বসেই তামাক খেয়ে আড্ডা দিচ্ছি। পরিবেশও বেশ শান্ত। বেড়াতে বেরুলে মেঠো পথ, বাঁশঝাড়ের নুয়ে পড়া ডগার ওপরে বসে পাখির গান—মনে হয় এসব ছেড়ে এতদিন ছিলাম কি করে?

কথায় কথায় হঠাৎ বিরজা বলল—তারানাথ, তুই তো আজকাল শহরে থাকিস, আমার জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করা যায় না?

বুঝতে না পেরে বললাম—কিসের ব্যবস্থা?

—ওসব দিকে আমার একটা চাকরি হয় না?

হেসে বললাম—তুই চাকরি করবি কি রে! তোর বংশে কেউ কোনোদিন পরের কাজ করেনি। আর তাছাড়া সেরকম কারো সঙ্গে আমার পরিচয় নেই—

বিষণ্ণমুখে বিরজা বলল—মনে হচ্ছে দাদার সঙ্গে এই মামলায় আমি পেরে উঠব না। যদি জিতি তাহলে সর্বস্বান্ত হয়ে যাব। তখন তো চাকরি ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না ভাই।

এ কথার আর কি উত্তর দেব? চুপ করে বসে রইলাম।

রাত্তিরবেলা গরমে ঘুম আসছিল না। এই দু'দিন বিরজার বাড়িতে থাকাকালীন মনের এই অস্বস্তির ভাবটা কিন্তু দূর হয়নি। রাত্তিরে শুয়ে এ ব্যাপারে ভাববার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনো সুরাহা করতে পারলাম না।

সকালে বিরজা আর আমি নদীর ধারে বেড়াতে যাওয়া একটা অভ্যেস করে ফেলেছিলাম। আস্‌শেওড়ার ডাল ভেঙে দাঁতন করতে করতে আমরা ভোরবেলা রওনা দিলাম নদীর দিকে। একেবারে স্নান করে তবে ফিরবো।

সারারাত গুমোট গরমের পরে সকালে স্নিগ্ধ নদীজলে অবগাহন যে কি তৃপ্তির সে তোমরা শহরের মানুষেরা কি বুঝবে! জলে নেবে ডুব দিয়ে পরে মাথা তুলে দেখলাম যেখানে দাঁড়িয়ে ডুব দিয়েছিলাম, সেখান থেকে বেশ কিছুটা সরে এসেছি। বিরজা হেসে বলল—আমাদের ছোট নদী হলেও বেশ স্রোতের টান আছে, কি বল?

অবাক হয়ে বললাম—কিন্তু পরশু সকালেও তো টান ছিল না হঠাৎ বাড়ল কেন?

—ও হয়। এমনিতে জোয়ার-ভাঁটা বিশেষ খেলে না। কিন্তু অমাবস্যা আর পূর্ণিমার সময় স্রোত বাড়ে—

—অমাবস্যা কবে?

—ঠিক জানি না। দিন চারেক বাকি আছে বোধ হয়।

স্নান সেরে পাড়ে দাঁড়িয়ে গা মুছতে মুছতে নদীর ধারের ঝুঁকে পড়া বাব্‌লা গাছটার দিকে চোখ পড়ল।

প্রথমটা খেয়াল করতে পারিনি, পরে হঠাৎ মনে হল গাছটায় কি যেন একটা নেই।

একটা জায়গা যেন কেমন ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখাচ্ছে। কি নেই ওখানে?

পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম। সেই কাকের বাসাটা!

বিরজা বলল—কি হয়েছে তোর? কি দেখছিস ওদিকে?

আঙুল দিয়ে গাছটার দিকে দেখিয়ে বললাম—দেখ্ কাকের বাসাটা আর নেই।

—কাকের বাসা!

—হ্যাঁ, কালকেও এখানে ওই ডালের তেকোনায় একটা কাকের বাসা দেখে গিয়েছি। আজ আর দেখছি না। কি হল? কাল তো ঝড়-টড় হয়নি যে পড়ে যাবে।

বিরজা শুকনো কাপড় পরতে পরতে বলল—যাঃ, ঝড়ে কখনো কাকের বাসা পড়ে! ওরা দারুণ শক্ত করে বাসা বাঁধে। অবশ্য খুব বড় ঝট্‌কা হলে পড়তে পারে—

বললাম—কিন্তু সেরকম তো হয়নি!

—ছাড়্ দেখি। একটা কাকের বাসা নিয়ে মাথা ঘামাবার কি আছে?

হায়! কি ঘটতে চলেছে জানলে কি বিরজা অত শান্তভাবে কথা বলতে পারত।

এই ঘটনার পরেও কিন্তু আমি কিছু আন্দাজ করতে পারিনি। পারা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু কখনো কখনো জীবনে আশ্চর্য অঘটনের ভিড় লেগে যায়। সকালে যার কথা খুব ভেবেছি, বিকেলে দশ বছর পরে হয়ত সেই বন্ধু এসে হাজির হল। কিংবা হয়ত সকালে একটা তালা এবং বিকেলে সেই তালাটারই চাবি রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া যায়। এর পরের দিনই সে ধরনের একটা ব্যাপার ঘটায় আমি মনে মনে দুই আর দুই যোগ করে দিলাম।

চড়ুইটিপ থেকে মাইল আষ্টেক পশ্চিমে বসন্তপুর বলে একটা গ্রাম আছে। সে গ্রামের কল্যাণেশ্বর শিব খুব জাগ্রত। প্রতি বছর চড়কের সময় বড় মেলা বসে। মন্দিরও নাকি বহুদিনের পুরনো; গায়ে পোড়ামাটির কাজ রয়েছে শুনে বিরজাকে বলেছিলাম একবার দেখতে যাবার কথা। বিরজা গ্রামের আবিদ শেখকে বলে রেখেছিল, পরের দিন সকালে তার ঘোড়ার গাড়ি

নিয়ে আসতে। সমস্ত গ্রামে আবিদেরই একমাত্র গাড়ি। মাঝে মাঝে স্টেশনে গিয়ে ভাড়া খাটে, অবসর সময়ে পড়ে পড়ে ঘুমোয়।

সকালে তৈরি হয়ে বসে আছি, কিন্তু বেলা ক্রমে বেড়ে চলে, আবিদ শেখ আর গাড়ি নিয়ে আসে না। বিরজা বিরক্ত হয়ে বলল—দূর! যত সব কুঁড়ে লোক নিয়ে কারবার! এত বেলা হয়ে গেল, আজ আর যাওয়া হবে না। গেলে ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে। নে, জামা-কাপড় খুলে ভালো করে বোস্।

এইসব বলা-কওয়া হচ্ছে, এমন সময় স্নানমুখে আবিদ শেখ এসে উপস্থিত।

বিরজা চটে বলল—কেমন তোমার কাণ্ডজ্ঞান আবিদ! সেই কখন থেকে বসে আছি, আজ আর যাওয়াই হল না! কি হয়েছিল তোমার? গাড়ি কই?

আবিদ শেখ বিষণ্ণ মুখে বলল—আর বলবেন না কর্তা, সকালে উঠেই ঘোড়া জুতে গাড়ি নিয়ে আসছিলাম। কিন্তু ঘোড়া কিছুতেই গাড়ি টানবে না। কত গুঁতোগাঁতা দিলাম, তবু ঘোড়া ঠায় দাঁড়িয়ে। অনেকদিনের পোষা জানোয়ার কর্তা, কথা বললে শোনে। পরে মনে হল ওর ঘাড়ে ব্যথা হয়েছে কোন কারণে, গাড়ি টানতে গেলে ব্যথা লাগছে। নেমে এসে দেখি ঠিক তাই। ঘাড়ের কাছে একটা বেশ বড় কাটার দাগ। ও ঘোড়া নিয়ে তো আজ আর বেরুনো যাবে না কর্তা! জোর করে চালাতে গেলে মাঝপথে ক্ষেপে গিয়ে গাড়ি উলটে দিতে পারে।

বিরজা বললে—ঘোড়া জখম হল কি করে? জোয়ালে পেরেক-টেরেক কিছু বেরিয়ে আছে নাকি?

—আজ্ঞে না, সে আমি দেখেছি।

—তাহলে?

মাথা চুলকে আবিদ শেখ বলল—আমিও তো তাই ভাবছি, কিসে ঘা খেল জানোয়ারটা?

—যাক গে, যাও তুমি। তোমার ঘোড়া ভালো হয়ে ওঠা অবধি যদি আমার বন্ধু থাকে, তাহলে একদিন মন্দির দেখতে যাওয়া যাবে।

আবিদ শেখ চলে যেতে বিরজা আমার দিকে তাকিয়ে বলল—লোকটা মিথ্যে কথা বলছে কিনা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আবিদ এমনিতে ভালো কিন্তু বড্ড কুঁড়ে। হয়ত আজ আর মেহনত করতে ইচ্ছে নেই। ঘোড়া ফের আস্তাবলে তুলে দিয়ে সারাদিন পড়ে ঘুমোবে।

আমি তখন দুয়ে দুয়ে যোগ দিচ্ছি। বললাম—না হে, লোকটা বোধ হয় মিথ্যে কথা বলছে না।

বিরজা একটু অবাক হয়ে বলল—তার মানে? তুমি ওর ভালোমানুষের মত মুখ দেখে গলে গিয়েছ নাকি? আবিদ কিন্তু ভয়ানক মিথ্যেবাদী।

—তা হতে পারে। তবে এবার বোধ হয় সত্যি কথাই বলেছে।

কি বলতে গিয়ে বিরজা থেমে গেল। একটু ইতস্তত করে বলল—হবেও বা। তোর তো আবার কি সব ক্ষমতা আছে লোকের মুখ দেখে মনের কথা বলে দেবার!

আমি এ নিয়ে আর কথা বাড়ালাম না, বিরজাও চুপ করে গেল।

সকালে বসন্তপুর যাবার জন্য তৈরি হয়ে বসেছিলাম, কাজেই নদীর ধারের দৈনন্দিন ভ্রমণ আজ আর হয়ে ওঠেনি। দুপুরে খাওয়ার পর নিটোল একটি দিবানিদ্রা দিয়ে উঠে দেখলাম বেলা গড়িয়ে গিয়েছে! এখনই বেরিয়ে পড়লে কিছুক্ষণ নদীর ধারে বসা যায়। মুখেচোখে জল দিয়ে রওনা দিলাম।

গ্রামের দিকে দিনশেষের একটা সুন্দর রূপ আছে, যা শহরে তোমরা টের পাও না। আস্তে আস্তে আমার চোখের সামনে নদীর ওপারের চষা ক্ষেত আবছা অন্ধকারে স্নান হয়ে এল।

পাখিরা মাথার ওপর দিয়ে ফিরে যাচ্ছে বাসায়। সারাদিনের গরমের পর নদীর বুক থেকে জোলো হাওয়া ভেসে আসছে। বাংলার বাতাসে বৈরাগ্য আছে, বুঝলে? কিছুক্ষণ চুপ করে খোলা হাওয়ায় বসে থাকলে মনে হতে শুরু করে—কে কার? কি হবে অনর্থক উন্নতির চেষ্টা করে?

অন্ধকার বেশ চেপে আসছে দেখে বাড়ি ফেরবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে নজর পড়ল ওপাশের সেই বাব্‌লা গাছটার দিকে। গাছের নিচে একটু ঝোপমত, তার মধ্যে কি যেন নড়ছে!

প্রথমে বেশ ভয় পেয়েছিলাম। এদিককার গ্রামে সন্ধ্যের দিকে এখনো বুনো শুয়োর বেরোয়। শখ করে হাওয়া খেতে এসে শেষে বুনো শুয়োরের হাতে পড়লাম নাকি? শুয়োর বড় পাজী জানোয়ার, অকারণেই তেড়ে এসে দাঁত দিয়ে পেট চিরে দেয়।

না, শুয়োর নয়।

আমার পায়ের আওয়াজ পেতেই বোধ হয় ঝোপের মধ্যে থেকে একজন উঠে দাঁড়াল।

অম্বিকাভূষণের বাড়িতে দেখা সেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। তার হাতে কতগুলো শেকড়বাকড়।

লোকটা তীব্র জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখের দিকে তাকালে মনে হয় পৃথিবীতে সব আলো-হাসি-গান ফুরিয়ে গিয়েছে। যেন কাল সকালে আর সূর্য উঠবে না এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি মারা যাব। তোমরা হলে সেই চাউনিতেই তোমাদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসত। কিন্তু আমি তারানাথ, আমারও জীবন কেটেছে ভয়ানক সব সাধকদের সঙ্গে মেলামেশা করে। তারা সত্যিকারের সাধক। আর এ লোকটাকে দেখেই বুঝতে পারলাম এর কিছু ক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু সে নিম্নশ্রেণীর ক্ষতি করার ক্ষমতা। সেটা বুঝেই মনে জোর পেলাম।

লোকটা আমার দিকে তাকিয়েই আছে। আমি তার চোখে চোখ রেখে বললাম—কি, শ্বেতসরষে যোগাড় হল?

মুহূর্তের মধ্যে তার মুখে বিস্ময়, ক্রোধ ইত্যাদি কয়েকটা অভিব্যক্তি খেলে গেল। আমার দিকে এক পা এগিয়ে এসে অদ্ভুত কর্কশ গলায় বলল—তুমি কি করে জানলে?

আবার বললাম—কাকের বাসা তো আগেই সংগ্রহ হয়েছে, নিমপাতা কি কালকে পাড়া হবে, না পরশু? পরশুই তো অমাবস্যা, তাই না?

সে কিছুক্ষণ আমার দিকে স্থিরচোখে তাকিয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে, প্রত্যেকটি কথা গরম লোহার মত বিঁধিয়ে দিয়ে বলল—ওঃ, তুমি জেনেছ তাহলে? তাই তোমাকে দেখে সেদিন আমার—আমিই বোকা, আমার আগে বোঝা উচিত ছিল।

তারপরেই তার চোখ আবার দপ্‌ করে জ্বলে উঠল। মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে সে বলল—কিন্তু বিশেষ কিছু লাভ হবে না। এক সাধকের অভিচার ক্রিয়ায় বাধা দেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ, জানো তো? দিয়েও সুবিধে করতে পারবে না। আমার যা করবার তা করবই। বাধা দিলেও লাভ হবে না। আমার ক্রিয়ার ফল হবেই।

বললাম—দেখা যাক।

সে কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে, 'বেশ, দেখ তাহলে' বলে পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল।

খুব মন খারাপ নিয়ে বিরজার কাছে ফিরলাম। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি এসব সাধকদের ভালো করার ক্ষমতা না থাকুক, ক্ষতি করবার শক্তি খুবই থাকে।

কিশোরী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল—কিন্তু আমরা যে অন্ধকারে রয়ে গেলাম। আপনি কি ভাবে দুইয়ে দুইয়ে চার করলেন, বললেন না?

তারানাথ হেসে বলল—তাও তো বটে। গল্প বলতে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে তোমরা এসব ব্যাপার কিছুই জানো না। আচ্ছা, বলি শোন। প্রথমে নদীর ধারের বাব্‌লা গাছ থেকে কাকের বাসাটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়াতে আমার মনের ভেতরে টনক নড়ে ওঠে। তোমাদের এ জিনিসটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না। বহু অভিজ্ঞতায়, শ্মশানে-মশানে ঘুরে একটু একটু করে এটা দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কখনো মুণ্ডমালাতন্ত্র অথবা হংসপারমেশ্বর নামে কোনো বইয়ের নাম শুনেছ?

আমি আর কিশোরী বললাম—না।

তারানাথ বলল—সেই বইয়ে শ্বেতবগলা নামে এক দেবীর উল্লেখ রয়েছে। তাঁর পুজো করে তারপর উচাটন ক্রিয়া করতে হয়। কারুর ক্ষতি করবার জন্য যে তান্ত্রিক ক্রিয়া, তার নাম উচাটন। অমাবস্যার দিন ছাড়া শ্বেতবগলার পুজো হয় না। ঘোড়া আর মোষের রক্ত মিশিয়ে কালি তৈরি করতে হয়। তারপর কাকের পালকের কলম দিয়ে যার সর্বনাশ করতে চাও তার নাম একটা নিম পাতার ওপর ওই রক্ত দিয়ে লিখতে হবে। লেখার সময় একটা মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়, সেটা তোমাদের বলব না। এরপর ষোড়শোপচারে শ্বেতবগলার পুজো করে হোম করতে হবে। যজ্ঞের সমিধ হচ্ছে সাধারণত বেলকাঠ বা জগডুমুরের কাঠ। কিন্তু এই যজ্ঞ করতে হয় কাকের বাসার সরু সরু কাঠি দিয়ে। প্রত্যেকটি কাঠি যজ্ঞের আগুনে দেবার আগে শ্বেতসরষের তেলে ভিজিয়ে নিতে হয়। পূর্ণাহুতি দেবার সময় ওই শত্রুর নাম লেখা নিমপাতাটি যজ্ঞের আগুনে দিলেই কাজ শেষ। এবার আগুন নিভে গেলে যজ্ঞকুণ্ড থেকে কিছুটা ভস্ম তুলে শত্রুর বাড়িতে নিক্ষেপ করলে কয়েকদিনের মধ্যেই তার ভয়ঙ্কর সর্বনাশ উপস্থিত হবে।

বললাম—কি ভয়ানক।

—ভয়ানকই বটে। সেই জন্যেই বিরজার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।

রাত্তিরে বাইরের ঘরে বসে গল্প করতে করতে বিরজা বলল—তোকে এরকম দেখাচ্ছে কেন রে? শরীর খারাপ নাকি?

—নাঃ! শোন্ ভূষণ, কাল একটা পুজো করব ভাবছি। ফর্দ করে দেব, কতকগুলো জিনিস আনিয়ে দিস তো। রাত্তিরে পুজো হবে।

—পুজো! কিসের পুজো?

—এমনিই। তোর সময়টা ভালো যাচ্ছে না, ভাবছি একটা স্বস্ত্যয়ন গোছের করে দেব।

বিরজা বোকা নয়। সে উঠে এসে আমার হাত দুটো ধরে বলল—কি ব্যাপার বল দেখি? আমায় ভোলাবার চেষ্টা করিস না। যদি কিছু বুঝে থাকিস আমাকে বল্—আমার কি কোন বিপদ আসছে?

ভেবে দেখলাম বিরজার কাছে আসল ঘটনা লুকিয়ে কোনো লাভ নেই। বরং তৈরি থাকলে ও যাই আসুক না কেন, তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে।

আমি বিরজাকে সব খুলে বললাম।

বিরজা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। তারপর নিজের বিপদ সম্বন্ধে কোনো কথা না বলে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল—আবিদ শেখ তাহলে সত্যি কথাই বলেছিল।

বললাম—তা বটে।

বিরজা বলল—আমি তাহলে এখন কি করবো?

—বললাম তো, যোগাড়যন্ত্র করে দে—কাল সকালেই স্বস্ত্যয়ন করে দিই।

—তাতে আমার বিপদ কেটে যাবে? ওদের পুজোর ফল ফলবে না?

বিরজার কথার কোনো উত্তর দিতে না পেরে চুপ করে রইলাম।

—কি রে? উত্তর দিচ্ছিস না যে?

—তোকে মিথ্যে কথা বলতে চাই না বিরজা। এসব তান্ত্রিকের মানুষের ভাল করার ক্ষমতা না থাকলেও খারাপ করবার শক্তি খুবই থাকে। আমার পুজোর ফল না ফললেও তোর দাদার ক্রিয়াকাণ্ডের ফল হবে বলেই মনে হয়।

—তাহলে? তুই তো অনেক সাধুর সঙ্গে ঘুরেছিস, এই পুজো কাটান দেবার মন্ত্র জানিস না?

মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে লাভ নেই, তাই বললাম—না ভাই বিরজা, আমি এ পথের ভালো দিকটারই সন্ধান করেছি চিরকাল। অপরের ক্ষতি কি করে করতে হয় তা শিখিনি। অনেককে অনেক ভয়ানক কাণ্ড করতে দেখেছি ঠিকই—কিন্তু তা শিখতে ইচ্ছে করেনি।

—আমি তাহলে এখন কি করবো?

—ঈশ্বরকে ডাক। তিনি সর্বমঙ্গলময়, তিনি ইচ্ছে করলে সব বিপদ কাটিয়ে দিতে পারেন।

বিরজা বলল—অনেকেই তো ভগবানের কাছে অনেক কিছু প্রার্থনা করে। তাদের সবার কথা ঈশ্বর শোনেন? ভগবানকে ডেকে লাভ কি?

বিরজার চরিত্রের এই দিকটা চোখে পড়ায় আমার ভাল লাগল। সে গ্রামের লোক বটে, আধিভৌতিক আধিদৈবিক ক্রিয়াকর্মে বিশ্বাসও রাখে—কিন্তু নিজের বিপদ ঘটতে চলেছে জেনেও সে গেঁয়ো লোকের মত অধীর হয়ে পড়ল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে উঠে বাড়ির ভেতরে গেল। বলে গেল—বোস একটু, এখনি আসছি।

দশ-বারো মিনিট পরে বিরজা হাতে করে একটা লাল কাপড়ের পোঁটলা নিয়ে ঘরে ঢুকে তক্তাপোশের ওপর বসল।

বললাম—কি ব্যাপার? ও পোঁটলায় কি?

—এদিকে আয়। তোকে কয়েকটা জিনিস দেখাই—

—কি জিনিস?

বিরজা পোঁটলার গিঁট খুলে একরাশ কাগজ বের করল। বলল—এগুলো আমার জমিজমা আর সম্পত্তির দলিল। আমার কোথায় কি আছে তোকে বুঝিয়ে দিয়ে যাই। যদি আমার কিছু হয়, তাহলে তুই আমার বৌ-ছেলেপিলেকে দেখিস। আর আমি কাউকে বিশ্বাস করতে পারব না—

উঠে গিয়ে ওর হাত ধরলাম—দাঁড়া, পাগলামি করিস না। একটা কাজ করা যাক বরং—

বিরজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—কি?

—তুই কোনো তীর্থে চলে যা সপরিবারে।

—তাতে কি হবে?

—তীর্থে থাকলে অমঙ্গল হয় না, কারো কোনো অভিশাপ ফলে না।

—ঠিক বলছিস?

একটু ইতস্তত করে বললাম—অন্তত কম ফল হয়। ঈশ্বরের স্থান তো।

বিরজা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে ভেবে বলল—বেশ, তাহলে তুইও চল্ আমার সঙ্গে।

অবাক হয়ে বললাম—আমি। আমি কি করে এখন—

বিরজা দৃঢ় গলায় বলল—ওসব চলবে না। তোর কথায় আমি এই বিপদ মাথায় করে বাড়ির সবাইকে নিয়ে তীর্থ করতে যাব। যদি তাতেও কোনো ফল না হয় আর আমি বিদেশেই মরে যাই, তাহলে বৌ-ছেলেপুলের কি হবে? ওরা পথ ঠিক করে বাড়িও ফিরতে পারবে না। তুই বুদ্ধি যখন দিয়েছিস—তখন তোকেও সঙ্গে যেতে হবে।

বিরজার দিকে তাকিয়ে মায়া হল। বেচারা ভয় পেয়েছে খুব, কিন্তু চরিত্রের দৃঢ়তা দিয়ে সেই ভয়কে মুখে ফুটে উঠতে দেয়নি। এখন ওকে একলা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। বললাম—আচ্ছা, যাব তোর সঙ্গে। কবে রওনা দিতে চাস?

—কাল সকালে।

—সে কি! হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, একরাত্তিরে সব গোছগাছ করবি কি করে?

—সে আমি পারব। আর এমন কি-ই বা নেবার আছে? ও হয়ে যাবে এখন—

বললাম—কিন্তু টাকাকড়িরও তো প্রশ্ন আছে।

—তার জন্য আটকাবে না। এসব দেশ-গাঁ জায়গা, আমরা ব্যাঙ্কে টাকা রাখি না। দু-চার টাকা যা আছে তা বাড়িতেই আছে। কালই চল্—

বললাম—চল্ তাহলে। কোথায় যাবি?

একটুও না ভেবে বিরজা বলল—কাশীতে। খুব দেখার ইচ্ছে ছিল, এই সুযোগে হয়ে যাবে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বলল—তারপর ধর সত্যিই যদি আর না ফিরি, তাহলে হিন্দুর ছেলে কাশীতে অন্তত মরতে পারব।

সারারাত্তির তোড়জোড় করে পরের দিন সত্যিই আমরা কাশী রওনা দিয়ে দিলাম। বিরজার স্ত্রীকে আসল কারণ জানানো হল না। দুই বন্ধুর হঠাৎ বেড়াতে যাবার শখ হয়েছে—এই কথা তাকে বলা হল। যাবার পথে নিবারণ রায়—বিরজার দূরসম্পর্কের মামা—তাকে ঠিকানা দিয়ে এল বিরজা। বলল—দিয়ে রাখি ঠিকানাটা, বলা যায় না, যদি কোনো দরকারে লাগে।

আমার এক চেনা ভদ্রলোকের অনেক দান আছে কাশীর এক আশ্রমে। সেখানে এর আগেও বার-দুই আমি উঠেছি কাশী গিয়ে। এবারেও সেখানেই থাকব ঠিক করেছিলাম। তারই ঠিকানা। তখনও জানি না যে ঠিকানাটার সত্যিই দরকার পড়বে।

অমাবস্যার দিনই সকালে কাশী পৌঁছলাম। গঙ্গাস্নান করে সেদিনই বাবা বিশ্বনাথের পুজো দেওয়া হল। বেচারা বিরজার বৌ জানে না স্বামী কেন এত তাড়াহুড়ো করে কাশী এসেছে। সে আনন্দ করে সব দেখে বেড়াচ্ছে। পাড়াগাঁয়ের বৌ, এর আগে বিশেষ বাইরে বেরোয়নি কখনো। সে খুব খুশী। বিরজা মাঝে মাঝে কাষ্ঠহাসি হাসছে, কিন্তু সে হাসিতে কোনো রঙ নেই।

সেদিন রাত্রিটা আমরা দুই বন্ধু এক জায়গায় বসে প্রায় জেগেই কাটিয়ে দিলাম। কিছুই ঘটল না। এই ভয়ঙ্কর সময়টা কেটে যেতে বিরজাও যেন মনে একটু বল ফিরে পেল। পরের দিন সকালে তাকে বেশ হাসিখুশী দেখলাম।

এই করে নিরুপদ্রবে আরো তিন-চারদিন কেটে গেল। পঞ্চম দিনে বিরজাই আমাকে বলল—মনে হচ্ছে এযাত্রা বেঁচে গেলাম, বুঝলি? নাঃ, তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য আছে স্বীকার করতে হবে!

সেদিনই বিকেলে বসে আমি আর বিরজা গল্প করছি, মাটিতে বসে তরকারি কুটছে বিরজার বৌ। হঠাৎ আশ্রমের অধ্যক্ষ জ্ঞানানন্দ ঘরে ঢুকে বললেন—ইয়ে, হঠাৎ ঢুকে পড়লাম, কিছু মনে করবেন না। অবশ্য বৌমা আমার মায়ের মত—আপনাদের সঙ্গে একটু কথা ছিল যে—

বললাম—আসুন আসুন, বসুন তো আগে। কি ব্যাপার?

জ্ঞানানন্দ তাঁর হাতে ধরা হলুদ রঙের একটুকরো কাগজ আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—বিরজাভূষণ কার নাম? একটা তার এসেছে। আশ্রমে তার এলে আমিই সই করে নিয়ে পৌঁছে দিই। দেখুন তো কি খবর—কোন বিপদ-টিপদ নয় তো?

বিপদ আর কি হবে? বিরজা তো সমস্ত পরিবার নিয়ে এখানে!

তার খুলে বিরজার চোখ মুখ কেমন হয়ে গেল। আমি আর জ্ঞানানন্দ একসঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে? কি খবর?

বিরজা আমার দিকে তারটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল—দাদা করেছেন। পড়ে দেখ্—

পড়ে দেখলাম। অম্বিকাভূষণেরই করা তার বটে। বিশেষ কিছু লেখা নেই। শুধু বলা হয়েছে—অবিলম্বে ফিরে এস। বাড়িতে বিপদ।

বিরজার দিকে তাকিয়ে বললাম—কি বিপদ বলে মনে করিস?

—তা কি করে বলব? কিছু তো বলা হয়নি। তাছাড়া দাদা হঠাৎ—যার জন্য এত কাণ্ড। আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে—

জ্ঞানানন্দ বুদ্ধিমান মানুষ, বিরজার কথার ধাঁচে বুঝলেন কোথাও কোনো গোলমাল আছে। একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন—আচ্ছা, আমি তাহলে যাই—একটু কাজ আছে। কি ঠিক করেন জানাবেন আমাকে।

তিনি চলে যেতে বললাম—কি করবি?

বিরজা বলল—চল্ ফিরি। নিশ্চয় কিছু গুরুতর হয়েছে। নইলে দাদা তার করতেন না।

ট্রেনে আসতে সমস্ত পথ বিরজা বলল—রক্তের টান, বুঝলি? দাদা ভুল বুঝতে পেরে আমাকে আবার ডেকেছে।

আমি তার কথার উত্তর দিই নি তখন। কারণ হঠাৎ আমার মনের মধ্যে আবার সেই পুরনো অমঙ্গলের ধ্বনি বেজে উঠেছে। যেন অবিলম্বে একটা অশুভ কিছু ঘটতে চলেছে। এর ওপর বিরজাকে আর কিছু বলে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। কিন্তু আমি জানি কিছু একটা ঘটবেই, বা ঘটছে। আমার এ অনুভূতি মিথ্যা হয় না।

হলও তাই।

গরুর গাড়ি নিয়ে স্টেশন থেকে একেবারে অম্বিকাভূষণের বাড়ির সামনে গিয়ে নামা হল। মালপত্র গাড়িতেই রেখে আমরা ঢুকলাম বাড়িতে।

চারদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব। বাইরের ঘরে কেউই নেই। বিরজা অন্দরের দিকে পা বাড়াবে, এমন সময় স্বয়ং অম্বিকাভূষণ এসে ঘরে ঢুকলেন। বিরজা নিচু হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে বলল—কি হয়েছে দাদা? তার করেছ কেন?

উত্তরে অম্বিকাভূষণ ভাইকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন।

—কি হয়েছে দাদা? অমন করছ কেন?

—সন্তুর খুব অসুখ বীরু, আর বুঝি রাখা যায় না—

সন্তু অম্বিকাভূষণের বড় ছেলে। বিরজা অবাক হয়ে বলল—কি হয়েছে সন্তুর?

অম্বিকাভূষণ কপালে আঘাত করে বললেন—সব আমার দোষ, আর কারো কোনো পাপ নেই ভাই। আমার নিজের দোষেই আমি পুত্রশোক পেতে চলেছি—

—আহা, শান্ত হও দাদা। সব ঠিক হয়ে যাবে। অস্থির হয়ো না—

বিরজার স্ত্রী তক্ষুনি অন্দরে চলে গিয়ে সন্তুর পায়ের কাছে বসল। আমার বুদ্ধিই বোধ হয় কিছু স্থির ছিল। আমি দুই ভাইকে ধরে বসালাম। বললাম—কি হয়েছে খুলে বলুন তো—

অম্বিকাভূষণ কাঁদছিলেন, বিরজা পাশে বসে তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। বেশ দৃশ্যটা। দুই ভাইয়ের বিবাদ বিপদের স্রোতে ভেসে গিয়েছে।

আমার প্রশ্ন শুনে অম্বিকাভূষণ মুখ তুলে তাকালেন। বললেন—নিজের মুখে স্বীকার করলে পাপের বোঝা হালকা হয়। তাই কোনো কিছু না লুকিয়েই বলছি। বীরু, তোর সর্বনাশ করার জন্য আমি এক তান্ত্রিকের পরামর্শে শ্বেতবগলার পুজো করেছিলাম। সে পুজোয়—

আমি বললাম—এ অংশটা বাদ দিয়ে বলুন। এটা আমি আগেই টের পেয়ে বিরজাকে বলেছি।

অম্বিকাভূষণ একবার আমার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন—ও, জানতেন তাহলে! যাই হোক, পুজোর পরে হোম করে সেই হোমের ছাই নিয়ে বীরুর বাড়িতে ফেলবার দরকার ছিল। ব্যাটা তান্ত্রিক এ কাজটা আমাকেই করতে বলল। কি আর বলব, তখন শয়তান আমার বুদ্ধি কেড়ে নিয়েছিল। এই সময় বীরুও কাশীতে। বাড়ি ফাঁকা। কাজেই আমিও ভাবলাম সুবিধেই হল। অমাবস্যার দিন প্রায় সারারাত্তির পুজো হল। হোম শেষ হতে হতে শেষরাত্তির। কলাপাতায় মুড়ে খানিকটা ছাই আমার হাতে তুলে দিয়ে তান্ত্রিক বলল—যাও। সাবধান, অন্য কোথাও যেন না পড়ে! তাহলেই সর্বনাশ!

তখনো ভোর হতে দেরি আছে। বীরুর বাড়ির পাঁচিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। হাতে আমার কলাপাতায় মোড়া হোমের ছাই। পাঁচিল ডিঙিয়ে সেটা সবসুদ্ধ ছুঁড়ে ফেলতে যাব ওর বাগানে, কি বলব মশাই, একটু মেঘ নেই বা ঝড়ের চিহ্ন নেই কোথাও—অথচ প্রচণ্ড একটা বাতাসের ঝাপটা এল কোথা থেকে! ততক্ষণ আমিও সেটা ছুঁড়ে দিয়েছি হাত থেকে। আমার চোখের সামনে বাতাসের মুখে উড়ে গিয়ে তা পড়ল আমারই বাড়ির উঠোনে! তখুনি দৌড়ে গিয়ে উঠোন থেকে সবটুকু ছাই নিকিয়ে তুলে নিলাম। কিন্তু তাতে কি আর পাপ যায়! গত পরশু থেকে সন্তু বাবা আমার কেবলই রক্তবমি করছে—

বিরজা ব্যস্ত হয়ে বলল—কোন্ ডাক্তার দেখছে?

—কোনো ডাক্তার কি বাকি আছে? বিকেলেই সদর থেকে বড় ডাক্তার এসেছিলেন। নিবারণ কলকাতা গিয়েছে মর্গ্যান সাহেবকে আনতে। কাল সকাল নাগাদ এসে পৌঁছবে মনে হয়।

বিরজা উঠে পড়ে বলল—চল দাদা ভেতরে, সন্তুকে দেখি গিয়ে।

বললাম—আমি একবার যেতে পারি কি?

অম্বিকাভূষণ বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন না।

তারপর বিরজার হাত দুটো ধরে বললেন—ভাই, আমি যা করবার তো করেই ফেলেছি। তুই কোনো রাগ পুষে রাখিস না। তুই আমার সন্তুকে আশীর্বাদ কর—

বিরজা কেঁদে ফেলে বলল—অমন করে বলছ কেন দাদা? সন্তু আমার নিজের ছেলের মতন—

সকাল হবার আগেই নিবারণ রায় মর্গ্যানকে নিয়ে পৌঁছলেন। শেষরাতের ট্রেনে এসেছেন।

স্ট্যানলি মর্গ্যান রোগী দেখে বললেন—বোধ হয় পেরিটোনাইটিস্। যদি র‍্যাপচারড্ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ছেলে বাঁচবে না। নইলে একটু সুস্থ হলেই কলকাতা নিয়ে গিয়ে অস্ত্র করাতে হবে—

পরের কথা সংক্ষেপে বলি। সন্তু বেঁচে উঠেছিল। আমাদের সবার মিলিত প্রার্থনার জোরেই হোক, বা অম্বিকাভূষণের অনুতাপে ঈশ্বর দয়া করার জন্যই হোক—সন্তু তিনদিনের দিনে একটু ভাল হয়ে উঠল। ডাক্তার মর্গ্যান নিজে তার অপারেশন করেন। সে ভাল হয়ে ওঠে। দুই ভাইয়ের ঝগড়াও চিরকালের জন্য মিটে যায়। কিন্তু তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অপরের ক্ষতি করতে গিয়ে মানুষ নিজের কি বিপদ ডেকে আনে দেখলে তো? বোধ হয় ভগবানই অম্বিকাভূষণকে একটু শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। নইলে সামান্য বাতাসের চিহ্ন নেই কোথাও, অথচ অমন হবে কি করে!

কিশোরী বলল—সে তান্ত্রিকের কি হল?

—সে পরের দিনই লোটা-কম্বল নিয়ে কাউকে না বলে ভেগেছিল। প্রাণের ভয় সবারই আছে তো—

কিশোরী বলল—সন্তুর অসুখের ব্যাপারটা কাকতালীয়ও তো হতে পারে?

তারানাথ কড়া চোখে তাকিয়ে বলল—পাষণ্ড কোথাকার! আর যদি কখনো তোমাদের গল্প বলেছি।

কবি কালিদাস বলে গিয়েছেন আকাশে মেঘ করে এলে মানুষের চিত্ত আকুল হয়ে ওঠে। আমি কবি নই, তবে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এলে আমার তারানাথের কাছে যেতে ইচ্ছে করে বটে। বর্ষার দিনে মুড়ি আর গরম গরম তেলেভাজার মত তারানাথের গল্পও একটা আবশ্যিক ব্যাপার।

আজ ছুটির দিনটা সকাল থেকেই মনে হচ্ছিল হয়তো বা বৃষ্টি হবে। আকাশ ঘোলা, রোদ্দুরের তেমন তেজ নেই। দুপুরের পরেই কালো মেঘে চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। এমন সময়ে বাড়িতে বসে থাকার কোন মানে হয় না। বিশেষ করে কোলকাতায় বৃষ্টি মোটেই একটা উপভোগ্য জিনিস নয়। আলনা থেকে একটা শার্ট টেনে নিয়ে গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ভেবেছিলাম বৃষ্টি এসে পড়ার আগে হয়তো তারানাথের বাড়িতে পৌঁছতে পারবো না। কিন্তু মট্ লেনের মুখে পৌঁছে দেখলাম তখনো মেঘ আকাশে থমকে আছে। গলির মোড়ের সিগারেটের দোকান থেকে তারানাথের জন্য এক প্যাকেট পাসিং শো নিচ্ছি, পেছন থেকে কে বলে উঠল—এই যে, তুমিও এসে পড়েছ দেখছি!

তাকিয়ে দেখি কিশোরী। সে একগাল হেসে বলল—যাই বলো ভাই, লোকটার গল্প বলার একটা দারুণ কায়দা আছে। একেবারে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে, কি বলো?

বললাম—তুমি তো তারানাথের গল্প বিশ্বাস করো না, তাহলে আসো কেন?

—কে বলল বিশ্বাস করি না?

—গল্পের মধ্যে কেবল বাগড়া দাও, আজেবাজে প্রশ্ন করো—

—আরে, ওসব তো তারানাথকে উসকে দেবার জন্য। চটে গেলে ওর ভালো ভালো গল্পগুলো বেরিয়ে আসে। চল, চল—আর দেরি নয়। ওই দেখ, জল এসে পড়ল বলে—

প্রায় দৌড়ে তারানাথের বাড়িতে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। সারাদিনের গুমোট ভাবটা কাটিয়ে এলোমেলো ঠাণ্ডা বাতাস বইতে আরম্ভ করল। বসবার ঘরে ঢুকে দেখি তারানাথ আমাদের দিকে পেছন ফিরে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে। কলকাতার গলি, সেদিকে অবশ্য দেখবার কিছুই নেই, হাততিনেক তফাতেই ঠেলে উঠেছে পাশের বাড়ির দেয়াল। তবু তারানাথ দেখলাম বিভোর হয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। আমাদের পায়ের শব্দে সে পিছন ফিরে বলল—এই যে তোমরা! এস এস, বোসো। ভাবছিলাম তোমরা হয়তো এসে পড়বে। এমন দিনটা—

সবাই মিলে সেই নড়বড়ে তক্তাপোশে বসলাম। কিশোরী আমার হাত থেকে নিয়ে সিগারেটের প্যাকেট তারানাথের সামনে রাখল। অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে তারানাথ বলল—খুব ছোটবেলার কথা মনে পড়ছিল, জানো? এইরকম মেঘ করে এলে গ্রামের সব ছেলেমেয়ে মিলে দৌড়াতাম আমবাগানে। ঝড়ের প্রথম ঝাপ্টা আসার সঙ্গে সঙ্গেই টিব্‌টাব্ আম পড়তে শুরু করত। আম কুড়োতে কুড়োতে আসত বৃষ্টি। এক কোঁচড় আম নিয়ে গাছের

নিচে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতাম। এই আজকের মত বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ত, সোঁদা মাটির গন্ধ উঠত চারদিক থেকে। বৃষ্টি থামলে বাড়ি গিয়ে তেল নুন দিয়ে কাঁচা আম জরিয়ে খাওয়া। আর কিছু না, শুধু কাঁচা আম—তাই যেন কি মধুর মত লাগত। নাঃ, সে-সব দিন আর ফিরবে না।

কিশোরী দেখল তারানাথের কবিত্বের চোটে যে গল্পের জন্য আসা সেটাই বুঝি মারা যায়! সে বলল—আপনার পুরনো অভিজ্ঞতা থেকেই আজ একটা গল্প বলুন না—

—বলবো, বলবো। আগে একটু চা হোক—

তারানাথ উঠে ভেতরে গিয়ে চায়ের কথা বলে এল। তারপর তক্তাপোশে জমিয়ে বসে বলল—কলকাতায় বর্ষার রূপ তোমরা দেখতে পাও না। আমরা গ্রামের ছেলে, বুঝলে? খালবিল ভাসিয়ে একনাগাড়ে তিন-চারদিন বাদলা হওয়ার পর কখনো গামছা দিয়ে কই মাছ ধরতে বেরিয়েছ? আমরা যেতাম। তারপর বাড়ি ফিরে একবাটি নুন নিয়ে বসে সারা গা থেকে জোঁক ছাড়াতাম। মা এসে বকুনি দিতেন বৃষ্টি মাথায় করে বাইরে বেরুনোর জন্য। আঃ, আবার শিশু হয়ে মায়ের সেই বকুনি খেতে ইচ্ছে করছে। জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট আছে, বুঝলে হে? তবু মোটের ওপর জীবনটা বেশ ভালই কেটেছে। যদি সুযোগ পাই তাহলে আবার ফিরে আসব পৃথিবীতে। আবার আম কুড়োতে যাব ঝড়ের দিনে, খেলা করব মায়ের কোলে—সুখ-দুঃখ সহ্য করতে করতে বড়ো হয়ে উঠব—

কিশোরী স্পষ্টত উসখুস করতে লাগল। বাইরে ঝমঝম্ বৃষ্টি নেমেছে, ঘরের ভেতরে ঘন হয়ে উঠেছে ছায়া। মনে হচ্ছে যেন আমরা তিনটে প্রাণী ছাড়া জগতে আর কেউ কোথাও নেই। এখন কি আর দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা ভালো লাগে?

এই সময়েই ভেতরবাড়ি থেকে চা নিয়ে এল তারানাথের মেয়ে চারি। চায়ে চুমুক দিয়ে তারানাথ বলল—তোমাদের গল্প চাই, না? আচ্ছা, আজ একটা অদ্ভুত ঘটনা তোমাদের শোনাচ্ছি। আমারই পরিবারের একটি মেয়ের জীবনে ঘটেছিল। একদিনের ব্যাপার নয়, অনেকদিন ধরে একটু একটু করে ঘটেছে। পান খাবে? না? যাক্, গল্পটা শোন তবে।

পাসিং শো ধরিয়ে তারানাথ গল্প শুরু করল।

তোমরা তো জানো আমি একান্নবর্তী পরিবারে মানুষ হয়েছি। দু'বেলা আমাদের বাড়িতে প্রায় পঞ্চাশখানা পাত পড়ত। আপন কাকা-জ্যাঠারা তো ছিলেনই, বাবার এক দূর সম্পর্কের ভাইও আমাদের সংসারে থাকতেন। আমরা ভাইবোনেরা তাঁকে রাঙাকাকা বলে ডাকতাম। রাঙাকাকা লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না, বোধ হয় ক্লাস থ্রি কি ফোর অবধি পড়েছিলেন। কিন্তু খুব পরিশ্রম করতে পারতেন। সকাল থেকে দেখতাম তিনি কোদাল হাতে বাড়ির পেছনের জমি কুপিয়ে লাউ-কুমড়োর চারা বসাচ্ছেন, নয়তো কুড়ুল নিয়ে সংসারের জ্বালানী কাঠ চিরে দিচ্ছেন। তাঁর অবসর সময় বলে কিছু ছিল না, সব সময়েই কিছু না কিছু করছেন। সবাই রাঙাকাকাকে ভালবাসত তাঁর মধুর ব্যবহারের জন্য।

আমার ছোটবেলাতেই রাঙাকাকার বিয়ে হয়। তখনকার দিনে পাত্রের বড় চাকুরে বা ব্যবসায়ী হবার দরকার হত না, যাহোক খাবার সংস্থান থাকলেই চলত। তাছাড়া বাবা-কাকারা বোধ হয় কয়েক বিঘে জমি রাঙাকাকার নামে লিখে দিয়েছিলেন। তার ফসলে দুটি প্রাণীর না চলার কথা নয়।

রাঙাকাকীমা বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই বাড়ির সকলের মন জয় করে নিলেন। কোন অহঙ্কার ছিল না চরিত্রে, সবার কাজ আগবাড়িয়ে করে দিচ্ছেন, সর্বদা হাসিমুখ। উঁচু গলায় কথা বলতে জানেন না। এমন মানুষকে কে না ভাল বাসবে? বাংলা-বিহারের একেবারে প্রান্তে একটি ছোট্ট

শহরে তাঁর বাপের বাড়ি। বোধ হয় দূরে ভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন বলেই পাড়াগাঁর সংকীর্ণতা রাঙাকাকীমার মধ্যে ছিল না। সবচাইতে তিনি ভালবাসতেন আমার ছোট ভাইঝি বিরাজবালাকে। বিরাজ তখন খুবই ছোট, বছর পাঁচ-ছয় বয়েস হবে। সেও কাকীমার বিষম ভক্ত হয়ে পড়ল। কাকীমার কাছে খায়, তাঁর সঙ্গেই দুপুরবেলা শুয়ে গল্প শোনে। সারাদিন কাকীমার আঁচল ধরে পেছন পেছন ঘোরে। কাকীমা বলতেন—বিরাজ আরজন্মে আমার মেয়ে ছিল—

এর বছর দুই তিন পর থেকে বিরাজকে কেন্দ্র করে আমাদের পরিবারে কতগুলো অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে থাকে। বিরাজের মধ্যে যে কোনো বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতা আছে এমন ধারণা কারো মনে আসেনি কোনো দিন—আসবার কথাও নয়। পাড়াগাঁয়ের নিতান্ত স্বাভাবিক আর-পাঁচটা মেয়ের মতই তার চালচলন। কিন্তু বিরাজের আট-ন বছর বয়েসের একটা ঘটনায় আমাদের হঠাৎ খটকা লাগে। প্রথমটা অবশ্য ঠিক বোঝা যায়নি, কারণ সব অলৌকিক ব্যাপারেরই নানারকম ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু পর পর তেমন ঘটতে থাকলে তাকে আর যুক্তি দিয়ে বা কাকতালীয় ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বিরাজ আমার ছোটকাকার মেয়ে। একদিন ছোটকাকীমা ঠাকুরের আসনের সামনে বসে পুজো করছেন, বিরাজ বসে রয়েছে পাশে। কাকীমা পুজো আরম্ভ করবার আগে বিরাজ একবার বলল—মা, আমার না খুব তালের বড়া খেতে ইচ্ছে করছে, বিকেলে করে দেবে মা?

কাকীমা রাগ করে বললেন—বকিস নে তো! যা ওঠ এখান থেকে—বসে পুজো করছি, আর মেয়ের এটা খাবো সেটা খাব—পুজোর সময় বুঝি অমন বলে?

ধমক খেয়ে বিরাজ চুপ করে মায়ের পাশে বসে রইল। পুজো হয়ে যাবার পর ছোটকাকীমা যখন গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে উঠেছেন, তখন বিরাজ আবার বলল—হ্যাঁ মা, দেবে তো বিকেলে তালের বড়া করে?

—সে দেখা যাবে, এখন যা—মেয়েদের খাইখাই করতে নেই।

ঠাকুরঘর ছেড়ে আসবার সময় হঠাৎ কাকীমার খেয়াল হল গৃহদেবতা শ্যাম-সুন্দরের মূর্তির সামনে শ্বেতপাথরের বড় গেলাসের জল আজ বদলে দিতে ভুলে গিয়েছেন। মনে মনে জিভ কেটে কাকীমা জল বদলাবার জন্য গেলাসটা নামিয়ে পাথরের ঢাকনাটা খুললেন।

এ কি! জল কই? গেলাসটা ভর্তি তালের বড়া! সদ্য ভাজা, তখনো গরম রয়েছে।

এ নিয়ে সেদিন খুব হৈ-হৈ হয়েছিল। হবারই কথা। বন্ধ ঠাকুরঘর, কাকীমাই সকালে প্রথম খুলে পুজো করতে ঢুকেছেন, সেই বন্ধঘরে গেলাসের মধ্যে তালের বড়া আসবে কোথা থেকে? কেউ কেউ বলল—বিরাজই হয়তো আগে থেকে গেলাসে বড়া লুকিয়ে রেখেছিল মজা করবে বলে। সে যুক্তিও পুরোপুরি খাটে না। প্রথমত অত সকালে তাকে তালের বড়া ভেজে দেবে কে? দ্বিতীয়ত ঠাকুরের আসনে হাত দেবার সাহস তার হবে না। সেযুগে এসব মানামানি খুব ছিল, জানো তো? সবারই মনে কেমন একটা খটকা লেগে রইল।

এর মাসখানেক বাদে হল আর এক কাণ্ড।

সেদিন সকালে বিরাজ হঠাৎ বায়না ধরল—ও মা, আজ দুপুরে আমি আলু ভাতে দিয়ে ভাত খাব।

আজকাল শুনতে হয়তো একটু অদ্ভুত ঠেকবে, আলুভাতে এমন কি একটা জিনিস, যার জন্য বায়না করতে হবে? কিন্তু তখনকার দিনে পাড়াগাঁয়ে আলু রীতিমত দুষ্প্রাপ্য তরকারী হিসেবে গণ্য ছিল। লোকের বাড়িতে সব সময় মজুত থাকত না, অনেকে খেতও না। হাটের দিনে কেউ কেউ শখ করে কিনে আনত।

কাকীমা বললেন—এখন তো ঘরে আলু নেই মা, ভাতও চড়ে গিয়েছে। ও-বেলা হাট থেকে রামু এনে দেবে এখন, রাত্তিরে খেয়ো—

মায়ের বকুনির ভয়ে বিরাজ চুপ করে গেল। কিন্তু একটু পরেই রান্নাঘর থেকে রাঙাকাকীমা এসে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ছোটকাকীমাকে বললেন—বাবাঃ, এতক্ষণে একটু সময় পাওয়া গেল। ভাত নামিয়ে ফেন গালতে দিয়ে এলাম। আচ্ছা ছোড়দি, ভাতে আজ অত আলুসেদ্ধ কে দিয়েছে বলতে পারো? কে খাবে?

ছোটকাকীমা অবাক হয়ে বললেন—আলুসেদ্ধ? ভাতে? আমি তো দিইনি!

—সে কি! তাহলে কে দিল? হাতা দিয়ে ভাত নাড়ছি, দেখি ভাতের মধ্যে গিজগিজ করছে আলু। তা, দশ-বারোটা তো হবেই—

আবার হৈ-চৈ হল। এবারেও কর্তারা অনেক যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দিলেন। কিন্তু মনের ধাঁধা কারোরই ঘুচল না। বাড়িতে আলু ছিল না, হাট অন্তত দু'মাইল দূরে। মেয়েটা আলু পাবে কোথায় যে ভাতের হাঁড়িতে ফেলবে?

এর পরের ঘটনার কিন্তু আর কোন ব্যাখ্যা দেওয়া চললো না। সবারই মনে হল বিরাজের একটা কিছু অপ্রাকৃত ক্ষমতা আছে বটে।

ছোটকাকা বৈষয়িক কি কাজে সদরে গিয়েছিলেন। দু'তিনদিন উকিলের বাড়ি থেকে কাজ সেরে ফিরবেন। কাকা সদরে যাবার দু'দিন বাদে এক বিকেলে খুব ঝড়বৃষ্টি হল। ঝড় থেমে গিয়েও বৃষ্টি চলল রাত প্রায় ন'টা পর্যন্ত। বেশ ঠাণ্ডা বাতাস দিতে লাগল, বাড়ির সবাই তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়লেন। বিরাজ সে রাত্তিরে শুয়েছিল রাঙাকাকীমার কাছে। অনেক রাত্তিরে, তখন বোধ হয় একটা কি দেড়টা হবে, রাঙাকাকীমা হঠাৎ জেগে গিয়ে দেখলেন, বিরাজ বিছানা থেকে নেমে যাচ্ছে। কাকীমা অবাক হয়ে বললেন—এই বিরাজ, যাচ্ছিস কোথায়?

বিরাজ প্রথমটা উত্তর দিল না, মশারী তুলে বিছানা থেকে নেমে গিয়ে দরজার কাছে চলে গেল। রাঙাকাকীমা দৌড়ে গিয়ে পেছন থেকে ধরলেন।

—এই, কি হয়েছে তোর? কথা বলছিস না কেন?

বিরাজের চোখ ঈষৎ বিস্ফারিত, যেন কিছু দেখতে বা শুনতে পাচ্ছে না। কাকীমা জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—কি হয়েছে বল্?

সেইভাবেই শক্ত হয়ে তাকিয়ে থেকে বিরাজ বলল—দরজা খুলে দাও, বাবা এসেছে—

বিরাজের রকম-সকম দেখে ভয় পেয়ে রাঙাকাকীমা চিৎকার করে ছোটকাকীমাকে ডাকলেন। সেই ডাকে বাড়ির প্রায় সবাই উঠে এল। সবাইয়ের একই প্রশ্ন—কি হয়েছে? অমন করছিস কেন?

বিরাজ কেবল বলে—দরজা খুলে দাও, বাবা দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি?

শেষে বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন—চল্ দেখি কেমন তোর বাবা এসেছে—বাবা এলে ডাকত না?

বাইরের দরজা খুলে দেখা গেল কেউ কোথাও নেই। রাত্তির ঝিমঝিম করছে।

ততক্ষণে বিরাজেরও সেই ভাবলেশহীন শূন্যদৃষ্টি কেটে গিয়ে সে একটু স্বাভাবিক হয়েছে। সবাই মিলে তাকে বকাবকি করে দরজা বন্ধ করতে যাবে, হঠাৎ দেখা গেল বাড়ি থেকে কিছু দূরে আমবাগানের মধ্যে কিসের আলো। কাদের যেন গলার আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। বাবা হেঁকে বললেন—কে? কে আসে রে?

ছোটাকাকার গলায় উত্তর এল—দাদা, আমি—

ছোটকাকাই বটে। সদর থেকে রওনা দিয়ে মাঝপথে ঝড়বৃষ্টিতে পলাশপুরের মোড়লের বাড়ি আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারা না খাইয়ে ছাড়েনি। সঙ্গে লোকও দিয়েছে।

বাড়ির সবাই জড়ো হয়েছে দরজার কাছে, তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ছোটকাকা বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—কি হয়েছে দাদা? এত রাত্তিরে সবাই জেগে যে?

বাবা বললেন—কিছু না, তুই ভেতরে আয়—

এবারে কিন্তু বেশি আলোচনা হল না। বিরাজের ক্ষমতার ব্যাপারটা বাড়ির লোকেরা একরকম মেনেই নিল। হয়ত পর পর কয়েক মাস কিছুই না, হঠাৎ একদিন বাবা বাড়ি থেকে বেরুচ্ছেন—যাবেন আমার জ্যাঠতুতো বোনের বিয়ের বাজার করতে, তাঁকে বিরাজ বলল—জেঠু, আজ তুমি কোথাও যাবে না—

—কেন রে, কেন যাব না?

—না, তুমি যাবে না!

বাবা অবশ্য তা সত্ত্বেও বেরুচ্ছিলেন, মা আটকে দিয়ে বললেন—থাক, আজকের দিনটা থেকেই যাও। বিরাজের ব্যাপারটা তো জানোই।

অগত্যা বাবা থেকে গেলেন। দু'দিন পর খবর পাওয়া গেল যে ট্রেনে বাবার যাওয়ার কথা ছিল সে ট্রেন বর্ধমান ছাড়িয়ে কি একটা ছোট স্টেশনে ঢোকার মুখে উলটে গিয়েছে। বহু লোক হতাহত হয়েছে।

বাবা একবার বিরাজকে আলাদা ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—হ্যাঁরে, এই যে তুই অনেক কথা আগে থেকে বলে দিতে পারিস, কি করে জানতে পাস বল্ তো?

বিরাজ চুপ করে ছিল। শেষে বাবা এক ধমক লাগাতে সে কেঁদে ফেলে বলল—আমি সত্যি কিছু জানি না জেঠু। আমি কিচ্ছু বলি না, আমার মুখ দিয়ে কে যেন অমনি বলে—

বিরাজ কেঁদে ফেলায় বাবা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—আচ্ছা আচ্ছা, যা এখন—কাঁদছিস কেন? কাঁদার মত কি বলেছি?

এর কিছুদিন পরে খবর এল রাঙাকাকীমার বাবা মারা গিয়েছেন। কাকীমার মা ছিলেন না, ছোটবেলা থেকে বাবার কাছেই মানুষ। যে ভদ্রলোক খবর দিতে এসেছিলেন তিনি বললেন মারা যাবার আগে উইল করে কাকীমার বাবা তাঁর সম্পত্তি ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। কাকীমার ভাগে পড়েছে বসতবাড়িটি। ছেলেরা দূরে দূরে নানা জায়গায় কাজকর্ম করে। তারা কোন দিনই আর দেশে ফিরবে বলে মনে হয় না। এ অবস্থায় মেয়ে-জামাইয়ের এখুনি গিয়ে বাড়ির দখল দেওয়া উচিত, নইলে বেদখল হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

রাঙাকাকা সবার সঙ্গে পরামর্শ করলেন। ঠিক হল ওই বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে সেই টাকায় রাঙাকাকা এখানে কিছু জমিজমা কাকীমার নামে কিনবেন। তবে উইলের প্রোবেট নেওয়া, খদ্দের যোগাড় করা এবং বাড়ি বিক্রির ব্যবস্থা করা ইত্যাদির জন্য কাকা-কাকীমাকে হয়ত দু'তিন মাস সেখানে গিয়ে থাকতে হবে।

আমাদের বাড়িতেই কাকীমা চতুর্থীর শ্রাদ্ধ করলেন। তারপর রাঙাকাকা তাঁকে নিয়ে চলে গেলেন শ্বশুরবাড়ি। যাবার আগে রাঙাকাকীমা বিরাজকে কোলে নিয়ে আদর করে গেলেন, বললেন—লক্ষ্মী হয়ে থাকবি, কেমন? আমি ক'দিন বাদেই চলে আসব, তোকে কত গল্প বলব—

রাঙাকাকা আর কাকীমাকে বাড়ির সবাই খুব ভালবাসতো, সেকথা তো আগেই বলেছি। তাঁদের এই সম্পত্তিপ্রাপ্তির ঘটনায় সবাই খুশি হল।

মাসদেড়েক পর একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা ভাইবোনেরা দুধ-মুড়ি-গুড় দিয়ে জলখাবার খাচ্ছি রোয়াকে বসে, এমন সময় বিরাজ আমার মাকে বলল—জেঠিমা, কাল রাত্তিরে রাঙাকাকীমা কখন এসেছে? দেখছি না তো?

মা অবাক হয়ে বললেন—কই, সে তো আসেনি। কে বলল তোকে?

—কেউ বলেনি, আমি দেখেছি।

মায়ের মুখ শুকিয়ে গেল। বিরাজকে আর কোনো কথা না বলে সোজা বাবাকে গিয়ে জানালেন। বাবা ভেতরবাড়িতে এসে বিরাজের গায়ে হাত বুলিয়ে আদরের স্বরে বললেন—কি হয়েছে মা? রাঙাকাকীমার ব্যাপারে কি বলছিলি?

—কাল রাত্তিরে রাঙাকাকীমা এসেছিল তো! আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, দেখলাম কাকীমা ঘরে ঢুকে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপর আবার বেরিয়ে গেল। আমার সঙ্গে কথা বলল না কেন জেঠু?

—তুই স্বপ্ন দেখেছিস, বৌমা তো আসেনি—

বিরাজ আপত্তি করে বলল—না জেঠু, স্বপ্ন না! আমি যে পরিষ্কার দেখলাম। কেমন সুন্দর লালপাড় নতুন শাড়ি পরেছিল, আর কি সিঁদুর দিয়েছে মাথায়, বাব্বাঃ! চুল সব সিঁদুরে মাখামাখি!

বাবা হঠাৎ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে বললেন—এই চুপ্ চুপ্—কি দেখতে কি দেখেছিস ঘুমের ঘোরে—বাজে বকিস না।

বিরাজের কথাটা কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ির মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেল। মা-কাকীমারা উদ্বিগ্নমুখে পরামর্শ করতে বসলেন। একজন পুরুষমানুষ কেউ গিয়ে খোঁজ করে এলে ভাল হয়। সবাই ভাল আছে নিশ্চয় ঠাকুরের কৃপায়, তবু দেখে এলে ক্ষতি কি?

পরদিন বিকেলে মেজকাকা যাবেন বলে প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। কিন্তু তাঁকে আর রওনা দিতে হল না, পরের দিন সকালবেলা রাঙাকাকা স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। শেষরাত্তিরের ট্রেনে নেমে হেঁটে এসেছেন। চুল উস্কোখুসকো, পা খালি, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি—চোখ বসে গিয়েছে গর্তে। বাড়ির দাওয়ায় বসে দু'একবার ফ্যালফ্যাল করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ তিনি চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন—দাদা, আপনার বৌমাকে রেখে এলাম।

মাত্র তিনদিনের জ্বরে মারা গিয়েছেন রাঙাকাকীমা—আজ থেকে এক সপ্তাহ আগে। কয়েকদিন আচ্ছন্নের মত ছিলেন রাঙাকাকা, একটু ধাতস্থ হয়ে গতকাল রওনা দিয়েছেন।

আরও শোনা গেল। পুজোয় পরবেন বলে কাকীমাকে একখানা ভাল লালপাড় শাড়ি কিনে দিয়েছিলেন রাঙাকাকা। শেষযাত্রার সময় সেইটে পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পাড়ার মেয়েরা এসে সিঁদুরের কৌটো উপুড় করে দিয়েছিল মাথায়। বাংলার সীমান্তে একটি অখ্যাত শহরের ক্ষুদ্র নদীর তীরে রাঙাকাকীমার নশ্বর দেহ ছাই হয়ে গিয়েছে।

কাকীমার মৃত্যুতে আমাদের বাড়ির সকলে প্রকৃতই শোক পেলেন। কিছুদিন সবারই মুখ বিষণ্ণ, বাড়িতে কেউ উঁচু গলায় কথা বলে না, হাসে না। কিন্তু সব শোকের তীব্রতাই সময় চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কমে আসে। পৃথিবীর নিয়মই এই। যাকে না হলে জীবন কাটানো অসম্ভব বলে মনে হয়, সে সরে গেলে হঠাৎ আবিষ্কার করা যায় তাকে বাদ দিয়েও দিব্যি চলে যাচ্ছে। একদিন আবার সংসারের চাকা ঠিকঠাক চলতে শুরু করল, মাঝে মাঝে হাসির শব্দও শোনা যেতে লাগল।

একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন কেবল রাঙাকাকা। যে মানুষ হাতে কাজ না থাকলে ছটফট করত, সে সারাদিন বসে আছে ঘরের রোয়াকে। চোখ দুটো উদাস, দীপ্তিহীন। মুখে একটাও কথা

নেই। খাওয়ার সময় জোর করে ডেকে নিয়ে যেতে হয়। সংসারের কোনো ব্যাপারে কোনো উৎসাহ নেই। বাবাই তোড়জোড় করে রাঙাকাকীমার বাপের বাড়িটা বিক্রি করে টাকা নিয়ে এসে কাকাকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ টাকা দিয়ে কি করতে চাও?

রাঙাকাকা চুপ করে রইলেন।

—চুপ করে থাকলে তো চলে না বিশু। কপালে যা ছিল তো হয়েছে। এ ন্যায্যত তোমার টাকা, তোমাকেই ব্যবস্থা করতে হবে।

রাঙাকাকা মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বললেন—টাকা দিয়ে আমি আর কি করব? আপনি যা ভালো বোঝেন করুন। আপনি যা করবেন তাতে আমার কোনো অমত থাকবে না—

—তাহলে আমি বলি কি, এ টাকা তুমি বৌমার নামে কোনো হাসপাতালে বা আশ্রমে দান করো—বৌমার আত্মা তৃপ্তি পাবে।

শান্তভাবে রাঙাকাকা বললেন—বেশ তো, তাই করুন।

সব বিলিব্যবস্থা হয়ে যাবার পর একদিন সকালে উঠে দেখা গেল রাঙাকাকার ঘরের দরজা খোলা, তিনি নেই!

এমন একটা কিছু ঘটবে সবাই আন্দাজ করতে পেরেছিল। কিছুদিন ধরে খোঁজাখুঁজি চলল, বাবা বোধ হয় কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়ে থাকবেন, কিন্তু রাঙাকাকা আর কোনোদিন ফিরে এলেন না।

বছর ঘুরে এল। রাঙাকাকা আর কাকীমার স্মৃতি পরিবারের সবার মনে একটা বেদনার চিহ্ন হিসেবে রয়ে গিয়েছে। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর মেয়েদের মজলিশে প্রায়ই এ প্রসঙ্গ ওঠে। বাড়ির মাঝখানের উঠোনের পশ্চিমদিকে রাঙাকাকার ঘরখানা কেউ ব্যবহার করে না। বন্ধই পড়ে আছে।

এই উঠোনের মাঝখানে ছিল ইঁট দিয়ে বাঁধানো তুলসীমঞ্চ। কোনোদিন মা, কোনোদিন কাকীমাদের মধ্যে কেউ সন্ধ্যেবেলা তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে আসতেন। একদিন কিভাবে গল্পে গল্পে কারো আর প্রদীপ দেবার কথা মনে পড়েনি। অন্ধকার বেশ গাঢ় হতে হঠাৎ মেজকাকীমা বললেন—ওই যাঃ, তুলসীতলায় আলো দেখানো হয়নি তো। আমার আবার হাত জোড়া। যা তো মা বিরাজ, একটা প্রদীপ জ্বেলে তুলসীতলায় দিয়ে আয়—

একটু পরেই বাইরে উঠোন থেকে বিরাজের গলার চিৎকার ভেসে এল, পর পর দুবার। কাকীমারা দৌড়ে গেলেন, বারবাড়ি থেকে কাকা-জ্যাঠারা ছুটে এলেন।

তুলসীমঞ্চের কাছে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে বিরাজ। পায়ের কাছে মাটিতে প্রদীপটা পড়ে আছে, তেল ছড়িয়ে পড়েছে উঠোনে।

—কি রে, কি হয়েছে? অমন চেঁচিয়ে উঠলি কেন?

বিরাজ কাঁপা-কাঁপা আঙুল তুলে রাঙাকাকার ঘরের দিকটা দেখিয়ে বলল—রাঙাকাকীমাকে দেখলাম। ওইখানটায় দাঁড়িয়েছিল—

সবাই চুপ। বিরাজ মিথ্যে বলবে না, আর তার বিশেষ অপ্রাকৃত ক্ষমতার ব্যাপারটা এখন প্রায় একটা প্রমাণিত সত্য। তবু বাবা একবার বললেন—যাঃ কি যা-তা বলছিস? অন্ধকারে ভুল দেখে থাকবি—

—না জেঠু, আমি ঠিক দেখেছি। সাদা কাপড় পরা ছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন বলল, তারপর আবার ঢুকে গেল ঘরে—

—ঘর থেকে বেরিয়ে এল? বাবা এগিয়ে গিয়ে রাঙাকাকার ঘরের দাওয়ায় উঠে দরজায় লাগানো তালা টেনে দেখলেন।—তা কি করে হবে? এই তো তালা বন্ধ রয়েছে।

বুঝিয়েসুঝিয়ে বিরাজকে ঠাণ্ডা করে ভেতরে নিয়ে আসা হল। তখনকার মত চাপা পড়ে গেলেও এরপর থেকে বিরাজ ঘন ঘন রাঙাকাকীমাকে দেখতে শুরু করল। কখনো একেবারে পরিষ্কার দিনের বেলায়। কাকীমা যেন বিরাজকে কি বলছেন। মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি বলে কিছু বুঝতে পারিস?

—না জেঠিমা। মুখ নাড়ছে দেখতে পাই, কথা কানে আসে না। তবে একটা জিনিস—

—কি?

—কাকীমার খুব কষ্ট বলে মনে হয়।

—কি করে বুঝলি? কথা তো শুনতে পাস না—

—মুখ দেখতে পাই যে! খুব ব্যথা পেলে যেমন মুখ হয় সেইরকম—

ছোটকাকা গিয়ে কোথা থেকে এক ভূতের রোজা ডেকে আনলেন। লোকটাকে দেখে আমার আদৌ শ্রদ্ধা হল না। তখন আমি একটু বড় হয়েছি, গ্রামে সাধুসন্ত এলে সেখানে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকি, লোক চেনবার ক্ষমতা সামান্য হয়েছে। ভূতের রোজা ঘণ্টাদুয়েক ধরে উঠোনে নানান বিচিত্র ক্রিয়াকলাপ করল, মাটিতে খড়ি দিয়ে নকশা এঁকে তার ওপর শ্বেতসরষে আর আতপচাল ছিটিয়ে চিৎকার করে মন্ত্র পড়তে লাগল। কিন্তু ওই পর্যন্তই—সে দক্ষিণা নিয়ে বিদায় হবার পর সেদিন বিকেলেই বিরাজ আবার রাঙাকাকীমাকে দেখতে পেল। দালানের একদিকে রান্নাঘর, সেখানে মা উনুনে আঁচ দিচ্ছেন আর বিরাজ মেঝেতে বসে বিকেলের তরকারীর জন্য কুটনো কুটছে, এমন সময় বিরাজ দেখল লম্বা দালান বেয়ে কাকীমা হেঁটে চলে যাচ্ছেন। বিরাজ চেঁচিয়ে উঠল—ওই, ওই যে কাকীমা যাচ্ছে!

মা কাজ ফেলে ছুটে এসে দেখলেন বিরাজ একদৃষ্টে দালানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে—দেখতে পাচ্ছ না জেঠিমা? ওই তো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে! হাতে আবার একটা কি জিনিস রয়েছে। ওমা, একটা ডলপুতুল!

মা, বলা বাহুল্য, দালানের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলেন না।

—হাতে কি রয়েছে বললি?

—ডলপুতুল। সেই ছোটবেলায় যেমন তুমি আমাকে কিনে দিয়েছিলে।

—ডলপুতুল হাতে কোনো এক মৃতার প্রেতাত্মা বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে একথা কল্পনা করা কষ্টকর, কিন্তু বিরাজ কিছু একটা দেখতে পাচ্ছে ঠিকই—নইলে হাতে পুতুল থাকার মত সূক্ষ্ম মিথ্যা বিরাজের পক্ষে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়।

এরপর ছোটকাকা আর একজন ভাল রোজা আনবার প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু এবার বিরাজ নিজে বারণ করল—না বাবা, গুণিন্ এনো না—

—কেন রে?

—রাঙাকাকীমা আমাকে কত ভালবাসত, মরে গিয়ে কি আমার ক্ষতি করতে চাইবে? হয়ত আমাকে ভুলতে পারেনি বলে আমার কাছে আসে—

দিন কাটতে লাগল! মাস দুই-তিন হয়ত কিছু হল না, আবার একদিন বিরাজ কাকীমাকে দেখতে পায়। মানুষের মন বড় বিচিত্র জিনিস, কালে সবই খাপ খেয়ে যায়। বিরাজের রাঙাকাকীমাকে দেখতে পাওয়াটাও একটু একটু করে সকলের গা-সওয়া হয়ে এল।

প্রথম যৌবনে পা দিয়েই আমি বাড়ি থেকে পালালাম গুরুর খোঁজে, সে গল্প কিছুটা তোমরা জানো। তান্ত্রিকসাধনার দিকে খুব মন গিয়েছিল। প্রকৃত গুরুর সন্ধানে কোথায় কোথায় না ঘুরেছি। মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরে আসি, আবার কিছুদিন পরে উধাও হই। এই সময়েই মাতু পাগলীর সঙ্গে আমার পরিচয়। সে বড় সাংঘাতিক মেয়েমানুষ, আমাকে দীক্ষা দেয়নি বটে, কিন্তু

কতগুলো ক্ষমতা দান করেছিল। তারপর বরাকর নদীর ধারের শালবনে সেই মধুসুন্দরী দেবীর আবির্ভাব। তিনিও আমাকে বীজমন্ত্র এবং কতগুলি শক্তি দান করেন। তাঁরই প্রসাদে জীবনে কখনো বড় কোনো বিপদে পড়তে হয়নি, ডালভাত খেয়ে যাহোক করে চালিয়ে দিয়েছি। আমি বড়দরের সাধক হতে পারিনি হে, কয়েকটা সাধারণ সিদ্ধাই পেয়েছিলাম মাত্র!

একবার বাড়ি ফিরে দেখলাম, বিরাজের বিয়ের তোড়জোড় হচ্ছে। ভাল একটা সম্বন্ধ এসেছে গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগর থেকে। ছেলের বাপ-মায়ের বিশেষ দাবি-দাওয়া কিছু নেই, মেয়ে দেখে তাদের খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছে। এখন কেবল দিনক্ষণ ঠিক করবার যা দেরি। বিরাজ দেখতেও সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে। মাথায় বেশ লম্বা, ফর্সা ধপ্‌ধপ্‌ করছে গায়ের রঙ, একঢাল কালো কোঁকড়ানো চুল, টানা টানা চোখ—এ মেয়ের বিয়েতে খরচ না হবারই কথা।

আমি থাকতে-থাকতেই একদিন পাত্রপক্ষ এসে বিরাজকে আশীর্বাদ করে পাকা কথা দিয়ে গেল। পাত্রের বাবা মানুষটি ভারি অমায়িক, গোলগাল চেহারা, মুখে সব সময় হাসি লেগে রয়েছে। গ্রামদেশে পাত্রের বাবার সাধারণত একটা দাম্ভিক চালচলন থাকে, এ ভদ্রলোকের সে-সব নেই। বেশ হেসে হেসে গল্প করলেন, বিরাজকে পাশে বসিয়ে 'মা আমার যেন লক্ষ্মী' বলে গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। আশীর্বাদ করলেন দশভরির সেকেলে পাকা সোনার সুষনিপাতা হার দিয়ে। কথা রইল এক বছর পর সামনে বৈশাখে বিয়ে হবে। ওঁদের কি পারিবারিক আচার অনুযায়ী পাত্রের বয়েস জোড়সংখ্যক বছরে না হলে বিয়ে হয় না। সামনের বছর ছেলের বয়েস হবে চব্বিশ।

আশীর্বাদ সেরে পাত্রপক্ষের লোকেরা বিকেলবেলা চলে গেলেন, তাঁরা সন্ধ্যের ট্রেন ধরবেন। সঙ্গে আমাদের বাড়ি থেকে লোক দেওয়া হল স্টেশন অবধি পৌঁছে দেবার জন্য।

সেইদিনই রাত্তিরে বিরাজের ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ পেয়ে মা আর বাবা উঠে দেখতে গেলেন। ছোটকাকীমার পাশেই শুয়েছিল বিরাজ। কাকীমা জেগে বসে অবাক হয়ে বিরাজের দিকে তাকিয়ে আছেন, আর বিরাজ অঝোর-ধারায় কাঁদছে।

মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে বিরাজ নাকি দেখতে পায় মশারীর ঠিক বাইরে রাঙাকাকীমা দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে কি বলবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টাতেও তাঁর গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হচ্ছে না। কি করুণ, বিধ্বস্ত মুখ রাঙাকাকীমার! বিরাজ কেঁদে ফেলে বলে—কেন বার বার আসছ রাঙাকাকী? কি বলবে? কি কষ্ট তোমার?

উত্তরে রাঙাকাকীমা দু'হাতে ধরে রাখা কি একটা জিনিস সামনে বাড়িয়ে দেন।

সে-হাতে ডলপুতুল। কি সুন্দর! ঠিক যেন একটা সত্যিকারের বাচ্চা।

এই সময়ে ছোটকাকীমা জেগে উঠতে রাঙাকাকীমার শরীর যেন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ে গেল।

পরদিন সকালে বাবারা সব ভাই মিলে পরামর্শ সভা বসালেন। আলোচনার বিষয় ছিল এই—বিরাজের বিয়ে হতে চলেছে। বিয়ের পরেও যদি সে এরকম রাত-বিরেতে চেঁচামেচি করে, তাহলে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কি ভাববে? পরে এ নিয়ে মহা অশান্তির সূত্রপাত হতে পারে। আবার কি একজন রোজা ডাকা হবে? আর কি করা যেতে পারে?

সবার মতামতই রোজা ডাকার দিকে যাচ্ছে দেখে আমার বড় খারাপ লাগল। প্রেতবিতাড়নী মন্ত্র অবশ্যই আছে, কিন্তু বেশির ভাগ পাড়াগেঁয়ে বুজরুকের দল তার কিছুই জানে না। আমি জানি, কিন্তু রাঙাকাকীমাকে আমরা সবাই খুব ভালোবাসতাম—তাঁকে তাড়াবার জন্য কোন ক্রিয়া-অনুষ্ঠান করতে কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকতে লাগল। তাছাড়া ওই মন্ত্র পাঠ করবার সময় যে আত্মাকে তাড়ানোর জন্য অনুষ্ঠান করা হচ্ছে তার খুব কষ্ট হয়। সে যন্ত্রণার মধ্যে

রাঙাকাকীমাকে ফেলতে মন চাইল না। অবশ্য একটা কাজ করা যায়, বিরাজকে একটা কবচ করে দিতে পারি। সেটা হাতে ধারণ করলে কোনো আত্মা ইচ্ছে করলেও ওকে দেখা দিতে পারবে না। যা যা লাগবে যোগাড় করতেও বিশেষ অসুবিধে হবে না। বামাবর্ত শঙ্খের চূর্ণ আর তিনটে কাকের বাসা আছে এমন নিমগাছের শেকড়ের অংশ চাই। তার সঙ্গে মেশাতে হবে—না, তোমাদের কাছে এসব বলা বৃথা! ওই যে কিশোরী হাসছে—

কিশোরী তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে বলল—না না, আমি অবিশ্বাস করে হাসছি না মোটেই। আসলে আপনি মাঝে মাঝে এমন সব জিনিসের নাম করেন, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একেবারেই অপরিচিত—শুনলে হাসি পেয়ে যায়। আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বিরাজের এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনার কি মত?

তারানাথ বলল—বিরাজ খুব ভাল মিডিয়াম ছিল। তখন ততটা বুঝতে পারি নি, এখন আন্দাজ করতে পারি। তুলা রাশি, চন্দ্র প্রবল—এমন জাতিকার এটা হতে পারে। হবেই যে এমন কোন কথা নেই—এর ভেতর আরো অনেক প্রভাব কাজ করে, তবে হওয়া সম্ভব। এদের কাছে মৃত আত্মারা সহজেই দৃশ্যমান হয়। ডামরতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী কবচ করে দিলে জাতক বা জাতিকার এই গুণ সাময়িকভাবে লোপ পায়। আর বিরাজ যে মিথ্যে বলছে না বা এটা ওর মনের কিংবা চোখের ভুল নয়, তা আমি সহজেই বুঝতে পেরেছিলাম। কারণ তোমরা তো জানো, আমি প্রেতাত্মার অস্তিত্ব টের পাই। বিরাজের সঙ্গে মৃত আত্মার যোগাযোগ আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

বললাম—কি করে বোঝেন? দেখতে পান?

—দেখতে তো পাই-ই, তবে সব সময় দেখবার প্রয়োজন হয় না। আমি গন্ধ দিয়ে বুঝতে পারি—

—কি রকম?

—যেখানে ঘন ঘন আত্মার আবির্ভাব হয় সেখানকার আবহাওয়ায় একটা অদ্ভুত গন্ধ থাকে। অনেক দিনের বন্ধ ঘরের ভেতর যেমন একটা ছাতাধরা ভ্যাপসা গন্ধ পাওয়া যায় সেই রকম। সেই সঙ্গে সমস্ত শরীরে-মনে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়—এটা অবশ্য আমি তোমাদের ভাষা দিয়ে ঠিক করে বোঝাতে পারবো না।

কিশোরী বলল—যাই হোক, গল্পটা বলুন।

তারানাথ আবার শুরু করল।

—কবচের কথা তুলতেই বাবা বললেন—তুই? তুই আবার কি কবচ দিবি? না না, সে কাজ নেই—

আসলে বাড়ির লোকেরা আমাকে একেবারেই হিসেবের বাইরে রেখেছিল। অপদার্থ, বাড়ি-পালানো ছেলে, আমাকে দিয়ে কোনো কাজের কাজ হওয়া সম্ভব নয়—এই ধারণা প্রত্যেকেরই।

বললাম—একবার দেখই না, ফল না হলে খুলে ফেলে দিয়ো।

তাও বাবা বোধ হয় রাজি হতেন না, কিন্তু ছোট কাকীমা বললেন—আচ্ছা, ও দিক না কবচ, বিশ্বাসেও তো ফল হয়। অনেকে অনেক কিছু করল, একবার ওরটা করে দেখি—

তিন-চার দিনের মধ্যে কবচ তৈরি করে বিরাজের হাতে পরিয়ে দিলাম।

এরপর মাস দুই সেবার বাড়িতে ছিলাম, তার মধ্যে বিরাজ আর কখনো রাঙাকাকীমাকে দেখেনি। বাবা পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলেন—নাঃ, ছেলেটা কিছু বিদ্যে শিখেছে বটে—

গ্রামাঞ্চলে এসব খবর খুব দ্রুত রটে। আমার দেওয়া কবচের গল্প কিছুদিনের মধ্যেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। একদিন বাবা এসে বললেন—দু'জন লোক তোকে ডাকছে, বাইরে বসিয়ে রেখেছি। যা—

বাবা দেখি কেমন প্রশংসামিশ্রিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

বাইরের ঘরে এসে দেখি দুজন গেঁয়ো চেহারার লোক চৌকিতে সঙ্কুচিত হয়ে বসে আছে। ময়লা ধুতি, ফর্সা জামা—তাতে আবার কাচবার সময় বেশি নীল পড়ে গিয়েছে।

বললাম—কি চাই?

—আজ্ঞে আমরা চালতেপোতা থেকে এসেছিলাম—

—বেশ। কি দরকার?

—আজ্ঞে আপনি একজন গুণী লোক। আমাদের ওদিকে আপনার খুব নাম রটে গিয়েছে। আপনি ইচ্ছে হলে সব করতে পারেন—

—কি বিপদ! আপনারা কি চান তাই বলুন না—

তাদের প্রার্থনা অতি সরল। ভদ্রাসন নিয়ে তারা তাদের খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে জোর মামলা লড়ে যাচ্ছে। আমি কি মামলায় জেতবার জন্য তাদের একটা কবচ করে দিতে পারি? এজন্য তারা দুশো টাকা অবধি খরচ করতে প্রস্তুত আছে।

ধমক দিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিলাম বটে, কিন্তু বুঝতে পারলাম, এই সবে শুরু মাত্র। এবার দলে দলে লোক আসতে আরম্ভ করবে। ক'জনকে তাড়াব? কাজেই পরদিন শেষরাত্তিরে পোঁটলা-পুটলি গুছিয়ে বাড়ি থেকে সরে পড়লাম।

কিশোরী জিজ্ঞাসা করল—কিন্তু এ ধরনের কবচ তো আপনি দিয়ে থাকেন, তাহলে ওদের তাড়ালেন কেন?

তারানাথ বিষন্নভাবে হেসে বলল—সে অনেক পর থেকে দিতে শুরু করি। ওই সময় আমার প্রথম যৌবন, মনে আশা সিদ্ধসাধক হব। টাকার জন্য মামলার কবচ, গরু হারানোর মাদুলি দেওয়া—ওসব ভাবতেই পারি না। তারপরে বিয়ে -থাওয়া করলাম, সন্তনাদি হল—সংসারের পেষণে দৈবওষুধ থেকে বশীকরণ হোম—সবই শুরু করলাম। সেই থেকে পতনের আরম্ভ—

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারানাথ গল্পে ফিরে এল।

ন'দশ মাস এদিক-সেদিক ঘুরে বিরাজের বিয়ের কিছুদিন আগে বাড়ি ফিরে এলাম। আমাকে দেখে আর কেউ তেমন না হোক মা খুশি হলেন।

—যাক, বিরাজের বিয়ের কথাটা মনে রেখেছিস তাহলে! তুই না এলে আমার ফাঁকা-ফাঁকা লাগত—

অপ্রস্তুতভাবে একটু হাসলাম কেবল। কি আর বলার আছে? মা-ই কেবল শেষদিন অবধি নিঃস্বার্থ ভালবাসা দিতে পারে সন্তানকে। অন্য কেউ খুব আত্মীয়তা বোধ না করলে তাদের দোষ দিতে পারি না। আমিই বা কি দায়িত্ব পালন করেছি বাড়ির লোকেদের প্রতি? ভালবাসা তো আকাশ থেকে পড়ে না।

রাত্তিরে খাওয়ার সময় বাবা বললেন—তুমি যে কবচ দিয়ে গিয়েছিলে বিরাজকে তাতে খুব কাজ হয়েছে। তারপর থেকে বিরাজ আর ভয়টয় পায়নি—

কিছুক্ষণ চুপচাপ খেয়ে যাবার পর বাবা বললেন—এই যে একটা বিদ্যা শিখেছিস, এটাও তো বাড়িতে থেকে ব্যবহার করতে পারতিস। টাকার জন্য না হয় না-ই হল, মানুষের উপকারের জন্যও তো করতে পারিস? বাড়িতে তোর মন বসে না কেন?

চুপ করে রইলাম। আমার মনের গড়ন এমন হয়ে গিয়েছে যে, বাড়িতে আর কোনোদিন মন বসবে না। বাবাকে সেকথা বলে লাভ নেই।

নির্ঝঞ্ঝাটে বিরাজের বিয়ে হয়ে গেল। বরযাত্রীদের খাইয়েদাইয়ে মুখুজ্যেদের বড় বাড়ির হলঘরে ঢালা বিছানা পেতে শুইয়ে দেওয়া হল। গোধূলিলগ্নে বিয়ে, রাত এগারোটার ভেতর বিয়েথাওয়া, কুশণ্ডিকা সব শেষ। একতলার কোণের ঘরে মেয়েরা বাসর জাগবার আয়োজন করেছিল, রাত দেড়টা দুটো অবধি বাসরঘর থেকে হাসি আর গানের শব্দ পাচ্ছিলাম। আস্তে আস্তে বাসরের কোলাহল থেমে এল, ছেলেমানুষেরা আর কত রাত্তির জাগবে! শরীর খাটাখাটুনি করে ক্লান্ত, আমিও কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি।

ঘুম ভাঙল শেষরাত্তিরে বাবার ডাকাডাকিতে।

তাকিয়ে দেখি বাবা পাশে দাঁড়িয়ে ধাক্কা দিচ্ছেন—ওঠ্ ওঠ্!

ব্যস্ত হয়ে উঠে বসে বললাম—কি হয়েছে বাবা?

বাবা পাংশুমুখে বললেন—বিরাজ আবার ঐরকম করছে।

—সে কি! এমন তো হবার কথা নয়!

—কি জানি। তুই কবচ দেবার পর আর কখনো তো হয়নি। বাসরেও তো সবাই মিলে আমোদ-আহ্লাদ করেছে—তারপর বুঝি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। এই একটু আগে চিৎকার করে জেগে উঠেছে। জামাই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছেন—তুই একবার চল্—

ততক্ষণে আমি নাকে একটা সোঁদা-সোঁদা ছাতাধরা, ভ্যাপ্‌সা গন্ধ পেতে শুরু করেছি। এবার এসে অবধি এ গন্ধটা আর পাইনি।

বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললাম—আমার সঙ্গে এসো তো—

সিঁড়ি দিয়ে নিচে না নেমে সোজা এগিয়ে যাচ্ছি দেখে বাবা বললেন—ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস? বিরাজ তো নিচে বাসরঘরে—

বললাম—এসোই না।

ছোটকাকীমার ঘরের সামনে এসে থামলাম। দরজা খোলা, সবাই নিচে গিয়েছে বিরাজকে সামলাতে। ঘরে ঢুকে বাতিটা উস্‌কে দিয়ে দেরাজগুলো খুলে দেখতে শুরু করলাম। বাবা অবাক হয়ে বললেন—তোর কি মাথাখারাপ হল নাকি? এখানে কি করছিস?

ওপর থেকে তিন নম্বর দেরাজে ছিল জিনিসটা। আমার ধারণাই ঠিক। বাবার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে বাড়িয়ে ধরলাম বিরাজকে দেওয়া আমার কবচখানা।

—এ কি! এটা এখানে এল কি করে?

সেটা অবশ্য আমিও পরিষ্কার জানতাম না। তবে বিরাজ যে কবচটা খুলে রেখেছে এবং তার ফলেই এই বিপত্তি তা বুঝেছিলাম। আর খুলে রাখতে হলে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা নিজের ঘরের দেরাজ। বোধ হয় হাতে অতবড় একটা কবচ থাকলে স্বামী অবাক হতে পারে বা শ্বশুরবাড়ির লোকজন নানা সন্দেহ করতে পারে এই ভয়ে বিয়েতে বসবার আগে বিরাজ ওটা খুলে রেখে গিয়েছিল। আট-দশ মাস নিরুপদ্রবে কাটায় সে ভেবেছিল কাকীমা হয়ত আর দেখা দেবেন না। লজ্জা করা অসঙ্গতও নয়। কবচটা চৌকো তক্তির মত, বেশ বড়। অতবড় জিনিসটা কারো-না-কারো চোখে পড়তেই পারে।

বাবার হাতে কবচটা দিয়ে বললাম—যাও, আড়ালে ডেকে পরিয়ে দাও। জামাইয়ের সামনে করবার দরকার নেই—

জামাই ছেলেমানুষ, তাকে যাহোক বুঝিয়ে দেওয়া কঠিন হল না। বিরাজকে সাবধান করে দেওয়া হল, আর কখনো যেন সে কবচ খুলে না রাখে।

বিকেলে মেয়ে-বিদায়ের সময় এল। ভেতরবাড়ির দালানে আসন পেতে মেয়ে-জামাইকে আশীর্বাদ করা হচ্ছে, বাইরে খোদাবক্সের ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে, রওনা দেবার সব আয়োজন সমাপ্ত। জিনিসপত্র যা সঙ্গে যাবে তা বেঁধে তুলে দেওয়া হয়েছে ঘোড়ার গাড়ির ছাদে। কেবল বর-বউয়ের জামাকাপড় আর গয়না যাবে একটা লাল রঙের স্টীলের ট্রাঙ্কে, সেটা বিরাজের ঘরে রয়েছে। যাবার সময় সে নিয়ে যাবে।

মেয়ে-জামাই বিদায় হবার সময় বাড়ির মেয়েরা তো কান্নাকাটি করলেনই, এমন কি বাবা আর মেজকাকা অবধি দেখলাম বারান্দায় এক কোণে দাঁড়িয়ে চোখ মুছছেন। ছোটকাকাকে তো খুঁজেই পাওয়া গেল না, আশীর্বাদ করেই তিনি কোথায় গিয়ে লুকিয়ে বসে আছেন।

আশীর্বাদের পর্ব মিটে গেলে মেয়ে-জামাইকে নিয়ে যাওয়া হল ছোটকাকীমার ঘরে, সেখানে লক্ষ্মীর আসনের সামনে ওদের প্রণাম করিয়ে নিয়ে তারপর গাড়িতে তুলে দেওয়া হবে।

ঘরে ঢোকবার মুখে চৌকাঠের কাছে থমকে দাঁড়ালেন মা, এ কি! এগুলো এমন করল কে?'

ঘরের সামনে চৌকাঠের বাইরে কে যেন বিরাজের লাল ট্রাঙ্কটা টেনে বার করে ভেতরের জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে একাকার করেছে। মুখে মাখবার নতুন পাউডারের কৌটোটা ঢাকনা খোলা অবস্থায় পড়ে, তার থেকে মুঠো মুঠো পাউডার চারদিকে ছড়িয়ে কেউ খেলা করেছে যেন।

মা তাড়াতাড়ি ট্রাঙ্কের ভেতরে হাতড়ে দেখলেন। না, জামাইয়ের শালের নিচে গয়নার বাক্স ঠিক আছে। তাহলে এর মানে কি? চোর হলে গয়নার বাক্সই তার লক্ষ্য হবে। কোনো শিশুর দুষ্টুমি বলে মনে করা যেত, কিন্তু তত ছোট শিশু বাড়িতে কেউ নেই।

মা আর ছোটকাকীমা জিনিসগুলো গুছিয়ে আবার বাক্সে ভরে দিয়ে ট্রাঙ্কের ডালা বন্ধ করতেই যারা কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল তারা অস্ফুট বিস্ময়সূচক শব্দ করে উঠল।

ট্রাঙ্কের লাল রঙের ডালার ওপরে পাউডারমাখা ছোট ছোট হাতের ছাপ! একটি শিশু যেন হাতে পাউডার মেখে মনের আনন্দে ছাপ দিয়েছে।'

কিন্তু অত ছোট বাচ্চা তো কেউ নেই আমাদের বাড়িতে। ছাপগুলো খুবই ছোট ছোট হাতের, প্রায় সদ্যোজাত শিশুর মত। এত ছোট বাচ্চা কি নিজে বসে খেলা করতে পারে?

ব্যাপারটা রহস্যই রয়ে গেল। বিরাজ আর তার স্বামী রওনা হয়ে যাবার পর এ নিয়ে অনেক আলোচনা হল বটে, কিন্তু কেউ কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারল না।

এর কিছুদিন পর আমিও আবার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। কত ঘুরলাম সমস্ত বাংলাদেশের শ্মশানে-মশানে, সিদ্ধপীঠে। প্রকৃত সাধকের দেখা পাবার পিপাসা মনের মধ্যে উদগ্র হয়ে উঠেছে তখন। সারাদিন পথ হাঁটি, সন্ধ্যেবেলা কোনো মন্দিরে কি বাঁধানো গাছের তলায় রাতের আশ্রয় নিই। রান্না করে খেতাম না কখনো। হাতে পয়সা থাকলে দোকান থেকে চিড়ে-মুড়ি কিনে নিতাম, কখনো বা পুণ্যলোভী গ্রামবাসীরা খাবারদাবার উপহার দিয়ে যেত। জীবনের এই সময়টা খুব ভাল কেটেছে, জানো? এখন এই বদ্ধতার ভেতর বসে মনে করলে রোমাঞ্চ হয়। কেমন মুক্ত আনন্দে পথে পথে বেড়ানো, মাথার ওপরে খোলা আকাশ, পথেরও কোনো সীমা নেই। কত বিচিত্র মানুষের সঙ্গে পরিচয়, কত আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় সাধনার জন্য নয়, বোধ হয় এই পথের নেশাতেই ঘরছাড়া হয়ে পড়তাম।

এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে বাংলা আর বিহারের সীমান্তে একটা ছোট শহরমত জায়গায় গিয়ে পড়েছি, সেখানকার মুদির দোকানে চিড়ে আর গুড় কেনবার সময় মুদিকে জায়গাটার নাম জিজ্ঞাসা করলাম।

মুদি বলল—ছোট রামপুর বাবুজী।

আমি চমকে উঠলাম—কি বললে? ছোট রামপুর?

—জী। কেন বাবু?

—না, কিছু না।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই ছোট রামপুরেই ছিল রাঙাকাকীমার বাপের বাড়ি। এখানেই কাকীমার মৃত্যু হয়।

পুরনো স্মৃতি ভিড় করে এল মনে। শৈশবে দেখা কাকীমার সেই হাসিমাখা মুখ, কোদাল হাতে রাঙাকাকা বাগানের জমি কোপাচ্ছেন, কাকীমার মৃত্যুতে রাঙাকাকার সেই কান্না।

ছোট রামপুরের প্রান্ত দিয়ে বয়ে গিয়েছে ভীমা নদী। বিশেষ চওড়া নয়, স্রোতও কম। কিন্তু নদীর দু'পাড়ে অনেক দূর অবধি বসতি না থাকায় ভীমা একটা অপূর্ব নির্জনতা লাভ করেছে। নদীর ধারেই রামপুরের শ্মশান। উঁচু-নিচু লালমাটির প্রান্তরের মধ্যে কেবলমাত্র শ্মশানযাত্রীদের জন্য তৈরি একটা চালাঘর দাঁড়িয়ে আছে। আমি যখন পৌঁছলাম, তখন দিনের আলো নিভে এসেছে বটে, কিন্তু সেদিন সম্ভবত শুক্লপক্ষের নবমী—কাজেই রাত্তিরে জ্যোৎস্নার শোভা উপভোগ করা যাবে। শ্মশানে কাটানো আমার অভ্যেস আছে, ভয় পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

ভীমার তীরে বসে চিঁড়ে গুড় দিয়ে রাত্তিরের খাওয়া সেরে নদীতে নেমে জল খেলাম। ততক্ষণে দিনের আলো সম্পূর্ণ মুছে গিয়ে রুক্ষ ভূমিশ্রীর ওপর ফুটে উঠেছে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না। নদীর ধারের সাদা বালি চিকচিক করছে চাঁদের আলোয়। অমন দৃশ্য তোমরা দেখনি হে, শহর-বাজার অঞ্চলে তোমরা পূর্ণিমা বা অমাবস্যা টের পাও না। শহরে জীবন নেই।

শরীর খুব ক্লান্ত ছিল, ভাবলাম আর জেগে না থেকে ঘুমিয়ে পড়া যাক। সামনে চালাঘরটা যখন আছে তখন আর খোলা জায়গায় ঘুমোই কেন? এই ভেবে শ্মশানযাত্রীদের ঘরটার দিকে এগুলাম।

বাইরে জ্যোৎস্না থাকলেও ঘরের মধ্যে তা পৌঁচচ্ছে না। অন্ধকারে তাকিয়ে যতদূর মনে হল ঘরটা একেবারে ফাঁকা, কেবল একদিকে কতগুলো খড়ের আঁটি পড়ে আছে। ভালই হল, আমি খড়ের আঁটিগুলো বিছিয়ে একটু গদিমত করে চেপে বসলাম।

বিড় ধরাতে গিয়ে দেশলাইয়ের আলোয় প্রথম চোখে পড়ল লোকটাকে। এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি, ঘরে আর একজন মানুষ আছে। কখন থেকে বসে আছে লোকটা? খালি গা, আধময়লা ধুতি পরনে, লম্বা চুল—মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল। হঠাৎ আলো জ্বলায় মুখের সামনে হাত দিয়ে আড়াল করে আছে।

পোড়া কাঠির টুকরোটা ফেলে দিলাম। বিড়ি ধরে গিয়েছিল, গোটাদুই টান দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি কে? এখানে কি করছ?

অন্ধকারে লোকটাকে দেখা যায় না, সে যেখানে বসে আছে আন্দাজে সেদিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করলাম।

প্রথমে খানিকক্ষণ চুপচাপ, তারপর কেমন যেন ভাঙা, খস্‌খসে গলায় উত্তর এল—আমি এই শ্মশানেই থাকি।

মড়া পোড়াতে সাহায্য করা যাদের জীবিকা, এমন একশ্রেণীর লোক প্রায় সব শ্মশানেই থাকে। আমি আন্দাজ করে নিলাম এ তাদেরই একজন। জিজ্ঞাসা করলাম—থাকো মানে কি? কি করো? মড়া পোড়াও?

—না।

—তাহলে?

—শুধু থাকি। আর শ্মশানে ঘুরে বেড়াই।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি এ ধরনের লোকেরা কথা কম বলে, আর নিজেদের সম্বন্ধে কিছু বলতে চায় না। কাজেই প্রসঙ্গ বদলে বললাম—বিড়ি খাবে?

—না।

ভাল মজা। আমি একটু গল্প জমাতে চাইছি, কারণ চিরদিনই আমার শহুরে পালিশ করা মানুষের চাইতে এইসব হাটে-মাঠে-ঘুরে-বেড়ানো চরিত্রদের বেশি ভাল লাগে—তা এ দেখছি বাক্যব্যয়ে একেবারেই অনিচ্ছুক। লোকটার গলাই বা অমন ভাঙা ভাঙা কেন? ঠাণ্ডা লেগেছে নাকি?

একটু চুপ করে থেকে ভাবলাম কি প্রসঙ্গে কথাবার্তা চালানো যায়, তারপর মনে হল ওর জীবনের সঙ্গে মিল আছে এমন কথা জিজ্ঞাসা করাই ভাল। ঘরের কোণে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বললাম—তুমি কতদিন আছ এইখানে?

—অনেকদিন।

—অদ্ভুত কিছু দেখনি? বা এমন কোনো ঘটনা, যা তোমার মনে রয়ে গেছে?

এইবার লোকটার অনিচ্ছুক কণ্ঠে প্রথম প্রাণের স্পর্শ লাগল। সে বলল—কেন দেখব না? এমন একটা ঘটনা দেখেছি যা কোনদিন ভুলতে পারবো না—

একটু বিস্মিত হয়ে বললাম—কি ঘটনা?

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর অন্ধকারের ভেতর থেকে আবার সেই মানুষটির গলা ভেসে এল—অনেক বছর আগে এই শ্মশানে একজন লোক তার স্ত্রীকে দাহ করতে নিয়ে এসেছিল। অল্পবয়েসের বৌ, লালপাড় শাড়ি পরিয়ে, মাথার সিঁদুর দিয়ে তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল। নদীর পাড়ে ওই যেখানে রাঙামাটি ঢিবি মত উঁচু হয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছ? বাইরে তো চাঁদের আলো? ঠিক ওইখানে লোকটা বসে কাঁদছিল একা। বৌকে খুব ভালবাসতো কিনা।

আমি নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলাম। এ ঘটনা যেন বড্ড চেনা-চেনা লাগছে। তাহলে কি এই লোকটা রাঙাকাকীমার দাহকার্যের সাক্ষী?

—ক'দিনের জন্য এসেছিল তারা, কাজ শেষ করে ফিরে যাবার কথা ছিল। বৌয়ের আর ফেরা হল না। আকাশে মেঘ ঘন হয়ে আসছিল, পাছে বৃষ্টি এসে পড়ে এই ভয়ে ডোমেরা বাঁশ দিয়ে চিতা খুঁচিয়ে দিচ্ছিল তাড়াতাড়ি কাজ সারবার জন্য। এখানেই জন্ম হয়েছিল বৌটার, আবার এখানে এসেই মরল—

আমার আর কোন সন্দেহ ছিল না, রাঙাকাকীমার শেষ কাজের কথাই বলছে বটে লোকটা। আশ্চর্য যোগাযোগ তো! আমি জীবনে আজ প্রথম এখানে এলাম, তাও না জেনে, আর এসেই লোকটার সঙ্গে আলাপ!

বললাম—খুবই দুঃখের কথা বটে, কিন্তু মানুষ তো মরেই। বিশেষ করে এই ঘটনাটা তোমার মনে আছে কেন?

আবার একটু স্তব্ধতা। লোকটার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছি না। মানুষ এমন চুপ করে বসে থাকতে পারে?

লোকটা বলল—মনে রাখবার কারণ আছে। বৌটার পেটে বাচ্চা ছিল।

আমি চমকে উঠে বললাম—কি বলছ তুমি? এ কথা কেউ জানতো না?

—না। বৌটা ভেবেছিল আর কিছুদিন বাদে স্বামীকে বলবে। তার সময় পায়নি। কিন্তু বাঁশ দিয়ে খোঁচাবার সময় ডোমেরা বুঝতে পেরেছিল। তারা বলেছিল মানুষটাকে। পেটে সন্তান থাকলে তাকে আলাদা করে দাহ করতে হয়, জানো তো? নইলে দুজনের কারোই মুক্তি হয় না। আহা, বৌটার বড় শখ ছিল একটা সন্তানের—সে শখও মিটল না, মুক্তিও হল না। মুক্তি না

হওয়ার কি যন্ত্রণা তা কেবল বদ্ধ আত্মাই জানে। তাই বুঝি নিজের যন্ত্রণার কথা জানাবার জন্য সে বার বার বিরাজের কাছে গিয়ে—

এতক্ষণ মেরুদণ্ড টান করে শুনছিলাম, এবারে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললাম—সে কি! তুমি বিরাজের নাম কি করে জানলে? কে তুমি?

কোনো উত্তর নেই! ঘরে স্তব্ধতা।

দেশলাই জ্বালালাম, কেউ নেই কোথাও।

দরজার বাইরে নদীর চরে অপার্থিব জ্যোৎস্না ফুটেছে। ঘরে যে ছিল সে দরজা দিয়ে বেরুলে আমি নিশ্চয় দেখতে পেতাম। দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে চারদিকে তাকালাম। শূন্য লালমাটির প্রান্তর চাঁদের আলোয় স্বপ্নের দেশ বলে মনে হচ্ছে। জনপ্রাণী নেই কোথাও। কোথায় গেল সে?

ঠিক এই সময়েই একঝলক বাতাসে ভেসে এল একটা সোঁদা, গুমো, ভ্যাপ্‌সা গন্ধ—অচেনা বক্তার পরিচয় প্রকট করে দিয়ে গেল।

ভেবে দেখলাম সব ঘটনাই একসূত্রে গাঁথা বটে। রাঙাকাকীমার যন্ত্রণাকাতর আত্মার বার বার ফিরে আসা, লাল ট্রাঙ্কের ওপরে ছোট ছোট হাতের ছাপ, কাকীমার হাতে ডলপুতুলের মত সদ্যোজাত শিশু দেখতে পাওয়া। বিরাজ ভাল মিডিয়াম ছিল, দেখতে পেত। কিন্তু কোন কারণে কথা শুনতে পেত না। শুনতে পেলে অনেক আগেই গোলযোগ মিটে যেত।

রাত্রি ক্রমে গভীর হতে লাগল। একা বসে রইলাম ভীমা নদীর পাড়ে।

পরের দিন সেখান থেকে রওনা হয়ে সোজা গয়ায় এসে রাঙাকাকীমা এবং তাঁর অজাত সন্তানটির মুক্তিকামনায় পিণ্ডদান করি। পুরোহিত মশায় যখন কাজের জিনিসপত্র সব গোছাচ্ছেন, হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, এই সঙ্গেই কি আরো একজনের নামে পিণ্ড দেওয়া যাবে? একসঙ্গে করে দিতে পারবেন?

পুরোহিত বললেন—কেন হবে না? কিছু মূল্য ধরে দেবেন এখন—কার নামে হবে? কি গোত্র?

পুরোহিতকে রাঙাকাকার নামটা বললাম।

তারানাথ ভাল গল্প বলতে পারলেও খুব মিশুক লোক ছিল না। এক ধরনের ফুর্তিবাজ জমাট মানুষ থাকে যারা চায়ের আড্ডায়, ময়দানের বেঞ্চিতে কিম্বা বিয়ের বাসরে একেবারে দারুণ জমিয়ে তোলে। তারানাথ ঠিক তার উল্টো—লোক দেখলে সে গুটিয়ে যায়। বিশেষ করে নিজের কথা সে কিছুতেই বলতে চায় না। কিন্তু আমাদের সহানুভূতির ছোঁয়ায় তারানাথের বন্ধ মনের দরজা অনেকখানি খুলে গিয়েছিল। অবশ্য সেটা কেবল আমাদের কাছেই। ইদানীং হাত দেখানো বা কোষ্ঠীবিচারের খদ্দের প্রায় নেই বললেই চলে, বন্ধুও কেউ নেই। সারাদিন একাকীত্ব ভোগ করার পর মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে আমরা হাজির হলে তারানাথের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। মানুষটা গল্পের খনি, আমরা নানাভাবে খুঁচিয়ে তার কাছে গল্প আদায় করতাম। তার মতের বিরোধিতা করলে তারানাথ রেগে যেত। আমি আর কিশোরী গল্পের লোভে হঠাৎ তার কথার মাঝখানে হো হো করে হেসে উঠে বলতাম—বাঃ, তা কখনো হয়?

তারানাথ চটে গিয়ে বলত—হয় না? এই শোনো তবে—

একটা নতুন গল্প শুরু হয়ে যেত।

সেদিন সকাল থেকেই টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি হচ্ছে। জামাকাপড়, রুমাল—এমন কি মনের ভেতরটা অবধি ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে রয়েছে। অন্যদিন অফিস ছুটির পর বলাইবাবু কিম্বা হরি মিত্তিরের সঙ্গে মোড়ের দোকানে চা খেতে খেতে রাজনীতি, জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য অথবা বাঙালী কি ছিল আর কি হয়েছে—এসব বিষয়ে গভীর আলোচনা করে আনন্দ পেয়ে থাকি। কিন্তু আজ আর সে-সব ইচ্ছে করল না। অফিস থেকে বেরিয়ে তারানাথের বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলাম।

পৌঁছে দেখি কিশোরী সেন আমার আগেই এসে বসে আছে। আমাকে দেখে বলল—এই যে! এসো হে—তোমারই জন্য বসে আছি—হেসে বললাম—কি করে জানলে আমি আসব?

—ওর জন্য কি আর মন্ত্র-তন্ত্র জানতে হয়? আজ এমন বাদলা করেছে—যাকে বলে আড্ডার মেজাজ, না এসে যাবে কোথায়?

তারানাথের জন্য এক প্যাকেট পাসিং শো কিনে এনেছিলাম, তাকে দিয়ে বললাম—আজ একটা ভাল গল্প হবে নাকি?

তারানাথ হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিল বটে, কিন্তু তার মুখে বিশেষ প্রফুল্লতা দেখলাম না। বিরসমুখে সে বলল—নাঃ তোমাদের কাছে গল্প বলতে ইচ্ছে করে না, তোমরা আমার গল্প অবিশ্বাস করো—

কিশোরী বলল—কই, সব গল্প তো অবিশ্বাস করি না! নেহাত যেগুলো একেবারেই বিশ্বাস করবার মত নয়, সেগুলো বাদে।

তারানাথ চটে উঠতে যাচ্ছিল, আমি কথার মোড় ঘোরাবার জন্য বললাম—কিশোরীর কথা ছেড়ে দিন। আসল কথা হচ্ছে, আপনার গল্প যদি সত্যি হয় তাহলে আমরা বিশ্বাস করলেই বা কি আর না করলেই বা কি? সত্য কারো মতামতনির্ভর নয়।

তারানাথ কথঞ্চিৎ শান্ত হয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল—এই যে বিশ্বাসের কথা বললে না? বিশ্বাসে সত্যিই অনেক কিছু ঘটায়, সাধারণ বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা করা যায় না—

কিশোরীর ঘাড়ে আজ দুর্গ্রহ ভর করেছিল, সে বলল—তার মানে আপনি বলতে চাইছেন কেউ যদি বিশ্বাস করে সে কোনোদিন মরবে না, তাহলে বিশ্বাসের জোরে সে সত্যি সত্যিই অমর হয়ে যাবে?

—যাবেই তো। তবে তোমার মত ফিচেল লোক পারবে না। হিমালয়ে যে-সব প্রাচীন যোগীরা শত শত বছর বেঁচে আছেন, তাঁরা কি করে এত দীর্ঘকাল জীবিত আছেন বলে মনে কর? কেবলমাত্র ইচ্ছাশক্তির জোরে। মানুষের বিশ্বাস ইচ্ছাশক্তিরই একটা প্রকাশ—

এমন সময় বাইরে আবার ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি নামল। আলো কমে গিয়ে অন্ধকারমত হয়ে এল ঘরের ভেতরে। বৃষ্টির বহর দেখে মনে হল সহসা থামবার নয়। অবশ্য তাড়াতাড়ি মেসে ফিরেই বা কি লাভ? কিন্তু এখানে বসে থাকতে হলে গল্প চাই। বললাম—বিশ্বাসের শক্তি সম্বন্ধে একটা ভাল গল্প হোক তবে—

তারানাথ বলল—আমার কাছে কোনো গল্প নেই, সব সত্যি ঘটনা।

কিশোরী আবার কি বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম—এখন অন্তত ঘণ্টাদুই আমরা আপনার অতিথি, বেরোবার উপায় নেই। আমাদের প্রার্থনা—একটি গল্প—মানে সত্যি ঘটনা। সৎ গৃহস্বামী মাত্রেই অতিথির প্রার্থনা পূরণ করে থাকে। আপনারও করা উচিত।

তারানাথ একটু হাসল। চোখ বুজে কিছুক্ষণ ভেবে বোধ হয় মনে মনে গল্পটা গুছিয়ে নিল, তারপর বলতে শুরু করল—বছর কুড়ি আগেকার কথা। এক শিষ্যবাড়ি থেকে স্বস্ত্যয়ন করে ফিরছি, ট্রেন বদলাবার জন্য বসে আছি রানাঘাট স্টেশনে। ট্রেনের তখনো প্রায় ঘণ্টাখানেক

দেরি। কি করা যায়, একটা বেঞ্চিতে বসে আপন মনে সিগারেট খেয়ে সময় কাটাতে লাগলাম। দক্ষিণা এবং পুজো বাবদ পাওয়া জিনিসপত্র পোঁটলা করে পায়ের কাছে রাখা। এমন সময় একজন মধ্যবয়সী লোক এসে আমার কাছে দাঁড়িয়ে বলল—একটু আগুনটা দেবেন তো ভাই—

বিশেষ খেয়াল না করেই পকেট থেকে দেশলাই বের করে তার হাতে দিলাম। প্রথম কাঠিটা নষ্ট করে দ্বিতীয় কাঠি দিয়ে লোকটা বিড়ি ধরিয়ে আমাকে দেশলাই ফেরত দিল। তখনও আমি তার দিকে তাকাইনি। দেশলাই পকেটে পুরে কি জানি কেন হঠাৎ লোকটার দিকে একবার চাইলাম। সে তখন পেছন ফিরে প্ল্যাটফর্মের অন্যদিকে চলে যাচ্ছে।

তাকিয়েই চমকে উঠলাম।

তোমরা তো জানো আমার কতগুলো বিশেষ ক্ষমতা আছে—যা দিয়ে আমি মানুষের আশু বিপদ বা ভাগ্য পরিবর্তনের কথা টের পাই। পেছন থেকে তাকিয়ে আমি লোকটার শরীর ঘিরে একটা কালো ছায়া দেখতে পেলাম। যেন একটা কালো মসলিনের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে লোকটা চলাফেরা করছে। বুঝলাম মানুষটা ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। পায়ের কাছ থেকে পোঁটলাটা হাতে নিয়ে আমি দ্রুতপায়ে তার পেছনে এগিয়ে গেলাম।

প্ল্যাটফর্মের একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে লোকটি অন্যমনস্কভাবে লাইনের ওপারে তাকিয়ে ছিল। আস্তে করে ডাকলাম—শুনছেন ভাই?

ভদ্রলোক ভয়ানক চমকে উঠে আমার দিকে তাকালেন। দেখলাম বছর চল্লিশ বয়সের একজন মানুষ, উদ্বেগে ও চিন্তায় মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। গালে পাঁচ-ছ'দিনের না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি। শার্টের একটা বোতাম ভুল ঘরে লাগানো। ভদ্রলোক বিস্মিত গলায় বললেন—আমাকে কিছু বলছেন কি?

একটু বিপদে পড়লাম। কেন ডেকেছি তা ভদ্রলোককে কি ভাবে বলা যায়? একজনকে তো আর হঠাৎ বলা যায় না—ও মশাই, আপনার খুব বিপদ, কারণ আপনার চারদিকে একটা কালো ছায়া দেখা যাচ্ছে!

সময় নেবার জন্য বললাম—আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল, একটু এদিকে আসবেন?

—কিন্তু আপনাকে তো ঠিক, মানে—

—না, আপনি আমাকে চেনেন না। আসুন, ওই চায়ের দোকানটায় এক ভাঁড় চা খেতে খেতে গুছিয়ে বলছি। আমি যা বলতে চাই এক কথায় বলা সম্ভব না—

যে কোন কারণেই হোক, এই সময়ে চায়ের স্টলে বিশেষ ভিড় ছিল না। ভদ্রলোককে একটা বেঞ্চিতে বসিয়ে দু-কাপ চায়ের অর্ডার দিলাম।

ভদ্রলোক উসখুস্ করছিলেন, বললেন—কই, কি বলবেন বলছিলেন—কি ব্যাপার বলুন তো?

কোন ভূমিকা না করেই বললাম—আমি একটু-আধটু জ্যোতিষ ইত্যাদি চর্চা করি। আপনি যখন আমার কাছে দেশলাই চাইলেন, আমার হঠাৎ কেন যেন মনে হল আপনার খুব বিপদ। সত্যি কি তাই? আমাকে খুলে বললে আমি হয়ত আপনার কাজে লাগতে পারি—

আমার বিশেষ ক্ষমতার কথাটা আর বললাম না। প্রথমেই সে কথা বললে আমাকে হয় পাগল নয়তো ঠগ মনে করবে।

ভদ্রলোক একটু সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। এবার ভাল করে দেখে বুঝলাম মানুষটা বেশ বুদ্ধিমান, কিন্তু সাম্প্রতিক দুঃসময় এবং উদ্বেগ তাঁর মুখের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যের ওপর ছায়া ফেলেছে। আজকাল সময় খারাপ, নানারকম ধান্দাবাজ লোক চারদিকে ঘুরছে—এমন অবস্থায় আমাকে হঠাৎ বিশ্বাস করতে না পারাই সম্ভব। কিন্তু মনের যে জোর

থাকলে লোকে কোন কিছুকে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করতে পারে, বর্তমানে সে মনের জোর তাঁর নেই। অসহায় ভাবে ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে বসে রইলেন।

হেসে বললাম—ভয় নেই, আমি ঠগ-জোচ্চার নই। আমার একটা, মানে একটা বিশেষ ধরনের ক্ষমতা আছে, তা দিয়ে আমি অনেক কিছু আগে থেকে বুঝতে পারি। আমার গুরুর আদেশ ছিল কারো বিপদ বুঝতে পারলে এগিয়ে গিয়ে সাহায্য করা, তাই আপনাকে দেখে—

ভদ্রলোক সামান্য কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন—কি ধরনের বিশেষ ক্ষমতা?

বললাম—এই যেমন ধরুন—আপনাকে দেখে বুঝতে পারছি আপনার জন্ম চৈত্র মাসে, সাত থেকে দশ তারিখের মধ্যে। আপনার নামের আদ্যক্ষর "ক"। গত তিন-চারদিনের মধ্যে আপনি বেশ বড় রকমের একটা অগ্নিভয় থেকে রক্ষা পেয়েছেন। আর—

ভদ্রলোকের চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল, বললেন—আর কি?

—বলব?

দুর্বল স্বরে ভদ্রলোক বললেন—বলুন।

—গত বছর আপনার কর্মস্থলে আপনাকে নিয়ে যে গোলমাল হয়েছিল তাতে বিচারে আপনি রেহাই পেয়ে গেলেও দোষটা কিন্তু আপনারই ছিল, তাই না?

ভদ্রলোক মাথা নিচু করে শুনছিলেন। মুখ তুললে দেখলাম তাঁর চোখে জল। আস্তে আস্তে বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, দোষ আমারই ছিল। কেউ জানে না সেকথা, আমার স্ত্রীও না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, নিতান্ত বাধ্য হয়েই—

বললাম—তিন হাজার টাকা। ঠিক তো?

ভদ্রলোক একবার কেঁপে উঠলেন।—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি সবই জানতে পেরেছেন দেখছি। আপনার ক্ষমতায় আর আমি অবিশ্বাস করছি না। স্ত্রীর অসুখে বাধ্য হয়ে তাকে বাঁচাবার জন্য টাকাটা নিতে হয়েছিল। ভেবেছিলাম কেউ টের পাবার আগেই দেশের জমিজমা বিক্রি করে আবার পূরিয়ে দেব। কিন্তু তার আগেই অডিট্ বসল, ঘাটতি ধরা পড়ে গেল। আমি বহু পুরনো বিশ্বস্ত কর্মচারী, আমাকে কেউ সন্দেহ করল না। অন্য কারো ঘাড়ে দোষ পড়লে হয়ত আমি এগিয়ে গিয়ে অপরাধ স্বীকার করতাম। কিন্তু তাও হল না—যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে টাকাটা বাজে খরচের খাতে লিখে রাখা হল।

তারপর ভদ্রলোক আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—ওঃ, আপনার কাছে সব স্বীকার করে যেন বাঁচলাম! এতদিন মনে পাপবোধ পুষে রাখা—উঃ, সে যে কি কষ্ট—

ধুতির খুঁটে মুখ মুছে আবার বললেন—হ্যাঁ, গত পরশুদিন আগুনের হাত থেকে বেঁচেছি বটে। আমার স্ত্রী পুত্র বর্তমানে দেশের বাড়িতে রয়েছে—যেখানে আমি এখন যাচ্ছি। নিজে রান্না করে খাওয়ার অভ্যেস নেই কোনকালে। হোটেলে খেলে আমার শরীর খারাপ হয়, তাই যা হোক ভাতে-ভাত দুটো-কটা ফুটিয়ে নেব বলে স্টোভ জেলে চাল বের করতে পেছন ফিরেছি, আর মশাই ধুতিতে লেগে গিয়েছে আগুন! কি ভাগ্য, সেই সময় আমার এক বন্ধু এসে হাজির আড্ডা দিতে। সে বিছানার মোটা চাদর চেপে ধরে আগুন নেভায়। তাও দেখুন না, কতখানি পুড়ে গিয়েছে—

ডান পায়ের থেকে কাপড় সরিয়ে নিতেই দেখলাম পায়ের গুলি থেকে উরুর পেছন অবধি ভেজা নেকড়ার ফেটি বাঁধা। বললেন—নারকেল তেলের পট্টি বেঁধে রেখেছি।

চায়ের দোকানের ছেলেটা এসে শূন্য কাপ দুটো নিয়ে গেল। তাকে বললাম আর দু-কাপ চা দিতে। সিগারেটের প্যাকেট বের করে নিজে ধরালাম, ভদ্রলোককেও দিলাম। সিগারেটে গোটা কয়েক লম্বা টান দিয়ে তিনি বললেন—আমার নাম কালীপ্রসাদ মিত্র। খুলনার বিখ্যাত

মিত্রদের কথা হয়ত শুনে থাকবেন, আমরা তাদেরই বংশধর। অবশ্য পঞ্চাশ-ষাট বছর হল খুলনার সঙ্গে আমাদের আর কোনো যোগাযোগ নেই। ঠাকুরদা কর্ম উপলক্ষ্যে এদিকে চলে আসেন—সেই থেকেই আর কখনো দেশে ফিরে যাওয়া হয়নি।

আবার চা এল। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে কালীপ্রসাদ বললেন—নদীয়া জেলার উত্তর প্রান্তে কিছু ভূসম্পত্তি কিনে ঠাকুরদা বসবাস শুরু করেন। ব্যবসা করতেন কোলকাতায়, মাঝে মাঝে গ্রামে এসে থাকতেন। তিনি ছাড়া বাড়ির লোকজন গ্রামেই থাকত। বন্দরে যে-সব জাহাজ এসে ভেড়ে, তাতে কাঁচা আনাজ যোগান দেবার ব্যবসা করতেন ঠাকুরদা। বিলক্ষণ দু'পয়সা করেছিলেন। কিন্তু বহু প্রতিদ্বন্দ্বী জোটায় তাঁর জীবদ্দশাতেই সে ব্যবসা নষ্ট হয়ে যায়। চেনাশুনো কাকে যেন ধরে বাবাকে এক সাহেবী ফার্মে চাকরিতে ঢুকিয়ে দেন। বাবা অবসর গ্রহণ করার পর সেই চাকরি আমি পেয়েছি।

—কতদিন বাবা রিটায়ার করেছেন?

—তা বছর কুড়ি তো বটেই। বাবার বয়েস এখন প্রায় আশি, কিন্তু বেশ ভাল স্বাস্থ্য—অসুখবিসুখ কিছুই নেই। কেবল চোখে একটু কম দেখেন।

বললাম—যা হোক, যা বলছিলেন বলে যান—

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে কালীপ্রসাদ বলতে শুরু করলেন—জ্ঞাতিদের শত্রুতায় ঠাকুরদাকে খুলনা ছেড়ে আসতে হয়েছিল। আসবার সময় দেশের সম্পত্তির বিশেষ কিছুই আনতে পারেননি। নগদ টাকা সামান্য যা ছিল তাই দিয়েই কোলকাতায় ব্যবসা শুরু করেন। কেবল প্রাণের চেয়েও প্রিয় একটি জিনিস বয়ে নিয়ে আসেন—

বললাম—কি জিনিস?

—একটি অষ্টধাতুর তৈরী কালীমূর্তি। আমাদের গৃহদেবী। চার-পাঁচ পুরুষ ধরে এই মূর্তি আমাদের পরিবারে পুজো পেয়ে আসছে। ঠাকুরদার বাবা—আমার প্রপিতামহ—তিনি ছিলেন তন্ত্রসাধক। আজীবন সাধনা করে তন্ত্রের বিভিন্ন শাখায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে শোনা যায়। তাঁর জীবনের শেষদিকে একবার গ্রহনক্ষত্রের কি এক বিচিত্র সংস্থান এবং অমাবস্যা একসঙ্গে পড়ে। তেমন যোগ নাকি একশো বছরেও একটা আসে না। সেই বিশেষ অমাবস্যার রাত্তিরে আমার প্রপিতামহ সারারাত জেগে তন্ত্রের এক গূঢ় প্রক্রিয়া সাধন করেন। শেষরাত্রে হোমকুণ্ডে পূর্ণাহুতি দিয়ে একটা গোল লোহার কৌটোয় পুজোর উপচার থেকে কি একটা জিনিস পুরে কৌটোটা প্রপিতামহীর হাতে দিয়ে বলেন—এই নাও, রাখো। এ যা করে দিয়ে গেলাম। আমাদের বংশে আর হঠাৎ কারো কোন বিপদ হবে না।

সত্যিই তার পর থেকে আজ পর্যন্ত এই কৌটোটা আমাদের সব আপদে-বিপদে রক্ষা করে এসেছে। কারো অসুখ-বিসুখ হলে এই মা-কালীর কৌটো তার মাথায় বুকে ঠেকিয়ে দিলে সে ভাল হয়ে ওঠে। ডাক্তার জবাব দিয়ে গিয়েছে এমন মরণাপন্ন রোগীকেও মা-কালীর কৌটোর প্রভাবে সেরে যেতে দেখেছি। সেও না হয় কাকতালীয়, কিন্তু কে একবার কৌটোর মহিমা নিয়ে উপহাস করায় বাবা সাপুড়েদের সদ্য ধরা বিষাক্ত গোখরো সাপের সামনে কৌটোটা ধরেন। ছোটবেলার ঘটনা হলেও আমার পরিষ্কার মনে আছে—সাপটা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করে গুটিয়ে এতটুকু হয়ে পড়ে রইল। জোঁকের মুখে নুন পড়লে যেমন হয়।

বললাম—এটা কিন্তু দ্রব্যগুণ হতে পারে।

কালীপ্রসাদ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—ঠিক। দ্রব্যগুণে সাপ বশীভূত হয়, কিন্তু লোহার কৌটো ফুটো করে দ্রব্যগুণ বের হবে কি করে বলতে পারেন?

যথার্থ কথা। বললাম—বলে যান।

—যাই হোক, বিগত তিনপুরুষ ধরে আমাদের পরিবারের ভালমন্দর ব্যাপারে আমরা মা-কালীর কৌটোর ওপর নির্ভর করে থাকি। তবু তো আমি আধুনিক লোক, বাস করি আধুনিক কোলকাতায়, আমার বিশ্বাস হয়ত অতটা দৃঢ় নয়। কিন্তু বাবা প্রাচীন মানুষ—ডাক্তার-উকিলের চেয়ে এই কৌটোর ওপর তাঁর নির্ভরতা বেশি।

মাস চারেক আগে কোলকাতার বাসায় আমার বড় ছেলের খুব অসুখ হয়। ছেলে মরণাপন্ন হয়ে পড়ে। সেই সময়েই আবার আমার অফিসে অডিট বসেছে, টাকাটার বিষয় নিয়ে হই-চই হচ্ছে—ভেতরে বাইরে আমি তখন খুব বিপন্ন। টাকার ব্যাপার বাবা জানতেন না, কিন্তু নাতির অসুখের খবর পেয়ে আমার এক খুড়তুতো ভাইয়ের হাত দিয়ে মা-কালীর কৌটো কোলকাতায় আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। কৌটোর মহিমাতেই কিনা জানি না, আমার ছেলেটি সেরে ওঠে—অফিসের গোলমালও মিটে যায়।

একটু থেমে কালীপ্রসাদ বললেন—কিছু মনে করবেন না, আমাকে আর একটা সিগারেট দেবেন?

সিগারেট ধরিয়ে ঘন ঘন টান দিয়ে প্রায় অর্ধেক করে আনবার পর কালীপ্রসাদ আবার বলতে শুরু করলেন—এতদিন মা-কালীর কৌটো কোলকাতায় আমার কাছেই ছিল। হঠাৎ দিন দুয়েক আগে বাবার এক জরুরি চিঠি পেলাম। সে এক অদ্ভুত চিঠি। ছেলে-বৌকে ক'দিন আগেই বাবার দেখাশুনা করবার জন্য দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম—এখন চিঠি পেয়ে আমিও চলেছি। কৌটোটাও নিয়ে যাচ্ছি সঙ্গে।

বললাম—চিঠিটা অদ্ভুত বলছেন কেন? কি আছে চিঠিতে?

উত্তরে কালীপ্রসাদ কাঁধের ঝোলা থেকে একটা খাম বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন—নিজেই পড়ে দেখুন।

বয়স্ক মানুষের ঈষৎ কম্পিত হস্তাক্ষরে লেখা চিঠি—

স্নেহের কালীপ্রসাদ,

আশা করি মঙ্গলময়ের কৃপায় কুশলেই আছ। এক বিচিত্র ঘটনার সম্মুখীন হইয়া তোমাকে এই পত্র দিতেছি। আজ কয়েকদিন হইল আমাদের বাটিতে নানা অলৌকিক এবং ভৌতিক উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। ইহার কারণ বা কি ভাবে নিরসন হইবে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, পত্র পাওয়া মাত্র তুমি ছুটি লইয়া দেশে আসিবে। গত চার-পাঁচ মাস যাবৎ মা-কালীর কৌটা তোমার কলিকাতায় বাসায় রহিয়াছে, আসিবার সময় উহা সঙ্গে আনিতে ভুলিবে না। সম্ভবত উহা না থাকাতেই এই উপদ্রব। এই পত্রকে তার মনে করিয়া অবিলম্বে রওনা হইবে।

আশীর্বাদ লইয়ো। ইতি—

আঃ

চণ্ডিকাপ্রসাদ মিত্র

পড়া শেষ করে চিঠিটা কালীপ্রসাদকে ফেরত দিলাম। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন—কি বুঝলেন?

—হ্যাঁ, রহস্যময় চিঠি বটে।

—কি অলৌকিক ব্যাপার কিছু আন্দাজ করতে পারেন?

বললাম—তা কি বলা যায়? সে তো কত কিছুই হতে পারে। আগে কখনো আপনাদের বাড়িতে এরকম কিছু হয়েছে?

কালীপ্রসাদ বললেন—কক্ষনো না।

বেলা পড়ে আসছে। আমার ট্রেন আসবার সময় হল। কালীপ্রসাদ দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কি যেন ভাবছেন। যাক্, আমার আর কি করবার আছে? পোঁটলাটা হাতে নিয়ে বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—আসি তাহলে। সাবধানে থাকবেন—

কালীপ্রসাদ কেমন যেন হতাশ আর ভীত গলায় বললেন—কিন্তু আমার কি হবে? জানেন, আমার বড্ড ভয় করছে।

—বিপদে ঈশ্বরকে স্মরণ করবেন। একমাত্র তিনিই সমস্ত ভয় থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারেন।

কালীপ্রসাদের মুখ দেখে মনে হল না যে আমার উপদেশে তিনি কিছুমাত্র ভরসা পেয়েছেন। অবশ্য সেজন্য তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। ঈশ্বর অদৃশ্য, আড়ম্বর করে তাঁর পুজো দেওয়া যায়। কিন্তু জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা একটা উচ্চস্তরের সাধনা। সে সাধনায় কালীপ্রসাদ এখনো সিদ্ধিলাভ করেননি। কিন্তু আমি আর কি করবো? বিদায়সূচক সামান্য হেসে পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলাম।

কয়েক পা হেঁটে আসতে-না-আসতেই কালীপ্রসাদ দৌড়ে এলেন।

—শুনছেন? একটু দাঁড়ান—

দাঁড়ালাম। কালীপ্রসাদ আমার কাছে পৌঁছে বললেন—আর একটা কাজ করা যেতে পারে।

—কি?

—আপনি কি তাতে রাজি হবেন?

বললাম—বলেই ফেলুন না। আমারও তো ট্রেন আসবার সময় হল—

গুরুত্বপূর্ণ কথা শুরু করার ভঙ্গিতে কেশে গলা পরিষ্কার করে কালীপ্রসাদ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনি আমার সঙ্গে আমাদের দেশের বাড়ি চলুন।

প্রস্তাবটা নিতান্ত আকস্মিক। অবাক হয়ে বললাম—আমি? আপনার বাড়িতে?

—হ্যাঁ। আপনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী। আপনি গেলে আমাদের অমঙ্গল কেটে যাবে। আপত্তি করবেন না—দয়া করে আমার সঙ্গে চলুন। বলুন, যাবেন?

লোকটা সত্যিই ভয় পেয়েছে। পাওয়াই স্বাভাবিক। একটু চিন্তা করলাম—বাড়িতে এমন কিছু বলে আসিনি যে তাড়াতাড়ি ফিরবো। আরো পাঁচ-সাত দিন দেরি হলে ক্ষতি নেই। দেখাই যাক্ না এর সঙ্গে গিয়ে।

বললাম—আচ্ছা চলুন—যাব।

কালীপ্রসাদের চোখের দৃষ্টি কৃতজ্ঞতায় ভারী হয়ে এল। আমার হাত দুটো ধরে তিনি বললেন—বাঁচলাম। সত্যি বিশ্বাস করিনি আপনি যেতে রাজি হবেন—

একটা ছোট্ট গ্রাম্য স্টেশনে নেমে পাক্কা তিন মাইল হেঁটে কালীপ্রসাদের বাড়ি। গ্রামে যখন ঢুকলাম, তখন রাত্রি প্রায় আটটা। পল্লীগ্রামের তুলনায় শেষ রাত। কৃষ্ণপক্ষের সুমুখ অন্ধকার রাত্তির, পঞ্চমীর রাঙা চাঁদ পুবদিগন্তের নিচে থেকে চালতে গাছের পেছন দিয়ে এক অলৌকিক গোলকের মত উঠে আসছে। গ্রামের প্রায় শেষের দিকে আম-জাম গাছে ঘেরা নির্জন বাড়ি, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। সদর দরজায় শেকল নাড়তে একটু বাদে দরজার ফাঁক দিয়ে লণ্ঠনের আলো দেখা গেল। কিন্তু কারো সাড়াশব্দ নেই, যেন ভেতরে যে দাঁড়িয়ে, সে সাহস করে দরজা খুলতে পারছে না।

কালীপ্রসাদ হেঁকে বললেন—অভিরাম নাকি? দরজা খোল্—

—কে, বাবু?

ব্যস্ত হয়ে যে লোকটি দরজা খুলে দিল তার বয়েস ষাট ছাড়িয়েছে। মাথায় কাঁচাপাকা চুল, পরনে খাটো ধুতি, খালি গা। তার সরল মুখে বিশ্বস্ততার ছাপ! কালীপ্রসাদ বললেন—ঠাকুরমশাই, এ হচ্ছে অভিরাম। পুরনো লোক, আমাকে কোলে করেছে ছোটবেলায়। দরজা খুলছিলি না কেন রে?

অভিরামের সরল মুখে ভয়ের স্পষ্ট চিহ্ন ফুটে উঠল। সে বলল—বাবু বাড়িতে যা কাণ্ড। দরজা হঠাৎ খুলতে সাহস হয় না—

—কেন, কি হচ্ছে বাড়িতে?

এর উত্তর অভিরামের দিতে হল না। আমাদের পেছনে আমবাগানে অন্ধকারের মধ্যে গাছের পাতার সরসর শব্দ উঠল, যেন গাছের একটা ডাল ধরে কেউ খুব জোরে ঝাঁকাচ্ছে। আমরা দুজন অবাক হয়ে সেদিকে ফিরে তাকাতেই অভিরাম বলল—ওই আবার শুরু হল, দেখছেন তো? নানান উপদ্রব—

সত্যিই, কিসে নাড়াচ্ছে অত মোটা ডালটাকে? মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে?

সাঁই করে কি একটা জিনিস গাছের ওপর থেকে আমাদের দিকে ছুটে এল। সহজাত সংস্কারের বশে কালীপ্রসাদ কোমর থেকে শরীর সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে ফেলেছিলেন, জিনিসটা ঠক্ করে পাঁচিলে লেগে মাটিতে পড়ে গেল। নইলে এই আঘাতেই কালীপ্রসাদের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটত।

লণ্ঠনের ম্লান ঘোলাটে আলোয় দেখলাম মাটিতে পড়ে আছে একটা সেরদশেক ওজনের পাথরের টুকরো।

বললাম—আপনারা দুজনে ভেতরে চলে যান। বাড়িতে টর্চ আছে?

—আজ্ঞে না। কেন?

—আমি একবার ওই গাছটার কাছে যাব। দাও হে অভিরাম, তোমার লণ্ঠনটাই দাও—

কালীপ্রসাদ বিচলিত হয়ে বললেন—না না, একা যাবেন না। দেখলেন তো—

—আমার কিছু হবে না। আপনি ভিতরে যান।

আমি জানতাম মধুসুন্দরী দেবীর কৃপায় কোনো নিম্নশ্রেণীর প্রেত আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। পাথরটা কালীপ্রসাদকে লক্ষ্য করেই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, আমাকে নয়।

লণ্ঠন হাতে বাগানের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম।

চারদিক নিঃঝুম, কোথাও গাছের একটি পাতা অবধি নড়ছে না। মনে হল সামনের মোটা গুঁড়িওয়ালা আমগাছটার ওপর থেকেই পাথরটা ছুটে গিয়েছিল। লণ্ঠনটা তুলে ধরে ওপরদিকে দেখবার চেষ্টা করলাম—কিছু দেখা গেল না।

কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটা আশ্চর্য অনুভূতি হল।

মনের একেবারে গভীরে হঠাৎ যেন কে একটা কল বিগড়ে দিল। আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসছে, সজ্ঞান চৈতন্য নিভে আসতে চাইছে তেলহীন প্রদীপের মত। আর আমি যেন এক পা-ও হাঁটতে পারব না। সমস্ত দেহে-মনে কি অস্বস্তি। সে ভাষায় বোঝানো যাবে না।

নিজের ক্ষমতার ওপর অগাধ বিশ্বাস নিয়ে একা এখানে এসেছিলাম। এবার আমার অকস্মাৎ ভয় করতে লাগল। মৃত্যুভয় নয়, যে কোন কারণেই হোক সে ভয় আমার কোনোদিনই নেই। কোন অজানা শক্তির মুখোমুখি হতে গেলে যে ভয় হয়—সেই রকম।

বিশ্রী একটা গন্ধে ভরে গিয়েছে চারদিক। প্রতি নিঃশ্বাসে গন্ধটা একেবারে ফুসফুসের ভেতর অবধি চলে গিয়ে যেন শরীরকে অপবিত্র করে দিচ্ছে। মনকে স্থির করে আমি মধুসুন্দরী দেবীর

ধ্যানমন্ত্র আবৃত্তি করতে লাগলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পরিবেশ থেকে দুর্গন্ধ দূর হয়ে গেল, মনের বল ফিরে পেলাম।

দরজা খোলাই ছিল, ভেতরে ঢুকে দেখি উঠোনের ওপারে বারান্দায় বাড়ির সবাই জড়ো হয়ে শঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে। আমি ঢুকতেই কালীপ্রসাদ বললেন—এই যে ঠাকুরমশাই। ওঃ, আমরা যা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম—

কালীপ্রসাদের কাঁধে হাতের ভর রেখে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, আন্দাজে বুঝলাম তিনিই চণ্ডিকাপ্রসাদ। ফর্সা মানুষ, দীর্ঘদেহী—দেখে বোঝা যায় এককালে খুবই সুপুরুষ ছিলেন। অগোছালো ধরনের ধুতি পরা।

বারান্দায় উঠে লণ্ঠনটা নামিয়ে রাখলাম। চণ্ডিকাপ্রসাদ এগিয়ে এসে বললেন—কালী আমাকে এতক্ষণ আপনার কথা বলছিল। আপনি যে কষ্ট করে এসেছেন—

বললাম—ও কথা বলবেন না, আপনি আমার বাবার বয়েসী—

চণ্ডিকাপ্রসাদ আমার হাত দুটো ধরে বললেন—তাতে কি? আপনি বর্ণশ্রেষ্ঠ, সাধক মানুষ। আপনি এসেছেন, এবার আমার বাড়ির অমঙ্গল কেটে যাবে।

কঠিন রোগীর বাড়ি বিলেতফেরত ডাক্তার গেলে বাড়ির লোকে যেমন বলে।

—আমার যা সাধ্য আমি করব মিত্রমশায়। নইলে আমি আসতাম না।

—আমাদের বাড়িতে কেন এমন হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছেন ঠাকুরমশাই?

—কিছু কিছু বুঝতে পেরেছি বইকি।

পিতা পুত্র দুজনেই বলে উঠলেন—কি? কি বুঝেছেন?

—এখন না। আগে আপনাদের কথা শুনে নিই। তারপর বলব।

চণ্ডিকাপ্রসাদ ব্যস্ত হয়ে বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ—চলুন, হাত-মুখ ধুয়ে বসে সব শুনবেন। ওরে—ও অভিরাম, ঠাকুরমশাইকে জল দে—

দক্ষিণ দিকে বড় বড় জানালাওয়ালা একটা ঘরে আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। একটু সুস্থ হয়ে সেখানে বসে চণ্ডিকাপ্রসাদের বিবরণ শুনলাম।

চণ্ডিকাপ্রসাদ বললেন—আমার জীবনে কখনো এমন অভিজ্ঞতা হয়নি ঠাকুর মশাই। দিন পনেরো-কুড়ি আগে এক রাত্তিরে শুরু। খেতে বসেছি সবে, রাত দশটা কি সাড়ে দশটা হবে—হঠাৎ বাইরে শোঁ শোঁ আওয়াজ করে একটা ঘূর্ণি হাওয়া মত উঠল। আমরা অবাক। ঝড়বৃষ্টির সময় নয়, আকাশে মেঘ নেই—এমন বাতাস উঠল কোত্থেকে? সেই বাতাসের দাপটেই রাজ্যের ধুলোবালি এসে আমার ভাতে পড়ল। মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। আমরা সেকেলে মানুষ, লক্ষণ-অলক্ষণ মানি—আর না খেয়ে উঠে পড়লাম। সারারাত ভাল ঘুম হল না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে রাত শেষ হয়ে গেল। সকালে উঠে গাড়ু হাতে বাগানে যাচ্ছি, দেখি সদর দরজার কাছে দুটো মরা পাখি পড়ে আছে। প্রথমে ভাবলাম গতরাত্রিতে যে বাতাস উঠেছিল, তারই ঝাপটায় বোধ হয় মারা পড়েছে। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখি তা নয়—কে যেন পাখি দুটোর ঘাড় মুচড়ে ঘুরিয়ে দিয়েছে। ঝড়ে তেমন হতে পারে না। বাড়ির সবাই দেখলে ভয় পাবে বলে হাতে করে মরা পাখি দুটোকে ঝুলিয়ে নিয়ে গিয়ে দূরে ফেলে দিলাম।

একটু দম নিয়ে চণ্ডিকাপ্রসাদ বললেন—এই শুরু হল। মাঝেমাঝেই উলটো-পালটা বাতাস দেয়, বাড়ির জিনিসপত্র হুড়মুড় করে পড়ে যায়, অদ্ভুত গোঙানির শব্দ শোনা যায় বাড়ির চারপাশে। এসব কিন্তু আমার বাড়ি এবং চারদিকের কিছুটা জায়গায় ঘটে। পরে গ্রামের মধ্যে জিজ্ঞেস করে দেখেছি, তারা ঝড়-বাতাস কিছুই টের পায়নি। কেন এমন হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি কি বলেন ঠাকুরমশাই?

চণ্ডিকাপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বললাম—আপনার বাড়িতে কোনো প্রেতের উপদ্রব হচ্ছে না। অন্তত যে অর্থে আমরা 'প্রেত' কথাটা ব্যবহার করি—সে অর্থে নয়।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন—তাহলে?

—ব্যাপারটা আপনাকে বোঝানো একটু কঠিন হবে। আমাদের এই মানুষের জগতের মতই আরো বহু জীবলোক আমাদের চারদিকে সর্বদাই বর্তমান। তারা ঠিক ভূত বা প্রেত নয়—তারাও এক ধরনের জীব। হয়ত মানুষের চেয়ে অন্য রকম। তাদের মন, চিন্তা, আচার-ব্যবহার সবই মানুষের থেকে আলাদা। আমাদের বিচারে হয়ত অমানুষিক। সে জগতের সমস্ত পদার্থই আমাদের কাছে অদৃশ্য ও অ-স্পর্শযোগ্য। বস্তুত একই স্থান অধিকার করেও এই দুই জগৎ একে অপরের কাছে অস্তিত্বহীন। কিন্তু মাঝে মাঝে প্রকৃতির কোনো আশ্চর্য খেয়ালে এই ছায়াজগৎ আমাদের জগৎকে স্পর্শ করে। এখানে ঠিক তাই হয়েছে। আমরা কোনোভাবে তাদের দুনিয়াতে ঢুকে পড়েছি। সেটা তাদের পছন্দ না হলে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। যা ঘটতে দেখছেন, তা হচ্ছে আমাদের জাগতিক বস্তুর ওপর তাদের মানসিক শক্তির ক্রিয়া। হয়ত তারা ভাবছে এই ভাবে ভয় দেখিয়ে তাদের জগৎ থেকে তারা আমাদের দূর করতে পারবে। বাড়িতে বেড়াল-কুকুর ঢুকলে আমরা যেমন ঠেঙিয়ে তাড়াই আর কি! পার্থক্য এই যে, এক্ষেত্রে এসবে কোনো কাজ হবে না। পরিবেশে আর একটা বড় রকমের ঝাঁকুনি লাগলে দুটো জগৎ আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তার আগে নয়।

আমি থামতে চণ্ডিকাপ্রসাদ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন—এসব আপনি জানলেন কি করে?

খুলে বললে বিস্তর কথা বলতে হয়। ইচ্ছে করছিল না। সংক্ষেপে বললাম—আমি জানতে পারি।

—ওই ঝাঁকুনি না কি বললেন, সেটা কি করে দেওয়া যায়?

—সেটা আপনাআপনিই হয়ে যেতে পারে, যেমন করে শুরু হয়েছিল। স্বস্ত্যয়ন বা স্থানশুদ্ধি গোছের একটা হোমও করতে পারি। কিন্তু আপনাকে সত্য কথাই বলে রাখা ভাল, এই ধরনের উপদ্রবের কথা আমি গুরুদেবের কাছে শুনেছি মাত্র—নিজে দেখছি এই প্রথম। এ বিষয়ে আমার বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতা নেই। আমার হোমে কতদূর কাজ হবে জানি না।

চণ্ডিকাপ্রসাদ কি ভাবলেন, তারপর বললেন—তা হোক, আপনি হোমের আয়োজন করুন। আর একটা কথা, যদি কিছু মনে না করেন—

—না, বলুন আপনি—

একটু ইতস্তত করে চণ্ডিকাপ্রসাদ বললেন—আপনার ওপরেই যদিও সব কিছু ছেড়ে দিচ্ছি, তবু আমার নিজস্ব বিশ্বাসের জন্য যদি কিছু ক্রিয়াকলাপ করি তাহলে আপত্তি হবে না তো?

হেসে বললাম—না, আমার কি আপত্তি? করুন আপনার যা ইচ্ছে—

চণ্ডিকাপ্রসাদ ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—কালী, কৌটোটা এনেছিস তো?

—হ্যাঁ, বাবা। এনে দেব?

—নিয়ে আয়।

কালীপ্রসাদ উঠে পাশের ঘর থেকে মা কালীর কৌটো এনে বাবার হাতে দিলেন। সেটা নিয়ে চণ্ডিকাপ্রসাদ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—এটার কথা শুনেছেন বোধ হয়?

বললাম—হ্যাঁ, কালীবাবু আসতে আসতে আমাকে বলেছেন।

—তাহলে তো আপনি সবই জানেন। এই কৌটোর ওপর আমাদের সবার—মনে একটা গভীর বিশ্বাস আছে আর কি। তবে বিশ্বাসটা অযৌক্তিক নয়, পরীক্ষিত সত্য। গ্রামে বসন্তের

মড়ক লেগে হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। এই কৌটো হাতে মা কালীর নাম করতে করতে বাড়ির চারদিক ঘুরে গণ্ডি কেটে দিয়েছিলাম। আদ্দেক গ্রাম সাফ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমাদের বাড়িতে অসুখ ঢোকেনি। আজও তাই করবো ভাবছি, কৌটো নিয়ে বাড়ির চারধারে গণ্ডি কেটে দেব। আসবেন আমার সঙ্গে? কালী, তুইও আয়—

বৃদ্ধকে একা ছাড়তে ইচ্ছে করল না। বললাম—চলুন, যাবো।

বাইরে যাবার জন্য সবে উঠে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ বাড়ির ভেতরে হুড়মুড় করে বিকট শব্দ হল—ধাতব কিছু পড়ে যাওয়ার আওয়াজ।

চণ্ডিকাপ্রসাদ বললেন—ওই শুরু হল আবার! চলুন দেখি।

ভেতরের বারান্দা থেকে আওয়াজ এসেছিল, সেখানে গিয়ে দেখলাম বাড়ির মেয়ে আর বাচ্চারা বারান্দার অপর প্রান্তে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দশ-বারোখানা ইঁট দিয়ে বেদীমত করে তার ওপরে একটা লোহার ড্রাম দাঁড় করানো ছিল—চাল রাখবার জন্য। সেটা উলটে পড়ে চাল ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। আমরা যখন পৌঁছলাম, তখনও ড্রামটা গড়াচ্ছে। আমাদের পায়ের কাছে এসে থেমে গেল।

আমার নাকে ভেসে এল সেই বিশ্রী গন্ধটা, বাইরের বাগানে যেটা পেয়েছিলাম।

চণ্ডিকাপ্রসাদ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁকে বললাম—যা করবার করে ফেলুন, আর রাত করবেন না।

সদর দরজা দিয়ে আমরা বাইরে এলাম। সঙ্গে কালীপ্রসাদ আর লণ্ঠন নিয়ে অভিরাম। চাঁদ ঢাকা পড়েছে গাছের পাতার আড়ালে। মাটিতে ম্লান জ্যোৎস্না আর ছায়ার খেলা। ঝোপেঝাড়ে জোনাকি জ্বলছে। বাতাস নেই কোনো দিকে, কেমন একটা থমথমে আবহাওয়া। কালীপ্রসাদের হাতে একটা মোটা লাঠি, যদিও বুঝতে পারলাম না অতিপ্রাকৃত কোন বিপদ হলে লাঠি দিয়ে কি করে ঠেকানো সম্ভব।

চণ্ডিকাপ্রসাদের হাতে মা-কালীর কৌটো, মুখে বিড়বিড় করে কি মন্ত্র পড়তে পড়তে চলেছেন। ক্রমে আমরা বাড়ির পেছনদিকে এসে হাজির হলাম। এদিকটায় জঙ্গল খুব বেশি, আসশেওড়া আর কুঁচকাঁটার ঝোপে ভর্তি। সাবধানে কাপড় বাঁচিয়ে চলেছি, আর কয়েক পা হাঁটলেই আমরা একটা বাঁক ফিরে বাড়ির পুব দিকের সীমানায় পৌঁছব, সেখানে ঝোপঝাড় অপেক্ষাকৃত কম। এমন সময় আমার মনের ভেতর সেই পরিচিত বিপদের ঘণ্টাটা বেজে উঠল—বুঝতে পারলাম এক্ষুনি একটা কিছু ঘটবে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডানদিকের একটা ঘন ঝোপের মধ্যে খড়খড় করে কি নড়ল, আমরা সবাই থমকে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকালাম। কালীপ্রসাদ দুই হাতে লাঠি বাগিয়ে ধরেছেন। অভিরাম লণ্ঠন মাটিতে নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে তাঁর হাত থেকে লাঠিটা নিল।

পরমুহূর্তেই ঝোপের মধ্যে থেকে কালো মত বেশ বড়সড় কুকুরের আকারের কি একটা জীব বেরিয়ে এসে ক্রুদ্ধ গর্জন করে চণ্ডিকাপ্রসাদের দিকে ছুটে গেল। কালীপ্রসাদ ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। আমি বলে উঠলাম—সামলে!

জন্তুটা চণ্ডিকাপ্রসাদের পায়ে দাঁত বসিয়ে দিতে গেল, অস্ফুট আর্তনাদ করে সরে গেলেন তিনি—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অভিরাম সবলে লাঠি দিয়ে আঘাত করল প্রাণীটার মাথায়। শূন্য মাটির হাঁড়ি ফেটে যাবার মত ফটাস্ করে শব্দ হল। নিঃশব্দে জন্তুটা কাত হয়ে পড়ে গেল একপাশে।

বলতে এত সময় লাগলেও ঘটতে লেগেছিল কয়েক মুহূর্ত মাত্র।

কালীপ্রসাদ লণ্ঠন নিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললেন—এঃ! এ তো শেয়াল। মরে গেছে।

মরা জ্যোৎস্না আর লণ্ঠনের আলো মিলিয়ে কেমন একটা আলো-আঁধারি মত হয়েছে। তবু ভাল করে তাকিয়ে মনে হল শেয়ালই বটে।

অভিরাম বলল—অদ্ভুত ব্যাপার বাবু! শেয়ালে কখনো তাড়া করে কামড়াতে আসে শুনিনি!

কালীপ্রসাদ বললেন—ঠিক কথা। শেয়াল ভীতু জন্তু, মানুষ দেখলে পালিয়ে যায়। এটা তাড়া করে এল কেন?

চণ্ডিকাপ্রসাদ বোধ হয় নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললেন—পাগলা শেয়াল হবে। নইলে কি আর—যা হোক চল্—অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়।

এদিনের গৃহ প্রদক্ষিণের একটা ফল কিন্তু হাতে হাতে দেখতে পেলাম। সে রাত্তির থেকে বাড়ির ভেতরের উপদ্রব বন্ধ হয়ে গেল। সারারাত সজাগ হয়ে শুয়ে রইলাম, কাশির শব্দ শুনে টের পাচ্ছিলাম চণ্ডিকাপ্রসাদও জেগে। কিন্তু সে রাতে আর কোনো উপদ্রব হল না।

পরের দিন সমস্ত ব্যাপারটা অদ্ভুতভাবে মিটে গেল। যে কথা বলবার জন্য এ গল্পের অবতারণা। আমাকে আর যজ্ঞ করতে হয়নি। এ ঘটনায় আমার ভূমিকা ছিল শুধুই দ্রষ্টার।

মরা শেয়ালটার পা ধরে টেনে অভিরাম দূরে আমবাগানের ওপাশে একটা পতিত জমিতে ফেলে দিয়ে এসেছিল। রাত্তিরেও কোন উপদ্রব হয়নি। সকালে উঠে দেখলাম বেশ প্রসন্ন সূর্যের আলোয় চারদিক ভরে আছে। চণ্ডিকাপ্রসাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করে দিনটা কেটে গেল। ভদ্রলোক সেকেলে মানুষ হলেও হিন্দু শাস্ত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে বেশ পড়াশুনো করেছেন।

দুপুরে সুন্দর দিবানিদ্রা দিয়ে যখন উঠলাম, তখন বিকেলের রোদ মিলিয়ে গিয়ে ছায়া গাঢ় হয়ে এসেছে। বাইরের তক্তাপোশে বসে চণ্ডিকাপ্রসাদ হুঁকোয় টান দিচ্ছিলেন, সেখানে গিয়ে বসলাম। গাড়ু হাতে কালীপ্রসাদ উঠোন পেরিয়ে বাড়ির বাইরে বাগানের দিকে চলে গেলেন। চণ্ডিকাপ্রসাদ ডেকে বললেন—কালী, চট্ করে সেরে আয়। একসঙ্গে বসে ঠাকুরমশায়ের যজ্ঞের ফর্দটা করে ফেলা দরকার—

এই আসছি—বলে কালীপ্রসাদ বেরিয়ে গেলেন।

সকালের আলোচনার খেই ধরে চণ্ডিকাপ্রসাদ বললেন—হ্যাঁ, সকালে যে কথা হচ্ছিল—নিষ্ঠা এবং সদ্‌গুরুর প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু মন্ত্রোচ্চারণের যথার্থতার ওপরেই অনুষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে। মন্ত্রের প্রত্যেক অক্ষরের একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন, সঠিক উচ্চারণ না হলে তাঁরা কুপিত হন।—

বাড়ির ভেতর থেকে গরম ভাজা পরোটা আর আলুভাজা এল। খেতে খেতে গল্প চলল। যখন সন্ধ্যে উতরে অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে উঠেছে, সে সময় অভিরাম এসে জিজ্ঞাসা করল—কত্তামশাই, ছোটবাবু কোথায়? মাঠাকরুণ ডাকছেন—

চণ্ডিকাপ্রসাদ বললেন—কে, কালী তো—তাই তো, কালী ফেরেনি? সে কি!

হঠাৎ আমারও খেয়াল হল, কালীপ্রসাদ বহুক্ষণ হল বাগানে গিয়েছেন বটে। ছোট-বড় কোনো প্রাকৃতিক আহ্বানে সাড়া দিতেই এতক্ষণ লাগতে পারে না।

দু'এক মুহূর্তের ভেতর ব্যাপারটা সম্যক উপলব্ধি করে আমরা লাফিয়ে উঠলাম। চণ্ডিকাপ্রসাদ কেমন অবরুদ্ধ গলায় বললেন—অভিরাম, আলো আর লাঠি নিয়ে আয়, তাড়াতাড়ি—

বাড়ি থেকে বেরুচ্ছি, চণ্ডিকাপ্রসাদ বললেন—ঐ যাঃ, দাঁড়ান—এক্ষুনি আসছি।

তিনি আবার বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলেন। মিনিটখানেক বাদে বেরিয়ে এলে বুঝলাম আমার আন্দাজ ঠিকই ছিল—তাঁর হাতে মা-কালীর কৌটো। এইটে আনতেই তিনি ফিরে গিয়েছিলেন।

আমবাগানে পা দিয়েই বুঝতে পারলাম এ বাড়ির ওপর থেকে দুর্ভাগ্যের কালো ছায়া একেবারে মিলিয়ে যায়নি। সমস্ত পরিবেশে ছেয়ে আছে একটা বিকট গন্ধ, গতকাল এসে যেটা পেয়েছিলাম। বিকেলবেলা মনের মধ্যে যে প্রসন্নতা জেগে উঠেছিল, তা কোথায় বিলীন হয়ে গেল।

লণ্ঠন হাতে অভিরাম আগে আগে চলেছে, সে ডাকছে—ছোটবাবু গো-ও-ও—

চণ্ডিকাপ্রসাদ ডাকছেন—কালী-ই-ই—

আমার বুক গুরগুর করছে। আজ সন্ধ্যেটা ভাল নয়—ভাল নয়।

একটা ঝোপের পেছনে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা কালীপ্রসাদকে অভিরামই আগে দেখতে পেল! 'ছোটবাবু!' বলে চিৎকার করে উঠে সে ছুটে গিয়ে কালীপ্রসাদের দেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কেঁদে উঠল।

পরমুহূর্তেই আমরাও পৌঁছে গেলাম। আমি শক্ত করে চণ্ডিকাপ্রসাদের হাত ধরে রেখেছি, বুঝতে পারছি তাঁর সমস্ত শরীর ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। এ অবস্থায় সেটাই স্বাভাবিক। তাঁর হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম—দাঁড়ান একটু, এত বিচলিত হবেন না—

নিচু হয়ে কালীপ্রসাদের নাড়ি দেখলাম, বুকে হাত দিয়ে স্পন্দন বোঝার চেষ্টা করলাম। নাড়ি ঠিক আছে, তবে মৃদু। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললাম—ভয় নেই, ইনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন। অভিরাম, চল—ধরাধরি করে এঁকে বাড়ি নিয়ে যাই।

আমরা অজ্ঞান কালীপ্রসাদের দেহ তোলবার জন্য নিচু হয়েছি, হঠাৎ ঠিক গতকালের মত ঝোপের মধ্যে খস্‌ খস্‌ শব্দ হল। কি যেন আমাদের দিকে আসছে। কিন্তু তার গতি কালকের চেয়ে ধীর।

আমাদের ভয়চকিত দৃষ্টির সামনে ঝোপ ঠেলে বেরিয়ে এল একটা শেয়াল।

গতকাল যে শেয়ালটাকে অভিরাম মেরেছিল!

প্রাণীটার মাথা দু'ফাঁক হয়ে আছে, ঘিলু বেরিয়ে গড়াচ্ছে ডান চোখের ওপর দিয়ে। অন্য চোখে মৃত, নিষ্প্রাণ দৃষ্টি। প্রকট দংষ্ট্রার ফাঁক দিয়ে জিভের আধখানা বেরিয়ে রয়েছে। সে এক অনৈসর্গিক, বীভৎস দৃশ্য!

ধীর, কিন্তু অমোঘ গতিতে শেয়ালটা আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কোনোদিকে কোনো শব্দ নেই, গাছের পাতায় বাতাসের সামান্যতম মর্মর নেই—সমস্ত জগৎটাই অন্ধকারের চাদরে ঢাকা পড়ে আড়াল হয়ে গিয়েছে চেতনার থেকে। থাকবার মধ্যে কেবল সামনে ওই সচল মৃতদেহটা।

হঠাৎ অনুভব করলাম আমার পাশে চণ্ডিকাপ্রসাদের নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠেছে। তাকিয়ে দেখলাম তাঁর বার্ধক্যে স্তিমিত চোখে কি এক আগুনে জ্বলছে। মুখের ভঙ্গিতে ভয় নেই, আছে প্রবল ক্রোধ। ত্বরিতে মা কালীর কৌটো হাতে নিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে কৌটোটা বাড়িয়ে ধরে বললেন—থাম্‌!

সচল মৃতদেহ স্থাণু হয়ে গেল।

আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কৌটোসুদ্ধ হাত মাথার ওপর তুলে চিৎকার করে চণ্ডিকাপ্রসাদ বললেন—মা কালীর নামে বলছি, আমার বাড়ির সব বিপদ দূর হয়ে যাক্‌' যদি সদ্ধর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকি, যদি সৎ কায়স্থের সন্তান হই, যদি জীবনে কোনো পুণ্যসঞ্চয় করে থাকি—তার সবটুকুর জোরে আদেশ করছি, যে অপদেবতারা আমার বাড়িতে ভর করেছে তারা এই মুহূর্তে দূর হয়ে যাক্‌। আমার হাতে পবিত্র নির্মাল্যের এই কৌটো রয়েছে। দেখি তাদের কত শক্তি, সাধ্য থাকে আমার ক্ষতি করো—

মাথার ওপরে কৌটো তুলে ধরে তিনি বিভিন্ন দিকে ঘোরাতে লাগলেন।

শেয়ালের মৃতদেহটা আস্তে আস্তে আবার কাত হয়ে পড়ে গেল। এবারে সেটা সত্যিই মরেছে।

তার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল।

এতক্ষণ বন ছিল, নিষ্পন্দ, নীরব। হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এল ঝড়ের মত বাতাস। সারা বাগান, ঝোপঝাড় মথিত করে কিছুক্ষণ সে বাতাস বইল। অভিরাম বলে উঠল—দেখুন ঠাকুরমশায়, দেখুন!

তার নির্দেশিত দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেখানে গাছপালা একটু কম, পাতার ফাঁক দিয়ে রাত্রির আকাশ দেখা যায়। চাঁদ উঠতে আজ দেরি আছে, কিন্তু অস্পষ্ট তারার আলোয় অন্ধকার অনেকটা তরল। বাতাসের ঘূর্ণির সঙ্গে পাক খেয়ে একটা জমাট অন্ধকারের স্তম্ভ আকাশে অনেকখানি ঠেলে উঠেছে। অন্ধকারের উপাদানে তৈরি অমানুষী এক আকৃতি—পরিচিত কিছুর সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। সমস্ত পরিবেশ থেকে, চণ্ডিকাপ্রসাদের বাড়ির ওপর থেকে, আমবাগান থেকে বাতাসের সঙ্গে উঠে যাচ্ছে গুঁড়ো গুঁড়ো অন্ধকার। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকারের কালো পিণ্ডটা অনেক ওপরে উঠে গিয়ে আবছা হয়ে মিলিয়ে গেল।

তারপরেই বনের বাইরে থেকে ভেসে এল একঝলক বাতাস। বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবার মত সহজ, স্বাভাবিক, মুক্ত বাতাস। কিট্‌কিট্ করে নিশাচর কীটপতঙ্গেরা ডাকতে শুরু করল। আমরা কেউ কথা না বললেও বুঝতে পারলাম অমঙ্গলের ছায়াটা একেবারে সরে গিয়েছে। কালীপ্রসাদকেও বয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজন হল না, এর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। বাগান থেকে ফেরবার মুখে শেয়ালটা এসে ওঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল। ভদ্রলোক স্নায়ুর ওপর এত চাপ সহ্য করতে পারেননি।

ফেরবার সময় চণ্ডিকাপ্রসাদ বললেন—দেখলেন আমার মা কালীর কৌটোর গুণ? সব ব্যাটাকে তাড়িয়ে দিলাম—

বললাম—তা বটে।

তারানাথ থামল। কিশোরী বলল—কিন্তু এ তো মন্ত্রশক্তি বা দ্রব্যগুণের গল্প। এতে বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্ব কি প্রমাণিত হয়?

তারানাথ বলল—হয়। পরের দিন নির্জনে বসে কালীপ্রসাদের সঙ্গে গল্প করছিলাম। কালীপ্রসাদ বললেন—বাবা বিশ্বাসের জোরে আমাদের আপদ দূর করে দিলেন।

বললাম—কেন, মা কালীর কৌটোর গুণও আছে বলতে হবে—

ম্লান হেসে কালীপ্রসাদ বললেন—দাঁড়ান, একটা জিনিস দেখাই আপনাকে।

একটু পরে হাতে করে মা কালীর কৌটোটা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ভদ্রলোক এবং আমার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে ঢাকনাটা খুলে ফেললেন।

বাধা দিয়ে বলে উঠলাম—ও কি করছেন? মন্ত্রপূত নির্মাল্য খুলতে নেই, ওতে গুণ নষ্ট হয়ে যায়।

কিছু না বলে কালীপ্রসাদ বিছানার ওপরে কৌটোটা উপুড় করে ধরলেন। ভিতরে যা ছিল চাদরের ওপর ছড়িয়ে পড়ল।

ভেতর থেকে বেরুল কতকগুলো গোল গোল করে পাকানো খবরের কাগজের গুলি। আর কিচ্ছু নেই।

অবাক হয়ে বললাম—এ কি! নির্মাল্য কই?

কালীপ্রসাদ বললেন—নেই।

—তার মানে?

কালীপ্রসাদ মাথা নিচু করে বললেন—মানে আসল কৌটো অনেক দিন আগে হারিয়ে গিয়েছে। এটা নকল। ছেলের অসুখের সময় কোলকাতায় নিয়ে যাবার পথেই কোথাও পড়ে যায়। বাবা শুনলে অনর্থ করবেন এই ভয়ে শিশিবোতলওয়ালার কাছ থেকে দু'পয়সা দিয়ে এই কৌটোটা কিনি। বাবা আজকাল চোখে কম দেখেন, তাঁকে ঠকানো সহজ। কাজেই বুঝতে পারছেন, যা হয়েছে তা বাবার বিশ্বাসের জোরেই হয়েছে—

—আর কেউ জানে এ কথা?

—শুধু আপনার বৌমা, আমার স্ত্রী। অন্য কেউ না। বাবার বয়েস হয়েছে, আর ক'দিন বা বাঁচবেন? খামোকা কেন তাঁকে দুঃখ দিই?

তারানাথ থামল। ঘরের মধ্যে স্তব্ধতা। বাইরেও বৃষ্টি ধরে এসেছে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে কিশোরী বলল—গল্পটা বেশ। গল্প বানানোয় আপনার একটা স্বাভাবিক দক্ষতা আছে—

সিগারেট ধরাতে গিয়ে তারানাথ জ্বলন্ত চোখে কিশোরীর দিকে তাকাল।

আমি ব্যাকুল হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কিশোরীর হাত ধরে টানলাম—ওঠো হে, আবার বৃষ্টি এলে বাড়ি ফেরা মুশকিল হয়ে পড়বে।

তারানাথের সেদিন কোন কাজ ছিল না। সন্ধ্যের দিকে এমনিতেই তার বৈঠকখানা ফাঁকা থাকে, আজ যেন বড্ড ফাঁকা। তারানাথ বসে একা হুঁকো খাচ্ছে। আমাদের দেখে খুশী হয়ে বলে উঠল—আরে এস এস, তোমাদের কথাই ভাবছিলাম।

কিশোরী বলল—হঠাৎ আমাদের কথা ভাবছিলেন যে বড়?

—হঠাৎ নয়। আজ সারাদিন কোন কাজ নেই, বুঝলে? অন্য অন্য দিনে কোষ্ঠী করাতে না হোক, অন্তত হাত দেখাতে দু'চারজন এসেই যায়। দিনের খরচাটা যা হোক করে—বুঝলে না? আজ একটা পয়সা আমদানী নেই। হাত-পা কোলে করে বসে থেকে বিরক্তি ধরে যাচ্ছিল। তোমরা আসায় বাঁচলুম।

বললাম—কিন্তু আমরা তো খদ্দের নই।

তারানাথ বলল—না-ই বা হলে। পয়সা না পাই, আড্ডা দিয়ে তো বাঁচব। তোমাদের তো বলেইছি, পয়সা কম উপার্জন করিনি জীবনে। বৈষয়িক লোক হলে অনেক জমিয়ে ফেলতে পারতাম। পয়সার মায়া নেই আমার। দিন চলে গেলেই খুশি। যাবার সময় ক'টা পয়সা গাঁটে বেঁধে নিয়ে যেতে পারব মনে কর?

চারি পেয়ালায় চা নিয়ে এল। তারানাথ পাকা মজলিশী লোক। চা খেতে খেতে সে গল্প জমিয়ে তুলল। কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে কথা হবার পর কিশোরী বলল—ভালো কথা, আজকের কাগজ দেখেছেন? তরুবালা হত্যাকাণ্ডের মীমাংসা হয়ে গিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী ফাঁসির হুকুমও হয়ে গিয়েছে দেখলাম।

খবরটা দেখেছি বটে। কিছুদিন আগে কোলকাতার এক কুখ্যাত পাড়ায় তরুবালা নামে একটি পতিতা মেয়ে খুন হয়। খুনী কোন সূত্র রেখে যায়নি। তাই নিয়ে ক'দিন কাগজে খুব হৈ চৈ চলেছিল। আজ কাগজে বেরিয়েছে খুনী ধরা পড়ার খবর। অপর একটি পতিতা মেয়ে বাথরুমে লুকিয়ে থেকে সমস্ত খুনের দৃশ্যটা দেখেছিল। এতদিন প্রাণের ভয়ে কিছু বলেনি। কিন্তু পুলিশী

জেরার চাপে আর বিবেকের তাড়নায় সে শেষপর্যন্ত সব স্বীকার করেছে। বস্তুত তার বিবৃতিকে নির্ভর করেই অপরাধীর শাস্তি হয়ে গেল।

আমি বললাম—সত্যি, মেয়েটার দোষ নেই। প্রাণের ভয় সবারই আছে। তাছাড়া চোখের ওপর একটা খুন দেখলে মনের অবস্থা কেমন হয় কে জানে। একজন মানুষকে পাঁচহাঁতের মধ্যে মেরে ফেলা হচ্ছে—উঃ! ভাবা যায় না।

কিশোরী বলল—সত্যি বলেছ, খুনের প্রত্যক্ষদর্শীর মনের অবস্থা কি হয় ভারি জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কে বলতে পারবে?

তারানাথ বলল—আমি পারি।

আমি আর কিশোরী তারানাথের কথায় অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম। বলে কি তারানাথ? ঠাট্টা করছে নাকি? কিন্তু সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করবার লোক তো তারানাথ নয়। 'তাহলে'?

কিশোরী আমার চেয়ে আগে সমস্ত পরিস্থিতিকে সামলে নিতে পারে। সে জিজ্ঞাসা করল—কি করে বলবেন?

তারানাথ গম্ভীর গলায় বলল—কারণ আমি চোখের সামনে একটা খুন হতে দেখেছি।

তারানাথের কাছে অনেক অদ্ভুত গল্প শুনেছি, কিন্তু এ ব্যাপারে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। এবার কিশোরীও কোনো কথা বলল না। তারানাথ আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল—খুন হয়েছিল বটে, কিন্তু সে খুনের জন্য কারো ফাঁসি হয়নি। আমি ছাড়া আরো কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিল। কেস আদালতে ওঠে, কিন্তু পরে যে খুন করেছিল, সে ছাড়া পেয়ে যায়। শুনবে গল্পটা? তাহলে বলি।

শোনবার জন্য আমাদের অনুরোধ করার সামান্যই প্রয়োজন ছিল। তারানাথ এক কলকে তামাক সেজে বলতে শুরু করল।

বছর দশেক আগের কথা। তখন আমার কাছে অমরনাথ ভট্টাচার্য বলে এক ভদ্রলোক প্রায়ই আসতেন। ব্যক্তিগত একটা বিপর্যয়ে পড়ে আমার কাছে হাত দেখাতে এসেছিলেন। আমার কথামতো রত্ন ধারণ করে সে বিপদ কেটে যায়। তারপর থেকে কৃতজ্ঞতাবশতই হোক আর আমাকে ভাল লেগে যাওয়ার জন্যই হোক, সপ্তাহে অন্তত তিনদিন উনি আড্ডা দিতে আসতেন। অতি অমায়িক মানুষ। আড্ডাবাজ এবং ভালো গল্প বলিয়েও বটে। আমাদের আলাপ খুব জমে উঠেছিল।

একদিন অমরবাবু সন্ধ্যের দিকে এসে হাজির হলেন। দেখলাম উনি কিছু অন্যমনস্ক, কোনো চিন্তায় মগ্ন থাকলে যেমন হয়। চা খাচ্ছেন, হ্যাঁ-হুঁ করে আমার কথার উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু আড্ডা যেন ঠিক জমছে না।

একসময় বলে ফেললাম—আপনার কি হয়েছে বলুন তো? কিছু ভাবছেন?

অমর ভট্টাচার্য একমুহূর্ত কি ভাবলেন, তারপর বললেন—ভেবেছিলাম বলব না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বললে আপনাকেই বলা উচিত। অন্যে হেসে উড়িয়ে দেবে কিন্তু আপনি হয়তো বুঝতে পারবেন।

বললাম—খুলে বলুন।

—আমার এক বাল্যবন্ধু আছেন। তাঁর নাম বিজয় চাটুজ্জে। অনেকদিন বিয়ে হয়েছে বটে, কিন্তু একটি বই সন্তান হয়নি। মেয়ে সন্তান—নাম সুবালা। এখন তার বয়েস তেরো। মেয়েটি দেখতে খুব সুন্দরী। পড়াশুনাতেও ভালো। বিজয় প্রাচীনপন্থী গোঁড়া লোক নয়। মেয়েকে সে

লেখাপড়া শিখিয়ে উপযুক্ত করে বিয়ে দিতে চায়। সবই তো ভাল চলছিল, কিন্তু হঠাৎ এক বিপদ উপস্থিত হয়েছে।

—কি হয়েছে?

—সুবালা আজকাল কেমন কেমন সব কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে। যার কোনো মানে হয় না এমন সব অসংলগ্ন কথা। বিজয় খুব ভয় পেয়ে গিয়েছে, সে সন্দেহ করছে সুবালার বোধহয় মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

—কি ধরনের অসংলগ্ন কথা? অশ্লীল কিছু?

—আদৌ না। সবার সঙ্গে বসে আলাপ করতে করতে থেমে গিয়ে কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। তারপর একটা ঘুমঘুম ভাবের মধ্যে নানা অদ্ভুত কথা বলছে।

—সে কথাগুলো কি?

অমর ভট্টাচার্য বললেন—সে ঠিক বলে বোঝানো যাবে না। আপনি চলুন না একবার। আপনি তো নানা রকম বিষয় জানেন। হয়তো আপনাকে দিয়ে বিজয়ের একটা উপকার হয়ে যাবে। সুবালাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার আগে আপনি একবার চলুন।

বললাম—বিজয়বাবু কোথায় থাকেন?

—এই কাছেই, অবিনাশ দত্ত লেনে। কাল যাবেন?

আমার কৌতূহল জেগে উঠেছিল, বললাম—বেশ তো, বলে রাখবেন আপনার বন্ধুকে। কাল সন্ধ্যার দিকে যাওয়া যাবে এখন।

—ঠিক আছে আমি এসে আপনাকে নিয়ে যাব। তৈরি থাকবেন।

পরের দিন গেলাম বিজয় চাটুজ্যের বাড়ি। সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, তবে সচ্ছল অবস্থা। ভদ্রলোক বেশ সুপুরুষ। চল্লিশ পেরিয়েও চুলে পাক ধরেনি বা কপালে একটি রেখাও পড়েনি। আমাকে আপ্যায়ন করে বসিয়ে বললেন—বড় বিপদে পড়েছি ঠাকুরমশায়। আমার এই একটি মাত্র সন্তান। ওর যদি কিছু হয় তাহলে আমাদের আর কোনো সান্ত্বনা থাকবে না। শুনেছেন তো সব অমরের কাছে?

বললাম—মেয়েটিকে একবার ডাকুন না, দেখি।

বিজয়বাবু নিজে গিয়ে হাত ধরে সুবালাকে নিয়ে এলেন।

অমর ভট্টাচার্য্য ঠিকই বলেছিলেন। মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী। বাড়ন্ত গড়নের জন্য সত্যিকার বয়সের চেয়ে অনেক বড় দেখায়। সুবালা ঘরে ঢুকতেই আমি চমকে সোজা হয়ে বসলাম। মেয়েটি সাধারণ মেয়ে নয়। আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রে কিছু কিছু অতিলৌকিক দেহলক্ষণের বর্ণনা আছে। সুবালার শরীরে সেগুলি বর্তমান।

আমার চমকে ওঠা বিজয়বাবু লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু মেয়ের সামনে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। আমি আদর করে কাছে বসিয়ে সুবালার সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। বেশ স্বাভাবিক মেয়ে, কোন দিক দিয়ে কোন ব্যতিক্রম নেই। কিছু পরে বিজয়বাবুকে বললাম—যান, ওকে ভিতরে দিয়ে আসুন।

বিজয় চাটুজ্জে বললেন, যাও তো মা, ভিতরে গিয়ে মাকে বলো খাবার পাঠাতে।

সুবালা চলে যেতে আমিই প্রথমে বললাম—ভয় নেই বিজয়বাবু, আপনার মেয়ের কোন অসুখ করেনি। এটা পাগলামির পূর্বাভাস নয়।

—তবে?

—আপনার মেয়ের শরীরে কয়েকটা দিব্যলক্ষণ রয়েছে। কি লক্ষণ তা আমি বলব না। অন্যের চেয়ে আপনার মেয়ে কিছু আলাদা হবেই। এ আপনি রোধ করতে পারবেন না।

বিজয়বাবু অপ্রসন্নমুখে চুপ করে রইলেন। বুঝলাম আমার ব্যাখ্যা তাঁর ঠিক মনঃপূত হয়নি। তা আর আমি কি করতে পারি? মেয়ের তো কোন অসুখ নেই বা অপদেবতা ভর করেনি যে আমি মাদুলি দিয়ে কি যজ্ঞ করে সারাবার চেষ্টা করব।

এমন সময় ভেতরবাড়িতে একটা হৈ চৈ-এর শব্দ শোনা গেল। কয়েকজন মহিলার সম্মিলিত কণ্ঠস্বর। বিজয়বাবু তাড়াতাড়ি করে উঠতে উঠতে বললেন—ওই সুবালা বোধহয় আবার অমন করছে। আসুন ঠাকুরমশায় আমার সঙ্গে, দেখে যান।

সামান্য ইতস্তত করে তাঁর পেছন পেছন বাড়ির ভেতর ঢুকলাম। লম্বা বারান্দা পেরিয়ে একটা ঘরের সামনে দাঁড়ালেন বিজয়বাবু। সে ঘর থেকেই গোলমাল ভেসে আসছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিলাম।

দেয়ালে হেলান দিয়ে মাটিতে বসে আছে সুবালা। চোখ দুটো অর্ধেক বোঁজা। সেই অবস্থাতেই বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। আমাকে দেখে ঘরের মহিলারা ঘোমটা টেনে দিলেন।

বিজয়বাবুকে বললাম—ওঁদের একটু সরে দাঁড়াতে বলুন তো। আমি একবার আপনার মেয়ের কাছে যাব।

বিজয়বাবুকে কিছু বলতে হল না। আমার কথা শুনে মেয়েরা নিজে থেকেই ঘরের এক কোণে সরে গেলেন। আমি গিয়ে হাঁটু গেড়ে সুবালার পাশে বসে ডাকলাম—সুবালা! শুনতে পেল কিনা বোঝা গেল না, অন্তত বাহিরে তার কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেল না। মনে মনে ইষ্ট স্মরণ করে সুবালার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেই তার কথা বন্ধ হয়ে গেল। যেন সে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ছে। জানো তো, মধুসুন্দরী দেবী আমাকে ওই ধরনের কয়েকটি ক্ষমতা দান করেছিলেন। সুবালাও শান্ত হয়ে এল, গভীর নিঃশ্বাস পড়তে লাগল।

আমি মৃদুস্বরে বললাম—বলো মা, কি বলছিলে বলো।

সুবালা টেনে টেনে বলল—খোকা পড়ে যাচ্ছে যে! আমিও পড়ে যাচ্ছি। পেছন থেকে ঠেলে দিল—আমার কোলে খোকা—

বললাম—খোকা কে?

—আমার খোকা।

—তোমার ছেলে?

উত্তর নেই।

—মাথায় কি কষ্ট। উঃ, পাথর এসে লাগল মাথায়।

—কে ধাক্কা দিল তোমাকে?

আর উত্তর নেই। এবারে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটি।

বিজয়বাবুকে বললাম—ওকে বিছানায় শুইয়ে দিন। ঘুমিয়ে পড়েছে। আর আপনি আমার সঙ্গে আসুন, কথা আছে।

বাইরের ঘরে এসে বললাম—কিছু বুঝতে পারলেন? না, মানে—ঠিক—

—আপনার মেয়ে জাতিস্মর।

—জাতিস্মর!

—হ্যাঁ, সুবালা সম্ভবত আগের জন্মের কথা মনে করতে পারে। যেসব কথাকে আপনারা অসংলগ্ন বলে মনে করছেন, তা আসলে ওর আগের জন্মে ঘটে যাওয়া ঘটনা। এই কারণেই ওর শরীরে নানা দিব্যলক্ষণ রয়েছে। জাতিস্মর হওয়া আত্মার খুব উঁচু অবস্থার পরিচয়।

বিজয়বাবু বললেন—তাহলে এখন আমাদের কি করা কর্তব্য?

—কিছুই নয়। এ ভাব আপনিই কেটে যাবে। আমি আরও একটি জাতিস্মর মেয়েকে দেখেছিলাম, বয়েস বাড়তে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে জন্মান্তরের স্মৃতি কমে আসতে থাকে। সুবালার কতদিন এরকম হয়েছে?

বিজয়বাবু একটু ভেবে বললেন—তা প্রায় বছরখানেক হবে।

—তাহলে তো অনেক বেশি বয়েসে শুরু হয়েছে বলতে হবে। জন্মান্তরের স্মৃতি সাধারণত পাঁচ-ছয় বছর বয়েসে জেগে উঠে এই বয়েসে মিলিয়ে আসতে থাকে। যাক্, কিছু না করে শুধু দেখে যান। সুবালা আপনিই সেরে যাবে।

সেদিন ফিরে চলে এলাম। তারপর বছর কয়েক ধরে মাঝে মাঝে বিজয় চাটুজ্জের বাড়ি গিয়েছি, কখনো বা উনি আর অমরনাথ আমার কাছে এসে সুবালার খবর দিয়েছেন। মোটের ওপর বলতে গেলে—দু'বছরে আমরা সুবালার গত জন্মে কি ঘটেছিল সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারলাম। বিভিন্ন সময়ে আচ্ছন্ন অবস্থায় সুবালা যা বলেছিল তার ওপরে নির্ভর করেই আমরা কিছু জোড়াতালি দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু আমাদের আন্দাজ যদি সত্য হয়ে থাকে—হয়ে থাকে কেন, নিশ্চয়ই সত্য—কারণ পরে যা ঘটেছিল তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়—তাহলে সে বড় মর্মন্তুদ ঘটনা।

কিশোরী বলল—আপনারা কি আন্দাজ করেছিলেন?

তারানাথ বলল—সুবালা ওই ঘোরলাগা অবস্থায় প্রায়ই বলত সে তার ছেলেকে নিয়ে যেন কোনো উঁচু জায়গা থেকে পড়ে যাচ্ছে! মাথায় আঘাত পাওয়ার কথা বলত। একদিন ও টান করে চুল বেঁধে এসেছে, দেখলাম বাঁদিকের কপালে একটা লম্বা দাগ, পুরনো ক্ষত শুকিয়ে এলেও যেমন দাগ শুকিয়ে যায়—তেমনি। বিজয়বাবুকে বলতে তিনি বললেন ওটা সুবালার জন্মদাগ।

বললাম—খেয়াল করেছেন কি, সুবালা আচ্ছন্ন অবস্থায় মাথার যেখানে আঘাত লাগার কথা বলে, এই দাগটাও ঠিক সেখানেই।

বিজয়বাবু বললেন—তাও কি হয়? গতজন্মের আঘাতের দাগ এজন্মে ফুটে ওঠে?

বললাম—জানি না। তবে পৃথিবীতে অনেক কিছুই যে সম্ভব সে তো দেখতেই পাচ্ছেন।

যাক্, দু'বছরে যা জানতে পেরেছিলাম তা খুব স্পষ্ট না হলেও মোটামুটি এই—সুবালা গতজন্মে একটি শিশুসন্তান নিয়ে বিধবা হয়। পরে কে বা কারা কোনো উঁচু স্থান থেকে—সম্ভবত কোনো টিলার ওপর থেকে সন্তানসহ সুবালাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে হত্যা করে। কিন্তু কেন হত্যা করে, এবং হত্যাকারীর নাম কি—এসব খবর আমরা কিছুতেই জানতে পারিনি। এখানে এসেই সুবালার কথা আটকে যেত। মনের ওপর চাপ পড়লে ক্ষতি হতে পারে ভেবে আমিও জোর করিনি কখনো।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। এই ঘটনায় আমি বুঝতে পেরেছিলাম মাতৃস্নেহ কি জিনিস। সন্তানের প্রতি মায়ের টান বিশ্বের একটা বড় শক্তি। সুবালা মাত্র তেরো বছরের কিশোরী—এজন্যে এখনো সে মা হয়নি কিন্তু আধো-অজ্ঞান অবস্থায় যখন সে বলত—'খোকা পড়ে যাচ্ছে! খোকাকে বাঁচাও'—তখন তার মুখে যে ব্যাকুলতা ফুটে উঠত, তা মাতৃহৃদয়ের গভীর অভিব্যক্তি ছাড়া হয় না। গতজন্মের হারানো ছেলের প্রতি এই আর্তি একটু কমে এল। এইভাবে আরো বছর দুই কেটে যাওয়ার পর আস্তে আস্তে সুবালা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এল! এখন তার বয়েস হল সতেরো। একদিন বিকেলে অমরবাবু এসে বললেন—একটা ভালো খবর আছে। বেশ বড় রকমের ভোজ আসন্ন।

বললাম—কি ব্যাপার? গৃহিণী পুত্রমুখ দর্শন করবেন নাকি?

—দূর! আপনার যেমন সব কথা! এই বয়েসে—যাক্‌গে। কথা হচ্ছে এই—আমাদের বিজয় চাটুজ্জের মেয়ের বিয়ে বোধ হয় লাগল।

—কার, সুবালার?

হ্যাঁ। আগামী পরশু পাত্রের বাবা দেখতে আসছেন জব্বলপুর থেকে। প্রবাসী বাঙালী। পাত্রও সেখানেই ব্যবসা করে। বিরাট অবস্থা। মেয়ে সুন্দরী শুনে দেখতে আসছে। নইলে বিজয়ের যা আর্থিক সঙ্গতি, এরকম ঘরে তারা ছেলের বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতো না। আপনিও আসুন না ওদিন। বিজয় আমাকে বলেছিল আপনাকে নিয়ে যেতে। একটা শুভদিন—আপনার মত সদ্‌ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকলে সুবালার মঙ্গল হবে।

মেয়ে দেখার দিন বিজয় চাটুজ্জের বাড়ি গেলাম অমরের সঙ্গে। এসব সামাজিক উৎসব আমার ভালোই লাগে। তারপর মেয়ে দেখানোর ব্যাপার, ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে নিশ্চয়ই। আমি ভোজন রসিক চিরদিনই। ধুতি-চাদর চাপিয়ে বিকেলে গিয়ে হাজির হলাম।

তখনও ছেলের বাবা এসে পৌঁছান নি। বিজয়বাবু আমাদের আদর করে নিয়ে বৈঠকখানায় বসালেন। তামাক এল, চা-খাবার এল। বিজয়বাবু একবার সুবালাকে ডেকে এনে প্রণাম করিয়ে নিয়ে গেলেন। সুবালা মাথায় হঠাৎ যেন অনেকখানি লম্বা হয়ে গিয়েছে। চোখ-মুখ যেন তুলি দিয়ে আঁকা। সত্যি সুন্দরী বটে। মাথায় হাত দিয়ে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলাম—সুখী হও মা।

জীবনে এমন ব্যর্থ আশীর্বাদ আর করিনি।

বিজয় চাটুজ্জে বললেন—ঠাকুরমশায় কিন্তু আজ রাত্তিরে এখানেই খেয়ে যাবেন। মাংস চলে তো?

খুব চলে। আমি ঘণ্টানাড়া পুরুত বামুন নই।

সবারই মন বেশ ভাল। বিজয়বাবুর মনের আনন্দ কিছুটা বাইরে বেরিয়ে আসছে। কেনই বা হবে না? বড়লোকের ঘরে মেয়ে বিয়ে দিতে চলেছেন। বিয়ে প্রায় ঠিকই বলতে গেলে। পাত্রের কে এক আত্মীয় মেয়ে দেখে গিয়ে ওখানে দারুণ প্রশংসা করেছেন। আজ বাবা দেখে গেলেই পাকাপাকি হয়ে যায়।

সন্ধ্যে ঠিক সাতটায় দরজার কড়া নড়ে উঠল। বিজয় ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গিয়ে একটু পরেই এক দোহারা চেহারার সুপুরুষ প্রৌঢ় ভদ্রলোককে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আলাপ করিয়ে দিয়ে বিজয়বাবু বললেন—ইনি হচ্ছেন সনাতন মুখোপাধ্যায়, পাত্রের বাবা। আমরা নমস্কার করলাম। সনাতনবাবু আমাকে প্রণাম করার ধার দিয়েও গেলেন না। অর্থ থাকলেও অনেক ধনী ব্যক্তির ব্যবহারে একটা নম্রতা থাকে। ইনি সে দলের নন। বেশ জবরদস্ত লোক। আমাদের নমস্কারের উত্তরে একটা দায়সারা প্রতি-নমস্কার করেই তাড়া দিয়ে বললেন—চাটুজ্জেমশাই মেয়েকে আনুন। আমার হাতে বেশি সময় নেই। এখুনি আবার উঠতে হবে। কোলকাতায় এসেছিলাম ব্যবসার একটা জরুরি কাজে। ভাবলাম এলাম যখন একবার দেখেই যাই। নইলে এমনিতে তো আর বড় একটা আসা হয়ে ওঠে না।

এমন দু'চারটি কথায় ভদ্রলোক বেশ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন তাঁর আর বিজয়বাবুর মধ্যে অবস্থার বিস্তর প্রভেদ। বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি নেহাত ব্যবসার কাজে আসতে হয়েছিল বলেই দয়া করে মেয়ে দেখে যাচ্ছেন। বুঝলাম বিয়ে হয়ত হবে, কিন্তু কুটুম্বের দিক দিয়ে বিজয়বাবুর বিশেষ সুখ হবে না। কিন্তু কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার অত সম্মানজ্ঞান থাকলে চলে না। বিজয়বাবু তাড়াতাড়ি করে ভেতরে গেলেন মেয়েকে আনবার কথা বলতে। আমরা মুখ নিচু করে নীরবে বসে রইলাম। এক একজন লোক আছে, যাদের সামনে কিছুতেই আড্ডা জমানো যায় না। সনাতন মুখোপাধ্যায় সেইরকম লোক। একটু বাদেই ভেতর থেকে খাবার এল। মেয়েদের

নিজের হাতে তৈরি খাবার। সনাতনবাবু সে-সব স্পর্শও করলেন না। কেবল চা খেলেন এককাপ। আর অনর্গল মেয়ে দেখানোর জন্য তাড়া দিতে লাগলেন। বিজয়বাবু মুক্তকচ্ছ হয়ে বারবার সে তাড়া বাড়ির ভেতরে পৌঁছে দিয়ে আসতে লাগলেন। বস্তুত এমন অভব্য মানুষ খুব কমই দেখেছি।

এইবার ঘটল আসল ঘটনা, যে কাহিনী বলবার জন্য বসেছি।

একটু বাদেই যে একটা বিরাট কিছু ঘটতে চলেছে তা আমরা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি। বেশ সুন্দর পরিবেশ। একটি বিয়ের প্রাককথন হবে, কিছু বাদে একটি ভোজের আভাসও রয়েছে। কে জানত কি ভয়াবহ ব্যাপার ঘটতে চলেছে আর কয়েক মিনিটের মধ্যে।

ভেতরবাড়ির দিকে চুড়ির শব্দ হতে বিজয়বাবু উঠে গিয়ে সুবালাকে হাত ধরে ঘরের ভেতরে নিয়ে এলেন। আমি বেশ ভাল করে তখন তার মুখ দেখেছিলাম। হলপ করে বলতে পারি, সে মুখে তখন কোনো অস্বাভাবিকতা বা পাগলামির চিহ্নমাত্র ছিল না। আমি সুবালাকে বসতে জায়গা করে দেব বলে উঠে সরে যাচ্ছি, অমরনাথও সরে বসবার উদ্যোগ করেছে, হঠাৎ কেমন একটা অদ্ভুত আওয়াজে মুখ তুলে তাকিয়েই পাথর হয়ে গেলাম।

সুবালার চোখ বিস্ফারিত, জিঘাংসু উন্মাদের মত সে তাকিয়ে কাছে সনাতন মুখুজ্জের দিকে। সনাতনবাবুও বিস্মিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। সুবালার সমস্ত শরীরের পেশী শক্ত হয়ে গিয়েছে। চোখ তীব্র ক্রোধে জ্বলে উঠেছে, ঠোঁটের ভঙ্গি ক্ষিপ্ত।

বিজয়বাবু ভয় পেয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁর মনের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। অনেক দিন মেয়ে এমন করেনি। একেবারে সেরে গিয়েছে, এই ভরসায় তার বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। আজ এত বছর পরে আবার সুবালার এমন হবে কে জানত! তিনি বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই ঘরের মধ্যে সুবালার তীব্র আক্রোশপূর্ণ গলা ছড়িয়ে পড়ল—ওই! ওই লোকটাই আমার খোকাকে মেরে ফেলেছে, আমাকে মেরে ফেলেছে।

বলে কি সুবালা! বিয়ে তো আর হচ্ছেই না, কিন্তু এতে ব্যাপার অন্যদিকে অনেকদূর গড়িয়ে যেতে পারে। বিজয়বাবু ধমক দিয়ে বললেন—আঃ, কি বলছিস্। চুপ কর।

কাকে কি বলা। সুবালা কালনাগিনীর মত ফুলছে। বলছে—টাকার জন্য খুন করেছিলি, না? দাদাকে মেরে শান্তি হয়নি। সম্পত্তি পাবার জন্য আমাকে আর খোকাকে পাহাড় থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলি। বেশ! কিন্তু এবার তোকে কে বাঁচাবে?

সনাতনবাবুর মুখ সাদা হয়ে গিয়েছে। অবাস্তব, অসম্ভব বিভীষিকা দেখলে মানুষের মুখ যেমন হয়। তিনি অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন—বৌদি!

সেই মুহূর্তেই সুবালা টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিজয়বাবু স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, অমর ভট্‌চায বারবার বলছেন—চলে যান্, সনাতনবাবু, আপনি এক্ষুনি এখান থেকে চলে যান। আমি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে সনাতনবাবুর সামনে গিয়ে বললাম—বৌদি কে?

সনাতনবাবু ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছেন। বললেন—অ্যাঁ?

আমি আবার বললাম—বৌদি বলে কাকে ডাকলেন? কাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন পাহাড় থেকে?

সনাতনবাবু আর কোনোদিন কোন কথা বলার সুযোগ পাননি। আমার পেছন থেকে হঠাৎ বিজয়বাবু 'ধর ধর' করে চিৎকার করে উঠলেন। আমি চমকে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি সুবালা একটা বিরাট বঁটি নিয়ে ঘরে ঢুকছে। তার কাপড় প্রায় খুলে গিয়েছে, চোখে খুনীর দৃষ্টি। আরো পেছনে দৌড়ে আসছেন মহিলারা। ব্যাপারটা চোখের নিমেষে ঘটে গেল। অমরবাবু খাট থেকে নেমে, বা আমি আর বিজয়বাবু এগিয়ে গিয়ে বাধা দেবার আগেই সুবালা ঝড়ের বেগে দৌড়ে

এসে সনাতন মুখুজ্জের গলায় বঁটিটা বসিয়ে দিল। বিকৃত একটা শব্দ করে সনাতনবাবু পড়ে গেলেন। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল। সুবালা পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে।

মিনিট দশেক পরে মোড়ের ডাক্তারখানা থেকে যখন ডাক্তার নিয়ে ফিরে এলাম, তখন আর সনাতনবাবুর দেহে প্রাণ নেই। ঘণ্টা দুই পরে সুবালার জ্ঞান ফিরেছিল। কিন্তু এতসব ঘটনা তার কিছুই মনে নেই। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

সনাতনবাবুর ছেলে কেস চেপে দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পুলিশ ছাড়েনি। পুলিশ সুবালার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনে। কিন্তু জজ বুদ্ধিমান। এ খুনের কোনো মোটিভ নেই, তাছাড়া আসামীপক্ষ থেকে বলা হয়েছিল মেয়ে পাগল। আমার আর অমর ভট্‌চাযের সাক্ষ্যেও কাজ হয়েছিল। সুবালা খালাস পেয়ে যায়।

গতজন্মে টাকার লোভে বিধবা সুবালা আর তার সন্তানকে হত্যা করেছিল সনাতন। সেই সম্পত্তি পেয়েই জব্বলপুরে ব্যবসা ফেঁদেছিল সে। এদিকে সুবালা কোলকাতায় বিজয় চাটুজ্জের মেয়ে হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। ভগবানের মার বড় সাংঘাতিক মার। কোথা থেকে সনাতন মুখুজ্জেকে এসে শাস্তি নিয়ে যেতে হল। নিজের জন্য অতটা নয়—কিন্তু তার সন্তানের মৃত্যুর কথা ভুলতে পারেনি সুবালা। সনাতনকে দেখামাত্র দপ্‌ করে জ্বলে উঠেছিল জন্মান্তরের স্মৃতি।

তারানাথ থামল। অন্যদিন গল্পের শেষে কিশোরী যা হোক একটা টিপ্পনী কাটে। আজ সেও চুপ করে বসে রইল। বাইরে ল্যাম্পপোস্টে আলো জ্বলে উঠেছে। ঘরের মধ্যে কেমন একটা বিষণ্ণতা। তারানাথও আর কোন কথা বলছে না।

শেষে আমিই স্তব্ধতা ভেঙে বললাম—আজ যাই। আর একদিন আসব।

পুজোর পর অফিস খুলেছে। দশ-বারোদিন কুঁড়েমি করার পর কাজে আর মন বসে না, সকালে উঠে জোর করে অফিসের জন্য তৈরি হতে হয়। এতদিনেও বেশ পোক্ত চাকরিজীবী হতে পারলাম না। আমার বিশ্বাস মানুষের জীবনটা প্রধানত অবকাশ-যাপনের জন্যই, তবে অবসর সময়ে একটা চাকরি করলে ক্ষতি নেই। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর দাবী এত বেশি যে, চাকরিই প্রধান হয়ে উঠেছে, অবকাশটা গৌণ। অথচ মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান যা—যেমন সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য—সবই তো অবকাশের ফসল। একমাত্র বার্নে পেটেন্ট অফিসে কাজ করতে করতে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের আবিষ্কার ছাড়া চাকরি করে কে কবে অমর হয়েছে?

ছুটির পর বাড়ি ফিরে চা খেতে খেতে এইসব উচ্চমার্গের চিন্তা করছিলাম। ক্রমে যখন ধারণা হয়ে এসেছে যে, চাকরি না করলে আমিও জগতে অমর কীর্তি রেখে যেতে পারতাম, (ক্লাস সেভেনে যখন পড়ি, আমার লেখা কবিতা পড়ে থার্ড পণ্ডিত মশাই যে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন সেটা তো আর মিথ্যে নয়! কেউ কেউ যে রবি ঠাকুরের কবিতার সঙ্গে মিল দেখতে পেয়েছিল, সেটা কেবল 'নিন্দুকগুলা খাইতে পায়না বলিয়াই'—) সেই সময়ে বাইরে থেকে কিশোরীর হাঁক শোনা গেল। বেরিয়ে বললাম—ব্যাপার কি?

—এই যে, ফিরেছ দেখছি। আজ আর তাসের আড্ডায় যেতে ইচ্ছে করছে না। চল, তারানাথকে বিজয়ার প্রণাম করে আসি—

শার্টটা গায়ে চাপিয়ে কিশোরীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। তারানাথ রাবড়ি খেতে ভালবাসে, কিন্তু সম্প্রতি তার যা আর্থিক অবস্থা তাতে রাবড়ি খাওয়া চলে না। কিশোরী আর আমি পকেটে

হাতড়ে যা বের করলাম, তা দিয়ে তালতলার চেনা হিন্দুস্থানীর দোকান থেকে সেরখানেক রাবড়ি কিনে নেওয়া গেল।

আমাদের দেখে তারানাথের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল—বৌ আর ছেলেপিলেরা ছাড়া এই তোমরাই যা বিজয়া করতে এলে এবার! এত যে জানাশোনা লোক ছিল, তারা গেল কোথায় বল দেখি?

রাবড়ি পেয়ে তারানাথ খুব খুশি, 'ওঃ এ তো প্রায় সেরখানেক হবেই! অনেকদিন পর পেট ভরে রাবড়ি খাব। বোসো তোমরা, চা বলে আসি'—

চা এল, সঙ্গে নারকেল নাড়ু আর বাড়িতে ভাজা কুচো নিম্‌কি। খাওয়ার পর কিশোরীর পকেট থেকে অবশ্যম্ভাবী পাসিং শো-এর প্যাকেটটি বেরুল। সিগারেট ধরিয়ে তারানাথ চোখ বুঁজে মৌজ করে টান দিচ্ছে, কিশোরী বলল—আজ বছরকার দিনটা, একটা গল্প না শুনেই ফিরে যাব?

তারানাথ চোখ মেলে হেসে বলল—তোমরা দুটিতে যখন এসোছ, গল্প না শুনে ফিরবে না জানি। কি রকম গল্প চাই?

—আজ আমাদের কোনো বায়না নেই। আপনি যা বলবেন—

কিছুক্ষণ তারানাথ চুপ। বোধহয় মনে মনে গল্পটাকে গুছিয়ে নেবার কাজ চলছে। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে অ্যাশট্রে হিসেবে ব্যবহৃত একটা নারকেলের মালায় গুঁজে তারানাথ বলতে শুরু করল—বীরভূমের একটা রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে আছি। লুপ লাইনের অখ্যাত, গেঁয়ো স্টেশন। সাহেবগঞ্জ লোকাল ধরে হাওড়া আসব, তা সে ট্রেন শুনলাম দেড়ঘণ্টা লেট। কোথাও একটা খাবারের দোকানও নেই যে এককাপ চা খাব। একটা বিড়ি ধরিয়ে পায়চারী করছি, দেখি প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা ইঁটের পাঁজার ওপর একজন বিশাল চেহারার লোক চুপ করে বসে আছে। পোশাক খুবই সাধারণ, খাটো ধুতির ওপর একটা ফতুয়া গোছের জামা, পায়ে বহু পুরনো একজোড়া চটি। মাথায় অযত্নলালিত ঝাঁকড়া চুল। কিন্তু লোকটার ঋজু বসবার ভঙ্গিতে আর চোখের দৃষ্টিতে এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের ছাপ রয়েছে, বার বার তাকিয়ে দেখতে হয়।

আমাকে অনেকক্ষণ একা কাটাতে হবে, কাজেই আলাপ জমাবার উদ্দেশ্যে ইঁটের পাঁজার একপাশে বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম—সাহেবগঞ্জ লোকাল ধরবেন বুঝি?

আমার দিকে না তাকিয়েই লোকটা বলল—হ্যাঁ।

—সে ট্রেন তো শুনলাম দেড়ঘণ্টা দেরিতে আসছে।

—হ্যাঁ।

দু-বার এরকম একাক্ষরী উত্তর দেবার পর লোকটি এবার আমার দিকে তাকাল। বেশ বুদ্ধিদীপ্ত চোখে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল—গুরুর দর্শনলাভ ঘটেছে?

হেসে বললাম—কি করে বুঝলেন?

লোকটিও সামান্য হেসে বলল—হাত গুনতে হয় না, তোমার গেরুয়া আর রুদ্রাক্ষের মালা দেখেই বলা যায় তুমি কোন্ পথের পথিক।

—আর গুরুর ব্যাপারটা?

—গুরুর কৃপা না পেলে চোখে জ্যোতি ফোটে না। তোমার চোখে সেই জ্যোতি রয়েছে। 'তুমি' বলছি বলে রাগ করছ না তো? তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট—

সবিনয়ে বললাম—না না, আমাকে 'তুমি'-ই বলবেন।

—আমার বয়েস কত মনে হয়?

ভাল করে তাকিয়ে দেখে বললাম—বছর পঞ্চাশেক হবে, না কি?

—আমার এই বাহাত্তর চলছে, সামনের চৈত্রে তিয়াত্তর হবে।

অবাক হয়ে বললাম—বলেন কি। যাঃ, তা কি করে হতে পারে? আপনার তো একটা চুলও পাকেনি দেখছি—

—পাকবেও না। যেদিন যাবার হবে এইভাবেই চলে যাব।

আমি উঠে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললাম—আপনি নিশ্চয় সিদ্ধপুরুষ, অনেক ভাগ্যে আপনার দেখা পেলাম। আমাকে আশীর্বাদ করুন।

লোকটি সজ্জন, আমি পায়ে হাত দিতে সঙ্কুচিত হয়ে বললেন—আরে আরে! পায়ে হাত দিচ্ছ কেন? আমি সিদ্ধপুরুষটুরুষ কিছু নইরে ভাই, নিয়মিত প্রাণায়াম করি—তাতেই শরীরটা তৈরি হয়ে গিয়েছে আর কি। জরার আক্রমণ কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারব।

ইঁটের পাঁজার ওপর লোকটির পাশে জমিয়ে বসলাম। একটু একটু করে আলাপও হয়ে গেল। তাঁর নাম বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, লোকে বিশুঠাকুর বলে ডাকে। এককালে মুর্শিদাবাদের কোন্ গ্রামে বাড়ি ছিল, এখন কিছু নেই। এইরকম ঘুরে ঘুরে বেড়ান, কোথাও কোনো বটতলায় বা মন্দিরে আশ্রয় নেন। সাধুসন্তের প্রতি গ্রামের মানুষের আকর্ষণ চিরকালের—তারা দেখতে এসে কলা মুলো যা দেয় তাতেই একটা পেট চলে যায়।

জিজ্ঞাসা করলাম—এখন যাচ্ছেন কোথায়?

উনি একটু চুপ করে থেকে বললেন—বেশিদূর নয়, এই কয়েকটা ইস্টিশন পরেই আমার এক গুরুভাইয়ের বাড়ি। একসঙ্গে দীক্ষা নিয়ে দুজনে কিছুদিন সাধনা করেছিলাম। পরে সে অবশ্য বিয়েথাওয়া করে সংসারী হয়—ধানের ব্যবসা করে কিছু টাকাও করেছিল, সেটাই তার কাল হল শেষ অবধি—

নড়ে বসে বললাম—কি রকম?

বিশুঠাকুর বললেন—আমার সেই বন্ধু, রামরাম ঘোষাল, দিন দশবারো আগে খুন হয়েছে।

—সেকি! খুন! কেন?

—রামরামের কিছু টাকাপয়সা হয়েছিল এ খবর অনেকেই জানত। নিজের বসতবাড়ি থেকে একটু দূরে বাঁশঝাড়ের পেছনে রামরাম একখানা ঘর তুলেছিল, সেখানে রাত্তিরে গিয়ে সাধনভজন করবার চেষ্টা করত। গৃহী হয়েও এ অভ্যেসটা ছাড়তে পারেনি। এই ঘরেরই মাটির মেঝেতে টাকা পুঁতে রেখেছিল রামরাম। তাকে মেরে মাটি খুঁড়ে সবকিছু নিয়ে চলে গিয়েছে।

—কে করল এ কাজ?

বিশুঠাকুর বললেন—জানি না। তবে যে করেছে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। যে কাঠায় মাপ, সে কাঠায় শোধ, বুঝলে?

ঠাকুরের গলার স্বরে একটু অবাক হলাম। এ শুধু প্রিয় বন্ধুর অক্ষম হাহাকার নয়, এ কথার পেছনে দৃঢ় প্রত্যয় লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু অজ্ঞাত হত্যাকারীর বিরুদ্ধে বিশুঠাকুর কিইবা করতে পারেন তা বুঝলাম না।

—তুমি কোথায় চলেছ?

হেসে বললাম—কোথাও না। মানে, কোনো ঠিক নেই আর কি। বাড়িতে ভাল লাগে না, তাই ঘুরে ঘুরে বেড়াই, আর সাধুসন্ন্যাসীর দেখা পেলে তাঁদের সঙ্গলাভের চেষ্টা করি। এই যেমন এখন ইচ্ছে করছে আপনার সঙ্গে থাকি—

বিশুঠাকুর এই প্রথম হাসলেন, বললেন—আমার সঙ্গে থাকতে চাও? বেশ, চল—আমার কোনো আপত্তি নেই। খাওয়াদাওয়া কিন্তু আমার যা জুটবে তোমারও তাই, আবার নাও জুটতে পারে, চলবে তো?

—আমার অভ্যেস আছে।

আমার সংক্ষিপ্ত উত্তরে বিশুঠাকুর একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর বললেন—চল তাহলে।

অখ্যাততর একটি স্টেশনে নেমে মাইলছয়েক হেঁটে ঘোর সন্ধেবেলা রামরাম ঘোষালের গ্রামে পৌছনো গেল। বিশুঠাকুর আগে দু-একবার এ গ্রামে এসেছেন। তিনি হন্‌হন্ করে হেঁটে গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে একটা বড় আটচালা বাড়ির সামনে দাঁড়ালেন। মাঝখানে উঠোন ঘিরে গায়ে গায়ে লাগা অনেকগুলো ঘর, উঠোনে তুলসীমঞ্চ। ঘরে ঘরে আলো জ্বালার উদ্যোগ চলছে, কয়েকটি শিশুর কলরব শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সবমিলিয়ে বাড়ির পরিবেশে একটা শোকের বিষণ্ণতা পরিব্যপ্ত হয়ে আছে। বিশুঠাকুর আমার হাত ধরে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন।

গৃহস্বামী এগিয়ে এসে অতিথিকে আপ্যায়ন না করলে অতিথির পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকাটা বড় অস্বস্তিকর হয়ে পড়ে। এ বাড়ির কর্তা এখন কে জানি না, কাজেই আমরা চুপ করে দাঁড়িয়েই রইলাম।

মিনিটদশেক পরে উঠোনের ওধারের একটা ঘর থেকে প্রদীপহাতে এক বিষণ্ণমূর্তি মহিলা বেরিয়ে তুলসীতলায় আসতে গিয়ে আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—কে? কে ওখানে?

বিশুঠাকুর দু-পা এগিয়ে গিয়ে বললেন—বৌমা, আমি বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য। চিনতে পারছ? রামরাম থাকতে আমি এসেছি কয়েকবার—

মহিলাটি একমুহূর্ত নীরব থাকবার পর চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। তাঁর কান্নার শব্দে চারদিকের ঘর থেকে এতক্ষণে অনেকে বেরিয়ে এল। বেশ কিছুক্ষণ একটা মিশ্র কোলাহল চলবার পর আমরা দাওয়ায় বসবার আসন পেলাম।

একঘণ্টা পর।

বিশুঠাকুর এসেছেন শুনে গ্রামের অনেকে জড়ো হয়েছে রামরাম ঘোষালের বাড়ি। তালপাতার চাটাইতে বিশুঠাকুর বেশ ঋজু হয়ে বসে আছেন। রামরামের ছোটভাই শিবরাম চোখে জল নিয়ে হাতজোড় করে ধরা গলায় বলছে—ঠাকুরমশাই, কে একাজ করেছে জানি না—কিন্তু যে-ই করুক, সে ভুল করেছে। দাদা আমার শিবতুল্য মানুষ ছিলেন, ব্যবসা করতেন বটে, কিন্তু টাকাকড়ির ওপর কোন লোভ ছিল না। কত লোকের পাওনা ছেড়ে দিয়েছেন, কত লোকের কন্যাদায় উদ্ধার করেছেন। এ অঞ্চলের সবাই জানত বিপদে পড়ে রামঠাকুরের কাছে গেলে খালিহাতে ফিরতে হবে না। এত পয়সা উপার্জন করতেন, কিন্তু নিজে পরতেন একটা খাটো ধুতি, সারাদিনের শেষে খেতেন একমুঠো আতপচাল সেদ্ধ। আমার বিশ্বাস, হত্যাকারী চাইলে দাদা টাকাপয়সা সবই বের করে দিতেন, খুন করবার দরকার হত না। সবই ভাগ্য—

বিশুঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—পুলিশ কি বলছে?

শিবরাম উত্তর দেবার আগেই ভিড়ের মধ্য থেকে একজন কে বলে উঠল—পুলিশ বরাবর যা বলে। খুনের পরদিন সকালে খবর দেওয়া হয়েছে, পুলিশ এসেছে বিকেলে। কি ঝামেলা ভাবুন তো! আবার দারোগা বলে দিয়েছিল—পুলিশ পৌছনোর আগে যেন মৃতদেহ সৎকার না করা হয়। সেই দেহ নিয়ে পরদিন রাত বারোটা অবধি সবাই বসে। এদিকে পুলিশের কি হম্বিতম্বি—গ্রামসুদ্ধু লোককে ফাঁসি দেয় আর কি! তারপর পুলিশও চলে গেল, সবকিছু মিটে গেল। খুনি আর ধরা পড়েছে!

বিশুঠাকুর বিষণ্ণতা মাখানো গলায় বললেন—ঠিকই। পুলিশের অপদার্থতা আর কারও জানতে বাকি নেই, খুনীকে তারা ধরতে পারবে বলে আমারও বিশ্বাস হয় না। আহা, রামরাম এমন বেঘোরে মারা যাবে স্বপ্নেও ভাবিনি। নাঃ, এ খুনের কিনারা কিছু হবে না—

আমি একটু অবাক হয়ে বিশুঠাকুরের মুখের দিকে তাকালাম। এই আজই কয়েকঘণ্টা আগে উনি জোর দিয়ে বলেছেন খুনীরা শাস্তি পাবেই, আবার এখন বলছেন হত্যার কিনারা হবে না—ব্যাপার কি? কিন্তু বিশুঠাকুর সত্যিই যেন কেমন হতাশ আর হালছাড়া ভঙ্গিতে বসে রয়েছেন, মুখে শোকের ছায়া। আসলে বন্ধুর মৃত্যুতে বুড়োমানুষ হয়ত রেগে গিয়ে ওসব কথা তখন বলেছিলেন, সত্যিই তো—কি করে আর এখন ধরা যাবে হত্যাকারীকে?

একজন দীর্ঘদেহ শ্যামবর্ণ লোক ভিড়ের থেকে একটু আলাদা হয়ে দাওয়ার একপ্রান্তে বসে সবার কথা শুনছিল। গ্রাম্য মানুষদের থেকে তার ব্যক্তিত্বকে কিছুটা আলাদা করে বোঝা যায়। অন্য সবাই বেশির ভাগই খালিগায়ে এসেছে, কেবল এ লোকটির গায়ে হাফহাতা নীল শার্ট। এসব শহুরে ধাঁচ লোকটা পেল কোথায় তা ভাবছি, এমন সময় লোকটা বলে উঠল—খুনের কিনারা হবে না বলছেন? ভাবলেও খারাপ লাগে, রামজ্যাঠার মত লোক—খুনীর শাস্তি না হলে তাঁর আত্মা শাস্তি পাবে না। কিছুই কি করার নেই?

সে কথার উত্তর না দিয়ে বিশুঠাকুর লোকটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন—তুমি কে?

লোকটি যেন একটু থতমত খেয়ে বলল—আজ্ঞে, আমি হরিপদ।

—রামরামের ভাইপো?

—আজ্ঞে না, ওঁকে ছোটবেলা থেকেই জ্যাঠামশাই বলে ডাকি। উনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন।

—গতবার এসে তো তোমাকে দেখেছি বলে মনে হয় না—

হরিপদ বলল—ঠিকই। আমি মাঝে প্রায় পনেরো বছর গ্রামে ছিলাম না। বাইরে চাকরি করতাম, সম্প্রতি ফিরে গ্রামে বসেছি।

—চাকরি ছাড়লে কেন?

বিশুঠাকুরের জেরায় লোকটি স্পষ্টত বেশ অস্বস্তি বোধ করছে। সে বলল—শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, চাকরির ধকল পোষাল না। শরীর একটু ভাল বোধ করলে হয়ত আবার চলে যাব—

বিশুঠাকুর তাকে আর কোন প্রশ্ন করলেন না। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একটু মাতব্বরমত শ্রীদাম ঘোষ বলল—ঠাকুর যখন এসেছেন, এঁদের বাড়িতে একটু স্বস্ত্যয়ন করে দিয়ে যান। অপঘাতটা হল তো—বাড়ি ঠাণ্ডা হবে'খন।

সে হবে। কর্তব্য করব বলেই তো এসেছি—

আবার ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ভারি অদ্ভুত মানুষ তো! সেই দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর ফিরে এসেছে গলায়। কর্তব্য! কি কর্তব্যের কথা উনি বলছেন?

কিন্তু আমাকে বেশি ভাবতে না দিয়ে বিশুঠাকুর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—চল দেখি তোমরা, রামরামের সেই চালাঘর কোন্‌দিকে? একটু দেখে আসি জায়গাটা—

গ্রামে যেমন হয়, পুরো ভিড়টা আমাদের সঙ্গে চলল। বাড়ির পেছনের ঘন বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা ছোট্ট সুঁড়িপথ চলে গিয়েছে। সেটা ধরে বেশ কিছুটা যাওয়ার পর মৃত বলরাম ঘোষালের সাধনপীঠে এসে উপস্থিত হলাম। সামান্য খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে মজবুত চালাঘর তোলা হয়েছে, মাটির সিঁড়ি বেয়ে উঠে প্রথমে সরু দাওয়া, তারপর ঘর। দরজা খোলা হা হা করছে। এখানে কয়েকদিন আগেও একজন রীতিমত জীবন্ত মানুষ বসে ঈশ্বরের আরাধনা করত—এখনও তার রক্তের দাগ মাটির মেঝেতে লেগে রয়েছে। এসব ভাবতে গিয়ে মনটা

উদাস হয়ে গেল। হাসিমুখে যে লোকটা দুপুরে ভাত খেয়েছে, ভোরে সূর্যপ্রণাম করেছে, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছে—সে জানত না পরের দিন সকালে এই পৃথিবীটা তার কাছে অনেক দূরের হয়ে যাবে। এইটুকু তো মানুষের জীবন, নিতান্ত অনিশ্চিত—এরই মধ্যে কত ঈর্ষা ও বিদ্বেষ, পার্থিব ভোগ্যবস্তু অধিকার করে রাখার প্রাণপণ প্রচেষ্টা! কি সার্থকতা এর?

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য আর আমি দাওয়া পেরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। শ্রীদামের হাতে লণ্ঠন ছিল, সেও আমাদের সঙ্গে ঢুকল ঘরে—তার পেছনে শিবরাম। বাকিরা ভিড় করে দাঁড়াল দরজার কাছে। গ্রামে এমনিতে জীবন নিস্তরঙ্গ—কাজেই সামান্য কিছু ঘটলেও খবর রটে বিদ্যুতের গতিতে। ঘোষালবাড়িতে দু-জন সাধু এসেছে—এ বার্তা রটে যেতেই অর্ধেক গ্রাম রামরামের চালাঘরের সামনে এসে জমল।

ঘরের এককোণে কাঠের ছোট জলচৌকির ওপর লাল বনাত দিয়ে ঢাকা ঠাকুরের আসন। সেখানে সিঁদুর মাখানো একটি পাথরের কালী মূর্তি রয়েছে। দেয়ালে দশমহাবিদ্যার ছাপা ছবি বাঁধানো, বাজারে যেমন কিনতে পাওয়া যায়। এছাড়া সমস্ত ঘরে আর কিছুই নেই, আসবাবপত্রও না।

ঘরের মেঝেতে এখানে-সেখানে মাটি খুঁড়ে ডাঁই করা রয়েছে। হত্যাকারী বেশ মাথাঠাণ্ডা লোক বলতে হবে। একজনকে খুন করে তার মৃতদেহের পাশে বসে মাটি খুঁড়ে লুকোনো টাকা বের করতে হলে স্নায়ুর ওপর রীতিমত কর্তৃত্ব থাকা প্রয়োজন। একবারে যে খুঁজে পায়নি তা বোঝাই যাচ্ছে, কারণ মেঝের বিভিন্ন অংশ খোঁড়া হয়েছে। ঠাকুরের আসনের সামনে মাটির মেঝেতে কালো ছোপ লেগে, রক্ত শুকিয়ে কালো দেখাচ্ছে। অর্থাৎ গভীর রাত্তিরে রামরাম ঘোষাল যখন দরজার দিকে পেছন ফিরে সাধনায় রত ছিলেন, তখন আততায়ী পেছন থেকে তাঁকে আঘাত করে।

মাটিতে লেগে থাকা রক্তের দাগের দিকে তাকিয়ে বিশুঠাকুরের চোখ জলে ভরে এল। ধরা গলায় তিনি বললেন—রামরাম, তুই আমাদের চেয়ে অনেক বড় ছিলি। আমি তো সংসার ছেড়ে বিবাগী হয়ে বেড়াই। আর তুই গৃহী হয়েও সাধনা ছাড়িস্ নি—অনেক মহৎ ছিলি তুই—

তারপর কেমন একটা দৃষ্টিতে ঘরের অন্ধকার একটা কোণের দিকে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন—আমি এসে গিয়েছি। কাজ সেরে ফিরব। তুই ভাবিস্ না—

এমন দৃঢ়তার সঙ্গে বিশুঠাকুর কথাগুলো বললেন যেন ঘরের ওই শূন্য অন্ধকার কোণে তিনি এক অশরীরী উপস্থিতিকে প্রত্যক্ষ করছেন। আমার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিল। শ্রীদাম আর শিবরামও দেখি কেমনভাবে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে, পাগল ভাবছে কিনা কে জানে।

বিশুঠাকুর বললেন—চল তারানাথ, বাইরে যাই।

ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা দাওয়ায় বসলাম। গ্রামবাসীরা চারদিকে ঘিরে রইল। আমি শ্রীদামকে বললাম—ঘোষালমশায়ের সাহস ছিল বলতে হবে। এমন নির্জন জায়গায়, জঙ্গলের মধ্যে রাত্তিরে একা থাকতেন। সাধারণ লোক হলে পারত না।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে সাধক মানুষ তো, কিছুকে পরোয়া করতেন না।

শিবরাম বলল—দাদার সঙ্গে কেতু থাকত, দাদার আদরের কুকুর। কিন্তু দাদার মৃত্যুর পর থেকে তাকেও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কোথায় যে গেল কুকুরটা।

হঠাৎ দেখলাম বিশুঠাকুর ঋজু হয়ে বসেছেন, চোখে বুদ্ধি মেশানো খরদৃষ্টি। বললেন—কেতু কি দেশি কুকুর?

—আজ্ঞে! বিলিতি কুকুর আর এই গ্রামে আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি বলুন? তবে দেশি কুকুর বলে তাকে কেউ অবহেলা করতে সাহস পেত না। এই বিশাল চেহারা কেতুর, সিংহের

মত থাবা। ভারী গলায় তাঁর গর্জন শুনলে অচেনা লোকের নাড়ী ছেড়ে যেত। বাড়ির কাছে কারো আসার উপায় ছিল না—বাঘের মত কুকুর ঠাকুরমশাই! দাদার পেছন পেছন ঘুরত সারাদিন, দাদা রাত্তিরে এইখানে এলে কেতুর দরজার কাছে চুপটি করে বসে থাকত।

—হুঁ। তাকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বলছ?

—না ঠাকুরমশাই। দাদা মারা যেতে কোথাও চলে গিয়েছে হয়ত। জন্তুজানোয়াররা সব বুঝতে পারে।

বিশুঠাকুর যেন বিষয়টা ঝেড়ে ফেলার মত করে শিবরামকে বললেন—তা হবে হয়ত। যাক্ গে সে কথা, আমরা কিন্তু আজ রাত্তিরটা এখানেই থাকব, বুঝলে?

শিবরাম অবাক হয়ে বলল—এখানে কি করে থাকবেন? পাড়া থেকে এতটা দূরে, বনের মধ্যে—

—আমাদের কোন অসুবিধে হবে না। শুধু কিছুটা দুধ দিয়ে যেয়ো, আর একবোঝা শুকনো কাঠ, ধুনি জ্বালাব।

শিবরাম বলল—আমি গিয়েই কাঠ আর দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। যদি বলেন চাল-ডাল আর নতুন হাঁড়িও দিচ্ছি, বরং দু-টো ভাত ফুটিয়ে নিয়ে—

বিশুঠাকুর দৃঢ়গলায় বললেন—প্রয়োজন হবে না। আমি রাত্তিরে দুধ ছাড়া কিছু খাই না।

—ঠিক আছে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তবে ঠাকুরমশাই আজ আমার বাড়িতে থাকলেই ভাল করতেন—

—আমার এরকম বাইরে থেকেই অভ্যেস, কারো বাড়িতে থাকলে ঘুমোতে পারব না। তাছাড়া ভয় কি? এখান থেকে চেঁচিয়ে ডাকলে তো তুমি শুনতে পাবে, তাই না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তবে ঠিক আছে। কাল আমরা চলে যাব, একটা রাত এখানেই কেটে যাবে। যার সঙ্গে এত বন্ধুত্ব—যাকে দিয়ে সম্পর্ক—সেই যখন রইল না—

তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বিশুঠাকুর বললেন—নাঃ, আর মায়া বাড়াব না—

ঠাকুরের গলাটা যেন বড়ই অভিনয়-অভিনয় ঠেকল। এত দীর্ঘশ্বাস ফেলে হা-হুতাশ করবার লোক ইনি নন। কি ব্যাপার বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলাম।

বিশুঠাকুর আবার বললেন—সত্যি, মানুষের কি কপাল! টাকা পয়সা তো মেঝে খুঁড়ে নিয়ে গেলই, গ্রামের কালীমন্দিরটাও আর হল না—

ভিড়ের মধ্যে সামান্য গুঞ্জন চলছিল, হঠাৎ তা থেমে গেল। সবাই নতুন কথা শুনে বিশুঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

শ্রীদাম ঘোষ বলল—আজ্ঞে, এ কালীমন্দিরের কথাটা কি বললেন, ঠিক বুঝলাম না তো?

—কেন তোমরা জান না? রামরাম ঠিক করেছিল গ্রামে বিরাট কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করবে। স্বপ্নে আদেশ পেয়েছিল দেবীর কাছ থেকে। এজন্য কিছু সোনা কিনে জমিয়ে রেখেছিল বেচারা। সে-সবও হত্যাকারী নিয়ে গেল!

শিবরাম অবাক হয়ে বলল—দাদা সোনা কিনে জমিয়ে রেখেছিল। বলেন কি ঠাকুরমশাই? কই, আমরা তো কিছু জানতাম না—

—জানবে কি করে? গোপনে করছিল কাজটা। মন্দির প্রতিষ্ঠা হলে দেখতেই পেতে। গতবার যখন আসি, আমাকে একমুঠো পাকা সোনার গিনি দেখিয়ে ছিল। এ ক'বছরে না জানি আরও কত গিনি জমেছিল। সবই পরের ভোগে চলে গেল। মন্দিরটা হলে তোমাদেরই থাকত। মেঝে খোঁড়ার কথা শুনেই বুঝেছি হত্যাকারী আর কিছু রেখে যায়নি—

ভিড়টা আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে এল। এত বড় খবরটা বাড়ি গিয়ে সবাইকে জানাতে হবে তো!

শিবরামও শেষপর্যন্ত আমাদের প্রণাম করে উঠে পড়ল।—লণ্ঠনটা রইল ঠাকুরমশাই, তেল ভরা আছে।

হঠাৎ পেছন থেকে বিশুঠাকুর তাকে ডাকলেন—শিবরাম, শোনো।

—আজ্ঞে?

—দুধটা তুমি নিজে দিয়ে যেয়ো, কারো হাত দিয়ে পাঠিয়ো না—আর—

শিবরাম বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

—রামরামের কুকুর কেতুর গায়ের রঙ্ কি ছিল বলতে পার? লাল?

একটু বিস্মিত হয়ে শিবরাম বলল—আজ্ঞে না, কালো, মিশমিশে কালো। কেন বলুন তো?

—নাঃ, এমনি মনে হল তাই জিজ্ঞাসা করলাম। আচ্ছা, তুমি যাও এখন!

শিবরাম চলে যেতেই চারদিকে নৈশ স্তব্ধতা যেন প্রকট হয়ে উঠল। ঝিঁঝি ডাকছে জঙ্গলে, বাঁশবনে অদ্ভুত শব্দ করে বাঁশ দুলছে। মাথার ওপরে কেবল একটুখানি খোলা আকাশ দেখা যায়। অজস্র নক্ষত্র ফুটেছে কালো রাত্রির পটে। আবহাওয়া বেশ সুন্দর, তেমনি গরমও নেই, আবার ঠাণ্ডাও নয়।

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের গলা শুনতে পেলাম রাত্রির নির্জনতার মধ্যে বেজে উঠেছে, আস্তে আস্তে স্পষ্ট উচ্চারণে বলছেন—অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তিহ যমালয়ম্, শেযাঃ স্থাবরমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্!

বললাম—মহাভারত?

—হ্যাঁ। বকরূপী ধর্মের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের সংলাপ। প্রত্যেক দিনই পৃথিবীতে শতশত মানুষ মরছে, কেউ পার্থিব সম্পদ বোঁচকা বেঁধে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারছে না। তবু যারা বেঁচে আছে তারা ভাবছে তারা বুঝি চিরকালই বেঁচে থাকবে।

—কিন্তু সবাই এই সার কথা বুঝে সন্ন্যাসী হয়ে গেলে জগৎসংসার কি করে চলবে ঠাকুরমশাই?

—সবাই সন্ন্যাসী হবে কেন? গৃহী কি সৎ হতে পারে না? অনাসক্ত হতে পারে না? কিসের সম্পত্তি আর ঐশ্বর্য আর ক্ষমতা নিয়ে অহঙ্কার? জান তো, মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বং, নিমেষে হরতি কালং সর্বং? যদি সম্পদ সংগ্রহ করতে হয়, তাহলে অপরের জন্য করো—মহাকাল সব এক নিমেষে হরণ করতে পারে।

বললাম—যেমন ঘোষালমশাই গ্রামের লোকদের ভাল হবে বলে মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য সোনা জমিয়েছিলেন?

বিশুঠাকুর একমুহূর্ত আমার দিকে রহস্যময় চোখে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম হাসির রেখা। তারপর চোখ সরিয়ে নিয়ে হাল্‌কা গলায় বললেন—রামরাম কোনোদিনই মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য দেবীর আদেশ পায়নি, তার কোন সোনাও জমানো ছিল না।

বিস্মিত হয়ে বললাম—তার মানে? আপনি যে সবাইকে বললেন নিজের চোখে একমুঠো গিনি দেখে গিয়েছেন—

—মিথ্যে কথা বলেছি।

—সে কি! কেন?

—যে সোনা আমার কল্পনায় ছাড়া কোথাও ছিল না, কাজেই হত্যাকারী নিশ্চয় তা পায়নি। যা নেই তা আর পাবে কি করে? কিন্তু আমার এই কথাটা এখুনি গ্রামের মধ্যে প্রচার হয়ে যাবে।

হত্যাকারীও গ্রামের লোক, রামরামের পরিচিত লোক—নইলে প্রথমত সে রামরামের লুকোনো টাকার কথা জানতে পারত না, দ্বিতীয়ত তাকে দেখেই খুনের রাত্রে কুকুরটা চেঁচাত এবং আক্রমণ করত। সম্ভবত একটু আগে এখানে যে ভিড় জমেছিল, তার মধ্যে সে দাঁড়িয়েছিল। এখন এই সোনার কথা শুনে সে মনে করবে এটা এখনও এ ঘরের মেঝেতেই কোথাও মাটির তলায় পোঁতা রয়েছে। সোনার লোভ বড় লোভ। আমার বিশ্বাস, এ ভুল শুধরে নিতে সে আবার এখানে আসবে।

শুনে বিশেষ ভরসা হল না। বাঁশবনের ধারে এই চালাঘরে আমরা দু-টি প্রাণী। রাত্তিরে যদি রামরামের হত্যাকারী আবার আসে তাহলে আমি অন্তত খুব আনন্দ পাব না।

বললাম—কবে আসবে?

বিশুঠাকুর হেসে বললেন—ভয় নেই, আজ আসবে না। সে বোকা নয়, সে জানে তার হাতে অঢেল সময় রয়েছে। আমরা কাল চলে গেলে সে যে কোনোদিন এসে ধীরেসুস্থে কাজ শেষ করে যাবার কথা ভাববে। একজন অসতর্ক মানুষকে খুন করা সোজা, কিন্তু ধুনী জ্বালিয়ে জেগে থাকা দু-জন মানুষকে আক্রমণ করা সহজ নয়—আর খামোকা করবেই বা কেন, যখন পরে নিরুপদ্রবে কাজটা সারা যেতে পারে?

একটু ভেবে বললাম—কিন্তু আমরা তো কাল চলে যাচ্ছি, তাহলে এ ফাঁদ পেতে লাভ কি? খুনি এলেই বা তাকে ধরবে কে? আর ধরলেই বা কি প্রমাণ হবে? রাত্তিরে এই চালাঘরের কাছে ঘুরঘুর করছিল, কাজেই সে রামরাম ঘোষালকে মেরেছে—এমন যুক্তি কি আদালত শুনবে?

বিশুঠাকুর যথার্থ বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন—আদালত? এর মধ্যে আদালত আসছে কোথা থেকে?

—তাহলে?

—পরে বলব। তুমি তো আমার সঙ্গে আছ, দেখতে পাবে।

চুপ করে বসে আছি, সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। বিশুঠাকুর আপনমনে গুনগুন করে একটা শ্যামাসঙ্গীত গাইছেন।

শিবরাম দুধ নিয়ে এল।

—ভয় করছে না তো ঠাকুরমশাই?

—নাঃ। মায়ের নামগান করছি। ভয় কি?

—দরকার হলে চেঁচিয়ে ডাকবেন কিন্তু, কেমন?

—নিশ্চয়। তুমি চিন্তা কোরো না।

শিবরাম চলে গেলে ঠাকুরমশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—শিবরামকে নিজে এসে দুধ দিয়ে যেতে বলেছিলাম কেন জানো?

—কেন?

—আমরা আসায় এ গ্রামের একজন নিশ্চয় স্বস্তি বোধ করছে না। সে কে, তা তো আমরা জানি না। তাই সাবধানে থাকাই ভাল। সামনে আক্রমণ না করলেও খাবারে বিষ মিশিয়ে দিতে বাধা কোথায়? দুধটা শিবরামের নিজের গরুর, নিশ্চিন্তে খেতে পারো—

—খাব?

—খাও। শিবরাম তার দাদাকে খুন করেনি।

—কি করে বুঝলেন?

—আমি বুঝতে পারি।

নিজের পোঁটলা থেকে একটা পেতলের ঘটি বের করে তাতে অর্ধেক দুধ ঢেলে নিয়ে মাটির ভাঁড়টা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—ধরো।

ঘটিতে একটা চুমুক দিয়ে বিশুঠাকুর বললেন—যে অন্যায় করে, মনে তার সবসময়ই ভয় থাকে—এই বুঝি ধরা পড়লাম! সবার দিকেই সে সন্দেহের চোখে তাকায়। তাই এই সাবধানতাটুকু নিতে হল। শুধু দুধ খেতে কষ্ট হচ্ছে, না?

লজ্জা পেয়ে বললাম—না না—

—আমারই ভুল। তুমি ছোকরা লোক, তোমার খিদে পেতেই পারে। কি খেতে ভালবাস তুমি?

হেসে বললাম—আমার এখন কিছু না হলেও চলবে। তবে একটু আগে মনে পড়ছিল ছোটবেলায় গ্রামের বিরিঞ্চি ময়রার দোকানের মাখা সন্দেশের কথা। মা দুধ আর মাখা সন্দেশ খেতে দিতেন মাঝেমাঝে, কোথায় গেল সে ছোটবেলা?

—মাখা সন্দেশ? মানে কাঁচাগোল্লা? ভাল মজা তো, আজই বিকেলে তোমার সঙ্গে দেখা হবার একটু আগে খানিকটা মাখা সন্দেশ কিনেছিলাম রাত্তিরে আর কিছু না জুটলে খাব বলে। আর তুমিও কিনা পৃথিবীতে এত জিনিস থাকতে মাখা সন্দেশ খেতে চাইলে। দাঁড়াও—

বিশুঠাকুর পোঁটলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা শালপাতার ঠোঙা বের করে আমার হাতে দিলেন।

ঠোঙার ভেতরে অনেকখানি কাঁচাগোল্লা।

ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বললাম—এটা আপনি বিকেলে কিনেছেন? আমার সঙ্গে দেখা হবার আগে?

—হ্যাঁ। কেন?

—এ সন্দেশ তো এখনো গরম রয়েছে।

একটু থতমত খেয়ে বিশুঠাকুর বললেন—বোঁচকার ভেতর ছিল তো, তাই গরম রয়ে গিয়েছে আর কি—

আপত্তি করে বললাম—তাই কখনও হতে পারে?

—হতে পারে নিশ্চয়, নইলে, হল কি করে? নাও, আর কথা না বাড়িয়ে খেয়ে ফেল দেখি। তারপর তুমি ঘুমোও, আমি জেগে থাকব।

শুয়ে শুয়ে অনেক রাত্তির অবধি দেখলাম বাঁশবনের মাথা দুলছে তারাভরা আকাশের পটভূমিকায়। ঘুম আসার আগে একবার জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, কেতুর কি হল বলুন দেখি?

গম্ভীর গলায় বিশুঠাকুর উত্তর দিলেন—কেতুকে হত্যাকারী মেরে ফেলেছে, সম্ভবত বিষ মেশানো খাবার দিয়ে। চেনা লোক বলে কেতু চেঁচামেচি করেনি, হাত থেকে খাবারও নিয়েছে। কিন্তু রামরামকে আঘাত করতে দেখলেই সে, আক্রমণ করত। কাজেই তাকে আগে সরানো একান্ত দরকার ছিল।

—দেহটা কোথায় গেল তাহলে?

—খুব সম্ভব শেয়ালে নিয়ে গিয়েছে। এসব অঞ্চলে সাবধানে দরজা দিয়ে না শুলে অনেকসময় ছোট শিশুকেও বিছানা থেকে শিয়ালে টেনে নিয়ে যায়।

আবার শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি, ঘুম আসে না। হঠাৎ আর একটা প্রশ্ন মাথায় আসতে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, আপনি কেতুর গায়ের রঙের কথা জিজ্ঞাসা করলেন কেন? এটা আমি কিন্তু বুঝতে পারিনি—

চটে গিয়ে বিশুঠাকুর বললেন—বেশ করেছি জিজ্ঞেস করেছি, কেবল প্রশ্ন করে! ঘুমোও না কেন বাপু—কোন্ ব্যাপারটাই বা এ অবধি বুঝতে পেরেছ?

ঠাকুরকে আর না ঘাঁটিয়ে বিনাবাক্যব্যয়ে পাশ ফিরে শুয়ে অচিরাৎ ঘুমিয়ে পড়লাম। সারারাত স্বপ্ন দেখলাম কেতু ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বিশুঠাকুরের হাত থেকে মাখা সন্দেশ খাচ্ছে।

পরের দিন সকালে আমরা শিবরামের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। সে আমাদের কয়েকটা দিন তার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণের জন্য বিস্তর অনুরোধ করেছিল, কিন্তু বিশুঠাকুর রাজি হলেন না। তাঁর নাকি কি কাজে আজই সিউড়ি রওনা হতে হবে, থাকার কোন উপায়ই নেই। পরে বরঞ্চ কখনও—ইত্যাদি।

শিবরাম, শ্রীদাম ঘোষ ইত্যাদি অনেকেই গ্রামের সীমানা পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেল।

স্টেশনের কাছে একটা নির্জন জায়গায় এসে বিশুঠাকুর দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—তারানাথ, এখন আমি যা বলছি খুব মনোযোগ দিয়ে শোন। আমরা সিউড়ি যাচ্ছি না, আমরা আজ এখানেই থাকব—আজকের দিনটা। তারপর রাত্তিরে আবার গ্রামে ফিরে যাব।

অবাক হয়ে বললাম—তার মানে?

—মানে এই, আমরা চলে গিয়েছি মনে করে রামরামের খুনী আজ রাত্তিরেই আমাদের পেতে আসা ফাঁদে পা দেবে। অত সোনা মাটির তলায় পড়ে আছে জেনে সে শান্তিতে ঘুমোতে পারবে না। মানুষের চরিত্র যতদূর বুঝেছি তাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস আর দেরি না করে আজ রাতেই সে আসবে। তাকে ধরতে গেলে ওই চালাঘরের পাশে জঙ্গলে আমাদের লুকিয়ে বসে থাকতে হবে।

—কিন্তু এ কাজ কি আমাদের দু-জনের দ্বারা সম্ভব? খুনীর হাতে তো অস্ত্রও থাকতে পারে। তাছাড়া আগে যা বলেছিলাম, কাউকে ধরলেও সেই যে খুন করেছে তা প্রমাণ করা যাবে না। ধরবার সময় দু-একজন সাক্ষীও থাকা ভাল—

—সব ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা রওনা হবার আগে বাড়ির মেয়েরা প্রণাম করতে চায় বলে শিবরাম আমাকে অন্দরমহলে নিয়ে গেল না? তখনই শিবরামকে আমি সমস্ত কথা খুলে বলেছি। শিবরাম, তার দুই জোয়ান ছেলে আর বাড়ির কয়েকজন কৃষাণ আজ রাত্তিরে না ঘুমিয়ে তৈরি হয়ে বসে থাকবে। আমাদের ডাক শুনলেই তারা দৌড়ে চালাঘরে এসে হাজির হবে। আপাতত দিনের বেলাটা আমরা ইস্টিশনে কোথাও ঘাপটি মেরে কাটিয়ে দিই এস—

এ রকম একটা খুনোখুনির ব্যাপারে আমার জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল না, আবার ঘটনার শেষটা দেখার জন্য নিদারুণ কৌতূহলও ছিল। ফলে থেকেই গেলাম। ভাল সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম, কারণ এর ফলে জীবনের এক অন্যতম আশ্চর্য অভিজ্ঞতা আমার লাভ হয়েছিল।

প্ল্যাটফর্মের শেষপ্রান্তে কয়েকবস্তা পাটের পেছনে বসে আমাদের দিনটা কেটে গেল। সন্ধ্যা নামতে বিশুঠাকুর উঠে গিয়ে স্টেশনের বাইরের মুদিখানা থেকে কিছু চিঁড়ে আর গুড় কিনে এনে আমাকে দিলেন।—নাও, তোমার আর রামরামের বাড়ি হয়ে যাবার কোন দরকার নেই, গ্রামের লোকে দেখে ফেলবে। একেবারে সোজা ওই চালাঘরের পুবদিকে আশশেওড়ার ঝোপের পেছনে বসে থেকো। ভয় নেই, আমি সময়মত পৌঁছে যাব—

—সে কি! আপনি আমার সঙ্গে যাবেন না?

—না। দু-জনে একসঙ্গে গেলেই লোকের নজরে পড়বার সম্ভবনা। তুমিও সোজাপথে গ্রামে ঢুকো না, গ্রাম ছাড়িয়ে চলে গিয়ে পেছনের আমবাগান দিয়ে চালাঘরের কাছে চলে যেয়ো।

তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—আরে! তুমি ভয় পাচ্ছ নাকি? শোন, বিশ্বেশ্বর ভট্‌চায যাকে বলেছে ভয় নেই, তার সত্যিই কোন ভয় নেই। যাও—

লোকটার যাদুকরী ব্যক্তিত্ব আছে। আমি একলা যেতে রাজি হয়ে গেলাম।

অন্ধকারে অচেনা পথে ছ'মাইল হাঁটতে সময় লাগে। রামরাম ঘোষালের চালাঘরের পুবদিকে আশশেওড়ার ঘন ঝোপের পেছনে যখন গুছিয়ে বসলাম তখন বেশ রাত হয়েছে, অন্তত পল্লীগ্রামে একেই রাত বলে। দূরে কোথাও সংকীর্তন হচ্ছিল, ক্রমে তাও বন্ধ হয়ে গেল। বাঁশঝাড়ে মাটির ওপর পড়ে থাকা শুকনো বাঁশপাতার ওপর দিয়ে মাঝে মাঝে খস্‌খস্ করে কী যেন যাতায়াত করছে—তাছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নেই। চুপ করে বসে আছি।

কিন্তু কিচ্ছু না করেই বা কতক্ষণ বসে থাকা যায়? রাত কত হল কে জানে? বিশুঠাকুরই বা আসছেন না কেন? আমাকে এরকম বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে তাঁর কি এত দেরি করা উচিত হচ্ছে? মশাও কামড়াচ্ছে বেশ। কিন্তু পাছে শব্দ হয় সেই ভয়ে চাপড় দিয়ে মশা মারতে পারছি না, হাত নেড়ে নেড়ে তাড়াচ্ছি। নিজের ওপর বেশ রাগও হচ্ছে। জীবনে অনেক কিছু করেছি বটে, কিন্তু কখনও একজন অচেনা হত্যাকারীকে ধরব বলে রাত্তিরবেলা সাপখোপের ভয় উপেক্ষা করে মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে ঝোপের আড়ালে বসে থাকিনি।

এভাবে বহুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর আমার সত্যিই খুব ভয় করতে লাগল। ব্যাপার কি? স্টেশন থেকে ছ-মাইল পথ হেঁটে আসতে যতক্ষণই লাগুক, তাতে এত দেরি হতে পারে না। বিশুঠাকুরের কি হল? আমার কাছে কড়ি না থাকলেও আন্দাজ করতে পারছি রাত অনেক হয়েছে। একা এইভাবে বসে থাকা বিপজ্জনকও বটে। উঠে শিবরামের বাড়ির দিকে চলে যাব কি? কিন্তু ধরা যাক আমিও উঠলাম, আর ওদিক থেকে রামরাম ঘোষালের হত্যাকারী এসে হাজির হল—সেটাই বা কি এমন সুখকর ব্যাপার হবে? তার চেয়ে বরং চুপ করে এভাবে বসে থাকাই ভাল। যদি বিশুঠাকুর না আসেন, অথচ রামরামের হত্যাকারী এসে উপস্থিত হয়, তাহলে সে সমস্তটা ঘরের মেঝে থেকে উঠোন অবধি খুঁড়ে ফেললেও আমি চেঁচাব না।

তখনও জানি না আমার জীবনের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতার মুহূর্ত কত কাছে এসে গিয়েছে।

নাকের ফুটোয় একটা মশা ঢুকে পড়ায় হাঁচি এসেছিল, প্রাণপণে হাত মুঠো করে, চোয়াল শক্ত করে সজোরে হেঁচে ফেলবার ইচ্ছে দমন করবার চেষ্টা করছি—এমন সময় আমি যেখানে বসে আছি তার উল্‌টো দিক দিয়ে, অর্থাৎ বাঁশবাগানের পাশের জঙ্গল ঠেলে সন্তর্পণে কার আসবার আওয়াজ পেলাম।

হাঁচি আপনিই বন্ধ হয়ে গেল।

বিশুঠাকুর এলেন কি?

কিন্তু তিনি এলে আমি যে পথে এসেছি সেই পথে মাঠের মধ্যে দিয়ে ঘুরে আসবেন, নয়তো শিবরামের বাড়ির থেকে সুঁড়িপথটা ধরে আসবেন—কিন্তু ও রাস্তায় নয়। ওটা তো গ্রামের ভেতর থেকে আসবার রাস্তা।

রামরাম ঘোষালের চালাঘরটা অন্ধকারের স্তূপের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। জঙ্গল ভেদ করে তার পাশে ফুটে উঠল একটা ছায়ামূর্তি, বেশ লম্বামত, হাতে সম্ভবত একখানা শাবল। লোকটা সন্দিগ্ধভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। আমি যেভাবে যেখানে বসে আছি, তাতে আমাকে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু প্রচণ্ড ঝুঁকির কাজে প্রবৃত্ত হলে মানুষের স্নায়ু একধরনের বিশেষ সংবেদনশীলতা লাভ করে। তাই দিয়ে লোকটা হয়ত অনুভব করেছে আজ রাতে এ জায়গা তার পক্ষে নিরাপদ নয়।

ততক্ষণে আমি লোকটাকে চিনে ফেলেছি।

হরিপদ!

কি নৃশংসতা মানুষ টাকার লোভে করতে পারে! বাবার বন্ধুকে হত্যা করতে তার হাত কাঁপেনি, আবার আজ এসেছে সোনার লোভে।

হরিপদর মনোবল বোধহয় ভেঙে পড়ল। ইতস্তত করে সে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ করছে। আমার চুপ করে দেখে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এমন সময় আমার বাঁদিকে খুব কাছে ঝোপের মধ্যে একটা আওয়াজ শুনে চমকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম, বুকের মধ্যে বিস্ময়ে আর আতঙ্কে ঢেউ খেলে উঠল।

কখন যেন আমার ঠিক গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে একটা বাঘের মত মিশমিশে কালো কুকুর। তার প্রগাঢ় নিঃশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। একদৃষ্টে সে ঝোপের ফাঁক দিয়ে হরিপদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

হরিপদও বোধহয় কিছু শুনতে পেয়েছিল। সে ফিরে দাঁড়িয়েছে, তার সমস্ত শরীর শক্ত, শাবলটা শক্ত করে ধরে আছে।

একটা গম্ভীর গর্জন করে কুকুরটা লাফিয়ে গিয়ে হরিপদর সামনে খোলা উঠোনে পড়ল। একবার সেদিকে তাকিয়েই মহাতঙ্কে তীব্র আর্তনাদ করে উঠল হরিপদ। আমি এমন রক্তজমানো ভয়ের আর্তনাদ আর কখনো শুনিনি। সঙ্গে সঙ্গে হরিপদ হাতের শাবলটা সজোরে ছুঁড়ে দিল কুকুরটার দিকে। ভারী লোহার শাবল ডানপায়ের থাবায় এসে লাগতেই কুকুরটা আর একবার তীব্র গর্জন করে হরিপদর ওপর লাফিয়ে পড়ল।

সুঁড়িপথের দিকে কাদের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, বেশ অনেক মানুষের কণ্ঠ। এতক্ষণে কি এলেন বিশুঠাকুর?

আমি ততক্ষণে উত্তেজনায় আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি, কেন যেন বুঝতে পেরে গিয়েছি হরিপদকে আর ভয় করবার কোন কারণ নেই।

শিবরামের গলা শোনা যাচ্ছে—ভয় নেই ঠাকুরমশাই, এই যে আমরা সবাই এসে পড়েছি!

এদিকে উঠোনে মাটিতে পড়ে দু-হাত দিয়ে আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা করছে হরিপদ, কি এক অপার্থিব আতঙ্ক দেখে যেন তার নিজের পেশীর ওপর সব কর্তৃত্ব চলে গিয়েছে। তার বুকের ওপর শরীরের উর্ধ্বাংশ চাপিয়ে দিয়ে গলায় দাঁত বসাবার সুযোগ খুঁজছে কুকুরটা, ডানথাবা দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে, সেদিকে তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

আমার পাশে লোকজন নিয়ে পৌঁছে গিয়েছে শিবরাম, গ্রামের আরও লোকজন ছুটে আসছে, তাদেরও গলার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

কুকুরটার দিকে একবার তাকিয়েই শিবরাম চিৎকার করে উঠল—কেতু! তুই কোথা থেকে এলি?

কেতু তখন হরিপদর টুঁটি কামড়ে ধরেছে, হরিপদর দু-হাত অবশ হয়ে এলিয়ে পড়েছে দু-দিকে। কেবল পা-দুটো পর্যায়ক্রমে মৃত্যুবিক্ষেপে সামনে পেছনে নড়ে অদৃশ্য কি একটা বস্তু যেন ঠেলে দেবার চেষ্টা করছে।

শ্রীদাম ঘোষ সহ গ্রামের আরও অনেকে এসে পড়ে বিস্তারিত চোখে উঠোনের ভয়াবহ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে।

শিবরাম বলল—কিন্তু লোকটা কে? হরিপদ না?

বললাম—হ্যাঁ।

এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পেয়ে শিবরামের কৃষাণেরা লাঠি উচিয়ে তাড়া করে গেল। কেতু সরে গিয়ে মুখ তুলে তাকাল একবার। তার কষ বেয়ে গড়াচ্ছে তাজা রক্ত।

তারপরই একলাফে কেতু পাশের ঝোপে পড়ে মিলিয়ে গেল। শোনা গেল শুকনো বাঁশপাতার ওপর তার পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

কৃষাণেরা যখন ধরাধরি করে হরিপদর দেহ রামরাম ঘোষালের চালাঘরের দাওয়ায় এনে রাখল, তখন সে দেহে আর প্রাণ নেই।

শিবরাম বলল—শেষে হরিপদ এই কাজ করল। দাদা ওকে নিজের ছেলের মতন ভালবাসতেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ঠাকুরমশাই কোথায়?

—তিনি তো আপনার সঙ্গে ছিলেন, আপনার সঙ্গেই থাকবার কথা। আপনি জানেন না?

বিশুঠাকুর আর এলেনই না। পরের দিন সকালে আমিও স্টেশনের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। আর থেকে কি হবে? পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে—এবার তাদের কাজ তারা করবে। কোন মামলাও বোধহয় হবে না এ নিয়ে। অন্তত ত্রিশজন গ্রামাবাসী ঘটনাটা নিজের চোখে দেখেছে—পাগলা কুকুরের আক্রমণে জনৈক গ্রামবাসীর করুণ মৃত্যু। মামলা আর কি হবে?

কিন্তু কেতু এল কোথা থেকে?

উত্তরটা পেলাম বিশুঠাকুরের সঙ্গে দেখা হবার পর। তিনি পরম প্রশান্তমুখে প্ল্যাটফর্মের চায়ের দোকানে বসে গরম চা খাচ্ছিলেন—আমাকে দেখে বললেন—এই যে তারানাথ এসো। চা খাবে? আমার আর কালকে যাওয়া হল না, বুঝলে? তুমি চলে যাবার পর—বললে বিশ্বাস করবে না—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একঘুমে একদম রাত কাবার। জেগে দেখি ভোর হয়ে এসেছে। ভাবলাম আর এতটা পথ হেঁটে কি হবে? তুমি নিশ্চয় এসে পড়বে সকালে। তা কি হল বল রাত্তিরে? খামোকা জাগতে হোল তো?

নিতান্ত গা জ্বালা করা সত্ত্বেও সমস্ত ঘটনাটা তাঁকে বললাম। তাঁর বিশেষ কোনো ভাবপরিবর্তন হল বলে মনে হল না। চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে পেয়ালা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন—যাঃ! শেষ অবধি হরিপদর এই কাজ! ব্যাটা একেবারে নরাধম, ঠিক শাস্তি হয়েছে।

—আপনি বলেছিলেন কেতু মারা গেছে।

—ভুল বলেছিলাম। বেঁচে আছে তো দেখাই যাচ্ছে। যাক্ গে, ট্রেনের প্রথম ঘণ্টা পড়ছে—টিকিট কাটো গে যাও।

একটু চুপ করে থেকে বললাম—আমি আপনার সঙ্গে আর যাব না—

—কোথায় যাবে তবে?

—কোলকাতার দিকে যাব। কাজ আছে।

বিশুঠাকুর হেসে বললেন—বেশ, তাই যেয়ো। আমাকে ট্রেনে তুলে দাও অন্তত। তোমার গাড়ির তো দেরি আছে।

গাড়িতে তুলতে গিয়ে খেয়াল করলাম বিশুঠাকুর খোঁড়াচ্ছেন, ডানপায়ের পাতায় ন্যাকড়ার পট্টি বাঁধা।

আমার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে এল, বললাম—একি! আপনার পায়ে কি হয়েছে? কাল বিকেলেও তো দেখিনি—

বিশুঠাকুর বললেন—ও কিছু নয়, প্ল্যাটফর্মের বেড়া পার হতে গিয়ে কাঁটা-তারে লেগে কেটে গিয়েছে।

আমি একদৃষ্টে বিশুঠাকুরের ডানপায়ের পট্টির দিকে তাকিয়ে আছি। হরিপদর সেই আর্তনাদ, শাবল ছুঁড়ে মারা—কেতুর ডানপায়ে রক্তের ধারা! তবে কি—

ট্রেন ছেড়ে দিল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিশুঠাকুর হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। সেই শেষ, আর কখনও তাঁকে দেখিনি।

সেদিন বিকেলে তারানাথের বাড়ি গিয়ে দেখি সে বাইরের ঘরে তক্তাপোশের ওপর বসে তামাক খাচ্ছে। চোখমুখ উদাস। মাঝে মাঝে তারানাথের এ ধরনের ভাবপরিবর্তন দেখেছি, দু-চারদিন থাকে, তারপর আবার ঠিক হয়ে যায়। বললাম—কি, মন খারাপ নাকি?

আমি যে ঘরে ঢুকেছি তা বোধ হয় তারানাথ লক্ষ্যই করেনি, একটু চমকে উঠে বলল—ও, তুমি! এস, বোস ওইখানটায়। না মনখারাপ নয়, অনেকদিন আগেকার কথা ভাবছিলাম—ছোটবেলার কথা। পুরনো দিনের কথা মনে এলে একটু মন খারাপ তো হয়ই, না? কিশোরী এল না যে?

—আসবে। তাকে সকালে বলে রেখেছি, অফিসের পরে সোজা এখানে চলে আসবে।

নাম করতে করতেই কিশোরী এসে পড়ল। —কি, গল্প শুরু হয়ে গিয়েছে নাকি?

তারানাথ বলল—না, বোসো। তোমার কথাই হচ্ছিল। আজ গল্প বলার মেজাজ নেই, আর একদিন হবে'খন। চা খাবে?

বাড়ির ভেতরে গিয়ে চায়ের কথা বলে এসে তারানাথ আবার তক্তাপোশে বসে হুঁকো টানতে লাগল। আমি আর কিশোরী জানি "গল্প হবে না" কথাটার বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। অপেক্ষা করলে একটা ভাল গল্প বেরিয়ে আসতেও পারে।

কয়েকটা ব্যর্থ টান দিয়ে বিরক্তমুখে হুঁকো নামিয়ে রাখতে রাখতে তারানাথ বলল—দুত্তোরি! এটা আবার গেল নিবে! বোস তোমরা, চারিকে বলে আসি একছিলিম সেজে দিতে—

কিশোরী পকেট থেকে নতুন পাসিং শো-এর প্যাকেট বের করে (মাসের প্রথম, এ সময়টা আমরা একটু নবাবী করেই থাকি) তক্তাপোশে রেখে বলল—বসুন ঠাকুরমশাই, বারবার উঠতে হবে না, সিগারেট খান—

তারানাথ উজ্জ্বলমুখে একটা সিগারেট বের করে ধরাতে ধরাতে বলল—সে বরং ভাল। হুঁকো-কল্‌কে আমাদের দেশে আর চলবে না, বুঝলে? কত ফৈজৎ, তামাক-টিকের যোগাড় রাখ, ঠিক্‌রে লাগাও—ছিলিম সাজ, একঘণ্টা ধরে ফুঁ দাও—নাঃ, সিগারেটই ভাল—

চোখ বুঁজে সিগারেটে টান দিতে দিতে একটু পরে তারানাথ বলল—তবে কি জানো? তামাকের মৌজ সিগারেটে নেই। এই যে সোঁদা সোঁদা গন্ধ, কড়া ধাঁক, গুড়ুক গুড়ুক শব্দ—সব মিলিয়ে একটা দারুণ আমেজ। তারপরে ধরো, ঠিক্‌রে গুঁজছি, তামাক আর টিকে সাজাচ্ছি, মনোযোগ দিয়ে ফুঁ দিচ্ছি, আর মনের ভেতর "এই হয়ে গেল—এক্ষুনি আমি তামাক খাব"—এই ভাব। সেটাও একরকমের মেজাজ, ওই অপেক্ষাটা। আর সিগারেট কি, না—এই ধরালাম, দু-দশটা টান দিয়ে ফেলে দিলাম—চুকে গেল। তা মানুষের হাতে সময় কমে আসছে, করবে কি? এই সিগারেটই বাজার দখল করবে দেখ—

কিশোরী বলল—পুরনো দিনের কথা ভাবছিলেন বললেন না? আপনার ছোটবেলার ঘটনাই বলুন না, শোনা যাক্—

ছাইদানি হিসেবে ব্যবহৃত নারকোলের মালায় সিগারেটের দগ্ধাবশেষ গুঁজে দিয়ে তারানাথ বলল—সে তো আর একটা টানা গল্প নয়, কত বছর ধরে টুকিটাকি কত কিছু ঘটেছে, আমার কাছে সে-সবের গভীর মূল্য আছে—কিন্তু তোমাদের ভাল লাগবে কেন?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, তন্ত্রসাধনার দিকে প্রথম আপনার ঝোঁক আসে কি করে?

—সে তো তোমাদের বলেছি, গ্রামের বাঁধানো গাছতলায় সেই সাধু, তারপর বীরভূমের শ্মশানের সেই মাতঙ্গিনী—সে আবার ডামরতন্ত্রে সিদ্ধ ছিল, কিংবা বরাকর নদীর ধারের সাধুজী, যার 'পঞ্চমুণ্ডী' আসনে বসে মধুসুন্দরী দেবীকে দেখতে পাই। এদেরই প্রভাবে এ পথে আসি—এ গল্প তো তোমরা শুনেছ।

বললাম—কিন্তু তারও আগে? একেবারে ছোটবেলায় কবে বুঝলেন যে আপনার জীবনটা ঠিক অন্য সবার মত হবে না?

তারানাথ দুই আঙুলে ভ্রূ-র মাঝখানটা টিপে ধরে রইল কিছুক্ষণ, তারপর মুখ তুলে আস্তে আস্তে বলল—জন্মের সময় থেকেই বোধ হয় ঈশ্বর আমার জীবনের গতিপথ নির্ণয় করে দিয়েছিলেন। আমি যখন ভূমিষ্ঠ হই সেই মুহূর্তে আকাশ দিয়ে একটা বিরাট উল্কা ছুটে গিয়েছিল। মা আঁতুড়ঘরে, গ্রামের বৌ ঝি-রা তাঁকে ঘিরে বসে রয়েছে, বাবা পায়চারী করছেন দক্ষিণের বারান্দায়। গরমজল নেবার জন্য সিন্ধুবালা দাই আঁতুড়ঘর থেকে উঠোন পেরিয়ে রান্নাবাড়ির দিকে আসছিল। সে-ই হঠাৎ আকাশে আশ্চর্য আলো দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ওঠে। তার ডাকে বাড়ির সবাই উঠোনে এসে জড়ো হল। অদ্ভুত নীল আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত করে একটা নীল আগুনের গোলক পূবদিক থেকে পশ্চিম দিগন্তের দিকে চলে যাচ্ছে। সাধারণত উল্কা জ্বলে উঠেই চকিতে মিলিয়ে যায়, লোকজন ডেকে এনে দেখবার অবকাশ পাওয়া যায় না। এই নীল আলো কিন্তু অনেক—অনেক ওপর দিয়ে বেশ সময় নিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে, ধূমকেতুর মত একটা অস্পষ্ট স্বতঃপ্রভ ধোঁয়ার পথরেখা ফেলে যাচ্ছে পেছনে।

পশ্চিমদিগন্তে নীল উল্কা মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি ভূমিষ্ঠ হই।

এ গল্প পরে বড় হয়ে সবার মুখে শুনেছি। সে বয়েসটা একটা অদ্ভুত বয়েস, বুঝলে? রেড়ির তেলের প্রদীপ, ছোট ছোট ফোঁড় দেওয়া পদ্মকাঁথা, আরামদায়ক রোদ-ঝিম্‌ঝিম্‌-করা নির্জন দুপুর, উঠোনের চাটাইতে শুকোতে দেওয়া টোপাকুলের ভরপুর গন্ধ, রাত্তিরে জ্যোৎস্নায় চক্‌চক্‌ করা নারকোল গাছের পাতা—সে সময়ে সবই সম্ভব ছিল। সমবয়েসীদের সঙ্গে বনতো না, তাদের খেলাধুলো কথাবার্তা কেমন অর্থহীন আর হাস্যকর বলে মনে হত। একা একা বেড়াতাম মাঠে-বনে, গ্রামের বাইরে যাবার পথে চৌধুরীদের বাঁশবাগানে। একটা জিনিস খুব অনুভব করতাম, এখনো ভাবলে মন উদাস হয়ে যায়। ধরো, খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ির সকলে দুপুরের ঘুম দিচ্ছে, আমি বেরিয়ে চলে গিয়েছি সাঁতরাদীঘির পারে। চুপ করে বসে আছি। ঝিরঝিরে বাতাসে দীঘির জলে ডুরে ডুরে ঢেউ উঠেছে। লিচু আর জামরুল গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে মাটিতে রোদ আর ছায়ার আলপনা তৈরি করছে—আমগাছের গুঁড়ি বেয়ে উঠছে একসারি কাঠপিঁপড়ে। এইসব নির্জন মুহূর্তে, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, স্পষ্ট শুনতে পেতাম গাছপালা, মাটি, দীঘির জল আমার সঙ্গে কথা বলছে। ঠিক কোন ভাষা দিয়ে নয়, সে ভাষা ওদের নেই। এ অনেকটা গানের সুরের মত—কিম্বা তাও ঠিক নয়, এমন একটা কিছু—যা মন দিয়ে বোঝা যায় কিন্তু মুখ দিয়ে বলা যায় না। পরে সাধনা করতে গিয়ে দেখেছি উচ্চকোটির তন্ত্রসাধকেরাও স্বীকার করেছেন যে, আমরা যাদের নির্জীব পদার্থ ভাবি তাদেরও প্রাণ আছে চেতনা আছে। এখন ভাবলে বিস্মিত হই, তখন কিন্তু ব্যাপারটাকে খুবই স্বাভাবিকভাবে নিয়েছিলাম। ভাবতাম, সবাই বুঝি আমার মতই ওদের কথা শুনতে পায়।

একদিন দুপুরে খেলা করতে করতে চলে গিয়েছি গ্রামের বাইরের মাঠে। কেউ কোথাও নেই, শূন্য মাঠের ওপর রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করছে। গ্রামের ঠিক প্রান্তে একটা বিরাট চটকাগাছ। সেই

চটকাগাছের নিচে একজন লোক বসে আছে। কুচকুচে কালো রঙ, খালি গা। হাতে একটা পাঁচনবাড়ি। সম্ভবত সে শুয়োর চরায়, কারণ এদিক ওদিকে কয়েকটা শুয়োর চরে বেড়াচ্ছে দেখলাম।

দৃশ্যটা অতি সাধারণ। গ্রামের অনেক গরিব মানুষেরা শুয়োর চরিয়ে দিনাতিপাত করে, তাদের এইরকমই দেখতে এবং তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে গাছতলায় বসে বিশ্রামও করে। কাজেই অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। কিন্তু কেন যেন লোকটাকে ভাল করে দেখবার জন্য আমি পায়ে পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেলাম।

আমি কাছে যেতেই লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। কি তার চোখের প্রখরতা। ভাল করে তাকান যায় না। যেন ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলছে। আঁটোসাঁটো দৃঢ় শরীরের মধ্যে সে যেন নিজেকে আটকে রাখতে পারছে না, প্রাণশক্তি উপচে পড়ছে শরীর ছাড়িয়ে। আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল—এস, তোমার জন্যই বসে আছি।

অবাক হয়ে বললাম—আমার জন্য?

—হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে কথা বলবার জন্যই আজ আমাকে পাঠান হয়েছে। বোস।

—কে পাঠিয়েছে?

—সে বললে এখন তুমি বুঝবে না, বড় হলে নিজেই জানতে পারবে। এদিকে এসো তো, কাছে এসো—

আমার ঠিক ভয় করছিল না, বরং কেমন যেন রহস্যময় আনন্দের অনুভূতি হচ্ছিল। লোকটার কাছে এগিয়ে যেতে সে আমার কপালে হাত দিয়ে কি যেন দেখতে লাগল, তারপর খুশি হয়ে বলল—ঠিক আছে, বোস ওই শেকড়টার ওপরে।

বসলাম। দু-একটা দুষ্টু শুয়োর দল ছেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, নিজেদের মধ্যে মারামারির উদ্যোগ করছিল। লোকটা পাঁচনবাড়ি তুলে বিচিত্র এক হুঙ্কার দিল—এ্যাও! সাবধান, আমি জেগে আছি! ঠিক হয়ে চল—

শুয়োরগুলো মন্ত্রমুগ্ধের মত ঠেলাঠেলি বন্ধ করে একজায়গায় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম তার হাতের পাঁচনবাড়িটা কোন গাছের ডাল বা কঞ্চি দিয়ে তৈরি নয়—কিসের যেন সরু হাড় সেটা!

বললাম—কোথায় থাক তুমি? এ গাঁয়ে তো দেখিনি তোমাকে।

সে বলল—এ গাঁয়ে থাকি না, তাই দেখনি।

—তাহলে?

লোকটা তার প্রখর দৃষ্টিতে একবার চারদিকে তাকাল। সূর্যের আলো সরাসরি তার মুখে এসে পড়েছে, আকাশে উড়তে উড়তে একটা চিল ডাকছে কর্কশ, তীক্ষ্ণ স্বরে। সেই রৌদ্রালোকিত আকাশ, দিগন্ত আর পৃথিবীর দিকে লোকটা দু-হাত ছড়িয়ে দিয়ে বলল—এই সবকিছুর মধ্যে আমার থাকার জায়গা। অল্প জায়গায় আমাকে ধরে না যে!

আমি তার কথা ঠিকঠাক বুঝতে পারলাম না। একজন লোক একটা বাড়িতে থাকবে এটাই নিয়ম। সব জায়গায় সে থাকে কি করে? বললাম—তুমি শুয়োর চরাও?

লোকটা চমকে বলল—কই, না তো!

—এগুলো তোমার শুয়োর নয়?

সে একবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা শুয়োরগুলোর দিকে দেখল, তারপর বলল—কিন্তু এরা তো কেউ শুয়োর নয়—

আমার তখন দৃঢ় ধারণা হয়েছে লোকটা বদ্ধ পাগল। হ্যাঁ ঠিক তাই। সেজন্যেই এর কথাবার্তা কেমন কেমন, চাউনি অমন অদ্ভুত। আর তাছাড়া পরিষ্কার দেখছি অতগুলো শুয়োর দাঁড়িয়ে রয়েছে, তবু মানতে হবে ওরা শুয়োর নয়? ওগুলো কি তবে শেয়াল?

লোকটা বলল—তুমি ছোটো তো, তোমাকে এখন বোঝান অসুবিধে হবে। এগুলো সত্যিই শুয়োর নয়। এগুলো হচ্ছে—কি বলি—আমাদের ভেতরে যে দোষগুলো থাকে, যাদের জন্য আমরা খারাপ কাজ করি, খারাপ কথা ভাবি—এরা হচ্ছে সেইসব দোষের বাইরের চেহারা। সাধারণ মানুষকে এরা চরিয়ে বেড়ায়, কিন্তু আমি এদের চরাবার বিদ্যা শিখেছি—

দুটো শুয়োর আবার মারামারির উদ্যোগ করছিল, লোকটা সরু হাড়ের লাঠি তুলে গর্জন করে উঠতেই তারা চুপ করে গেল।

লোকটা এবার যেন একটু ব্যস্ত হয়ে বলল—নাঃ, কথায় কথায় অনেক দেরি হয়ে গেল। আমার ফিরে যাবার সময় হয়েছে। যে জন্য আসা সেটা তাড়াতাড়ি সেরে নিই। এদিকে এগিয়ে এসো তো খোকা, কোন ভয় নেই, এসো—

কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম—কেন?

সে বলল—আমি তোমাকে একটু মনখারাপ দিয়ে যাব।

আমার দুই কাঁধ ধরে নিজের দিকে টেনে নিয়ে লোকটা অস্বাভাবিক জোরে, প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল—আমার চোখের দিকে তাকাও!

আমি তার চোখের দিকে তাকালাম।

হঠাৎই মানুষটার চোখ যেন দুটো জানালা হয়ে গিয়েছে। ভেতরে কতদূর অবধি দেখতে পাচ্ছি। ওখানে যেন আর একটা জগৎ, এ রকমই রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করছে দিগন্ত অবধি বিছিয়ে থাকা মাঠে। সবুজ বন, নীল পাহাড় থেকে ঝুরঝুর করে ঝরনা নেমে আসছে—মেঘে আর কুয়াশায় ঢাকা ওই পাহাড়ে কবে যেন আমি থাকতাম। সুতোর কাটিম উলটোদিকে ঘুরে যাওয়ার মত বিস্মৃতির আড়াল থেকে কত পুরনো, মহাকালের স্তরে স্তরে সঞ্চিত ভুলে যাওয়া কথা মনে পড়ে যেতে লাগল। ক্রমে আমার সমস্ত চেতনা ওই দুই চোখের জানালার ভেতর দিয়ে আশ্চর্য জগৎটার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। আমাদের গ্রামের সীমানায় চটকাগাছটা, চিলের তীক্ষ্ণ ডাক, সামনে পড়ে থাকা কইখালির বিশাল মাঠ—সব কোথায় মিলিয়ে গেল। এখন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সে জগতে ছায়াবাড়ির মত অজস্র ছবি মেলে যাচ্ছে চোখের সামনে দিয়ে। কোথায় যেন এক উন্নতশীর্ষ মন্দির, শেষবেলার আলোয় তার চূড়ার সোনার পদ্ম ঝলসে উঠছে। কাদের হাসিমুখ—এরা আমাকে খুব ভালবাসত, কিন্তু এখন মিলিয়ে গিয়েছে দূর অতীতে। কানে ভেসে আসছে সমস্বরে উচ্চারিত মন্ত্রধ্বনির মত একটানা উদার-গম্ভীর সংগীতময় শব্দপ্রবাহ। সব ছবি মিলিয়ে গিয়ে চোখের ওপর ভেসে উঠছে সৃষ্টিপূর্ব আদিম অন্ধকারের মত কালো মহাশূন্য—থেকে থেকে সেই পরম কিছু না-র মধ্যে চমকে উঠছে তীব্র জ্যোতির উল্লাস, সৃষ্টি হচ্ছে নক্ষত্রের, নীহারিকার, অনন্ত শূন্যের থেকে বস্তুপুঞ্জের। আমার চেতনা চলে যেতে লাগল, আর কিছুক্ষণ এখানে থাকলেই আমি সম্পূর্ণ জ্ঞান হারাব। ঠিক তখনই অনুভব করলাম চিরচেনা পৃথিবীর বিপুল আকর্ষণে আমি ফিরে আসছি আমাদের গ্রামের প্রান্তের রোদে পোড়া মাঠে। লোকটার চোখের জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসবার সময় শেষবারের মত তাকিয়ে দেখলাম সেই নিকষ কালো অনন্তস্পর্শী মহাশূন্যের বুক চিরে চলে যাচ্ছে একটা নীল উল্কা।

চটকাগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে আমি মুহ্যমানের মত বসে রইলাম, মাঠের ওপর দিয়ে তার শুয়োর তাড়িয়ে নিয়ে লোকটা কোথায় যেন চলে গেল। সে কোথায় যাচ্ছে, কি করে আবার দেখা হবে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হল না।

কিন্তু কি মনখারাপই সে আমাকে দিয়ে গেল!

এরপর আমার আর কিছু ভাল লাগত না। একা তো ছিলামই, আরও একা হয়ে গেলাম। সবসময় মনে হত কি একটা কাজ যেন ফেলে রেখেছি, কোথায় যেন আমাকে চলে যেতে হবে।

প্রথম যৌবনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি, সে কথা তোমাদের বলেছি। বীরভূমের শ্মশানে মাতু পাগলী আমাকে সম্মোহিত করে নানা দৃশ্য দেখিয়েছিল। আমি যেন নদীর জলে নেমে গাছের শেকড়ে আটকে থাকা মৃতদেহ তুলে এনে পূজার উপকরণ সংগ্রহ করে শবসাধনায় বসলাম। সারারাত কত আতঙ্কজনক দৃশ্য দেখলাম, কত উপদ্রব ঘটল। পরে সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখি ধূসর সন্ধ্যায় নির্জন শ্মশানে দাঁড়িয়ে আমি মাতু পাগলীর সামনে—মাত্র দশমিনিট সময় কেটেছে। এ তো গেল ভেল্‌কি, কিন্তু সদ্‌গুরুর সাহায্যে আমি প্রকৃতই একবার শবসাধনা করেছিলাম। মুর্শিদাবাদ জেলার এক অজ পাড়াগাঁয়ের শ্মশানে তখন আস্তানা গেড়েছি—সঙ্গে গুরু রয়েছেন। জ্যৈষ্ঠের শেষে আশেপাশের গ্রামগুলোতে কলেরার মহামারী শুরু হল। সারাদিন ধরে দূর দূরান্ত থেকে মৃতদেহ দাহ করতে আনছে লোকে। পরে এমন অবস্থা দাঁড়াল, দাহ করার কাঠ জোটে না। মুখে আগুন ছুঁইয়ে দেহ ফেলে শ্মশানবন্ধুরা পালায়। তারই ভেতর থেকে লক্ষ্মণযুক্ত একটি মৃতদেহ একদিন তুলে নিয়ে এলাম। শ্মশানের পূর্বপ্রান্তে একটু জঙ্গলমত জায়গা, সেখানে বিরাট একটা ঝাঁকড়া ছাতিমগাছ রয়েছে। তারই তলায় গুরু পূজার আয়োজন করলেন। রাত্তিরে দাহ করার জন্য দলবল এলেও এদিকে তারা ঘেঁসবে না।

আমি ভেবেছিলাম গুরুই বোধহয় শবাসনে বসবেন। কিন্তু প্রাথমিক প্রকরণের শেষে গুরু যখন আমাকে পদ্মবীজের মালা ধারণ করতে বললেন, তখন অবাক হয়ে বললাম—আমি কেন?

—তুমিই তো আসনে বসবে?

—আমি। আমি কি পারব?

—নিশ্চয় পারবে, আমি তোমাকে আমার শক্তির অংশ দান করব। তাছাড়া এ আমার কাছে নতুন নয়, একুশ বছর আগে আমি এতে সিদ্ধিলাভ করেছি। আজকের ক্রিয়ায় তোমারই অধিকার।

ঘোর অমাবস্যার মধ্যরাত্রি। গুরু আমাকে আসনে বসিয়ে দিয়ে 'সকালে আসব' বলে চলে গেলেন। শব সাধনার সময় সামনে অন্য সাধকের উপস্থিত থাকতে নেই।

সাষ্টাঙ্গ প্রণামের ভঙ্গিতে উপুড় করে শোয়ানো মৃতদেহের পিঠের ওপর বজ্রাসনে বসে বীজমন্ত্র জপ আরম্ভ করলাম। মনে কোন ভয় নেই। বহুদিন হল তান্ত্রিক সাধুসঙ্গ করছি, অনেক অস্বাভাবিক আর অলৌকিক ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে দেখেছি। আমি জানি নিখুঁতভাবে দেহশুদ্ধি করে আসনে বসলে কোন বিপদ সাধককে স্পর্শ করে না।

ঘণ্টাখানেক একমনে জপ চালাবার পরে অনুভব করলাম নিচে মৃতদেহটা যেন নড়ে উঠছে, তাতে প্রাণের স্পন্দন জেগেছে। পোড়া মাছ গুঁজে দিলাম শবের মুখে, নরকপাল থেকে একটু একটু করে কারণ ঢেলে দিতে লাগলাম। শব আবার শান্ত হয়ে এল। আরও তিনবার এমন হল সে রাত্তিরে। সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করবার জন্য হাঁকিনীরা কত বীভৎস রূপ ধারণ করে এল—একসময় তো তাকিয়ে দেখলাম আমার আসনের চারদিকে চলন্ত গলিত মৃতদেহের দল করতালি দিয়ে নৃত্য করছে। যে কোন সাধারণ মানুষের হৃৎপিণ্ড থামিয়ে দেবার পক্ষে এ দৃশ্য যথেষ্ট। সে মুহূর্তে বুক যে একটু কেঁপে ওঠেনি তা বলব না। প্রাণপণে মনকে একাগ্র করে বীজমন্ত্র জপ করতে লাগলাম, ধীরে ধীরে মিলিয়ে এল প্রেতের দল।

অনেকের মধ্যেই ভুল ধারণা আছে যে, একরাত শবসাধনা করলেই বুঝি সিদ্ধিলাভ হয়। বিশেষ বিশেষ তিথিতে কয়েকবার আসনে বসলে তবেই সিদ্ধি আসে। এতে অনেকবছরও লেগে

যেতে পারে। ধরো, তিথি সুপ্রশস্ত, পূজার সব আয়োজনই করা হয়েছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত শব পাওয়া গেল না। সব পণ্ড। আমারও তাই হয়েছিল। নানা কারণে ওই একবার ছাড়া আর শবসাধনা করতে পারিনি। গুরুর কাছ থেকে যখন বিদায় নিয়ে আসি তখন তিনি সাবধান করে বলেছিলেন—শোনো, সময়মত সাধনা সম্পূর্ণ কোরো। তোমাকে তো সবই শিখিয়ে দিয়েছি, আমি না থাকলেও অসুবিধে হবে না। নইলে কিন্তু বিপদ—

—আজ্ঞে, কি রকম বিপদ?

—ভয়ঙ্কর বিপদ। মৃত্যুর পরে আত্মা সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বগতি পায় না। বেশ কিছুক্ষণ নিজের প্রাণহীন দেহটার কাছে ঘোরাফেরা করে। যার দেহ নিয়ে শবসাধনা করা হয়, তার আত্মা দেখতে পায় দেহের সৎকার হয়নি—বরং সেটা সাধক নিজের কাজে লাগিয়েছে। তাতে মৃতের আত্মা নিশ্চয় খুশি হয় না। সে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খোঁজে। সাধনা সম্পূর্ণ করলে সাধক অমিত শক্তিলাভ করে, ফলে তার আর ভয় থাকে না। নাইলে বুঝতেই পারছ কি বিপদ হতে পারে। সাবধানে থেকো, জানো তো, প্রবাদ আছে—সাপুড়ের মরণ সাপের হাতে। তোমার ভাগ্য আমি গণনা করে দেখেছি, তুমি একটানা সাধনা করতে পারবে না, আবার তোমাকে ফিরে যেতে হবে গৃহাশ্রমে। আবার বেরুবে—এবং ফিরে যাবে। এইভাবেই চলবে। শবসাধনা গৃহে বসে করবার জিনিস নয়। কাজেই একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ার আগে কর্ম সম্পূর্ণ করে রেখো।

তারপর আমার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে গুরু বললেন—কিন্তু—তোমার কপালে একটা আশ্চর্য যোগাযোগের চিহ্ন রয়েছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। খুব বড় একজন মহাপুরুষ, কিংবা মহাসাধক তোমাকে কৃপা করবেন। দেখি হাতটা—

ডান হাত বাড়িয়ে দিলাম। উনি হাতটা ধরলেন, কিন্তু দেখলেন না, তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। বললাম—কি ধরনের মহাপুরুষ?

—এমন কোন উচ্চমার্গের মুক্ত আত্মা যার নাম মুখে উচ্চারণ করার যোগ্যতা আমার নেই। সবরকম সাধনা ও সিদ্ধির উর্ধ্বে চলে গিয়েছেন এমন কেউ। ইতি তোমাকে অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

আমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কবে এঁর দেখা পাব?

শান্তকণ্ঠে গুরু বললেন—এঁর দেখা তুমি পেয়েছ।

—সে কি! কবে?

—তা জানি না। তবে মহাগুরুর সান্নিধ্য পেলে দেহে ও মনে যে যে লক্ষণ ফুটে ওঠে, তা তোমার রয়েছে।

—আমি দেখা পেলাম আর আমিই জানতে পারলাম না?

গুরু বললেন—তেমন তো হতেই পারে। এসব সাধকদের কোন ভেকও নেই, ভড়ংও নেই। নিতান্ত সাধারণ মানুষের মত বেড়ান, দেখলেও হয়ত চিনতে পারবে না।

হঠাৎ আমার ছোটবেলায় দেখা সেই অদ্ভুত মানুষটিকে মনে পড়ে গেল। রোদ ঝিম্‌ঝিম্ করা কইখালির মাঠ, সেই শুয়োরের দল, আমার হারানো শৈশব। তিনিই কি আমার জীবনের অজানা মহাপুরুষ?

তরাই অঞ্চলে কোথায় তন্ত্রসাধকদের এক গোপন মিলনসভা হবে খবর পেয়ে গুরু সেখানে রওনা হয়ে গেলেন, আমি আর সঙ্গে গেলাম না। এবার কিছুদিন একা থাকব ঠিক করলাম। পথে পথে ঘুরি, বেশির ভাগই শ্মশানে-মশানে রাত কাটাই, ক্বচিৎ কখনও কোন গৃহস্থবাড়িতে আশ্রয় নিই। একদিন এক রেল স্টেশনের প্লাটফর্মে বসে আছি, আমার ট্রেন আসতে ঘণ্টাখানেক দেরি। সেটা জংশন স্টেশন, লুপ লাইনে যেতে হলে ওখান থেকে গাড়ি বদল করতে হয়।

প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছে সকাল থেকে, আকাশ কালো হয়ে রয়েছে মেঘে। ঝুপঝুপ করে বৃষ্টির আর যেন বিরাম নেই।

দু-পয়সার বিড়ি কিনব বলে স্টেশনের দোকানটার দিকে এগুচ্ছি, হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডাকল—আরে, তারানাথ না?

থমকে দাঁড়ালাম। এমন জায়গায় আমার নাম ধরে কে ডাকে? এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি ওজন করার লোহার কলের পাশে কয়েকটা চটের বস্তার আড়ালে বেঞ্চির ওপর বসে আছে আমাদের গ্রামের ভূপতি শিকদারের ছেলে রমাপতি। ছোটবেলায় এই রমাপতিই বোধ হয় গ্রামে আমার একমাত্র বন্ধু ছিল। কতদিন ওদের বাগান থেকে দুপুরে কাঁচা পেঁপে ছিঁড়ে এনে নুন দিয়ে খেয়েছি। গ্রামের পুরনো বন্ধুকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে গেলাম, রমাপতিও উঠে এসে আমার হাত ধরে বলল—উঃ, কতদিন পরে দেখা! এখানে কি করছিস রে? তোর গেরুয়া কই?

হেসে বললাম—আমি কি সন্ন্যাসী হয়েছি নাকি, যে গেরুয়া পরে ঘুরব?

—সন্ন্যাসী হোস্ নি? তবে যে সবাই বলে তুই সাধু হয়ে চলে গিয়েছিস?

—সংস্কৃতে সাধু মানে ভাল লোক, সেটা হবার চেষ্টা করছি বটে—তবে ভেকধারী সন্ন্যাসী হইনি। তুই এখানে কেন?

—আমার শ্বশুড়বাড়ি এখান থেকে ট্রেনে বদল করে যেতে হয়। বৌ সেখানে আছে, আনতে যাচ্ছি। আয় ওই দোকানটায় চা খাবি?

পুরনো বন্ধুর অকৃত্রিম আগ্রহে রমাপতি আমার হাত ধরে টেনে চায়ের দোকানে গিয়ে চা আর কেকের অর্ডার দিল। পকেট থেকে নতুন মেপোল সিগারেটের প্যাকেট বের করে আমাকে একটা দিয়ে বলল—ধরা। তারপর তুই কোথায় যাচ্ছিস বললি না তো?

—বিশেষ কোথাও না। বাড়ি ছাড়ার পরে এইরকমই ঘুরে ঘুরে বেড়াই, একজায়গায় থাকি না বেশিদিন—

—কেন বল দিকি? এতে লাভ কি?

—তা তো তোকে বোঝাতে পারব না ভাই! যারা বাড়িতে থাকে, তাদের দেখে আমার মনে হয়, এতে তাদের লাভ কি? কাজেই এর 'ঠিক কোন উত্তর হয় না।'

রমাপতি চুপ করে রইল! তার মুখ দেখে বুঝলাম আমার উত্তরটা তার বিশেষ পছন্দ হয়নি, সে বুঝতেও পারেনি। গৃহত্যাগ করে বিদেশে গিয়ে অর্থ উপার্জন করলে বোঝা যায়, বাড়ি থেকে পালিয়ে সাধু-সন্ন্যাসী হলে তারও যাহোক একটা মানে হয়—কারণ তেমনটা বহু ঘটতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু সে-সব কিছু নয় খামোকা একজন মানুষ বাড়ির আরাম ছেড়ে পথে পথে বেড়িয়ে বেড়ায়—এর কারণ সে ধরতে পারছে না।

চা খেতে খেতে রমাপতি বলল—তুই তো বেশ অনেকদিন বাড়ি ছেড়েছিস, তাই না?

—হ্যাঁ।

—যেতে বাধা আছে কোন?

—না, বাধা আর কি? আমি তো আর গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হইনি—তোকে বললাম না? যখন ইচ্ছে করবে চলে যাব।

চায়ের কাপ দোকানীকে ফেরত দিয়ে রমাপতি একটু ইতস্তত করে বলল—তারানাথ, তোর বোধহয় এখন একবার বাড়ি যাওয়া উচিত—

তার গলায় কেমন একটা সুর ছিল, ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন বল তো? হঠাৎ বাড়ি যাব কেন?

—কাকীমার খুব অসুখ। অবস্থা তেমন একটা—মানে, কখন কি হয় বলা যায় না। তুই একবার যা—

বিশ্বে মাতৃশক্তি একটা খুব বড় শক্তি। আমার পথে পথে বেড়ানো যাযাবর জীবন, সাধুসঙ্গে আগ্রহ, সিদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষা—সব কোথায় উড়ে গেল। মনে হল, যাঁর নাড়ি ছিঁড়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছি, যাঁর কোলে খেলা করে বড় হয়েছি—আমার সেই চিরপরিচিত সদাহাস্যমুখী মা অসুস্থ। তিনি হয়ত আমাকে দেখতে চান—আমি এখুনি বাড়ি যাব।

কি ভয়ানক বৃষ্টি। থামবার নাম নেই। তারই মধ্যে ভিজতে ভিজতে পরের দিন দুপুর নাগাদ বাড়ি পৌঁছলাম। মানুষের মনের সঙ্গে শরীরের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। মায়ের রোগশয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে আমাকে দেখে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিছানায় বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলাম—এখন কেমন আছ মা?

উত্তরে মা শীর্ণ হাত দিয়ে আমার চিবুক ছুঁয়ে বললেন—ভয় নেই খোকা, তুই এসে পড়েছিস—এ যাত্রা আমি আর মরব না।

সত্যই পরের দিন থেকে মায়ের অবস্থা ভালোর দিকে যেতে লাগল। আমি ফেরায় বাড়ির লোকও খুশি। খাইদাই আর চণ্ডীমণ্ডপে বসে বৃষ্টি দেখি। চার-পাঁচদিন ধরে নাগাড়ে বর্ষা চলেছে। গ্রামের সব পথে একহাঁটু কাদা, খালবিল আর মাঠ একাকার হয়ে গিয়েছে জলে। আমাদের পুরনো কৃষাণ বনমালী ভিজতে ভিজতে বলল—দাদাবাবু, এমন কাণ্ড জম্মে দেখিনি! সারা গাঁ থৈ থৈ করছে, পাঁচু হালদারের বাঁশবাগানে একহাঁটু জল! তার চে আশ্চর্য কইখালির মাঠে মাছ খেলছে দেখে এলাম শিং-মাগুর, পোনার চারা, কই—শয়ে শয়ে মাছ!

কৈশোরে মাছ ধরবার খুব নেশা ছিল। শুধু বঁড়শি দিয়ে নয়, পোলো, হাত-জাল আর কোঁচ দিয়েও বহু মাছ ধরেছি। মাছ খাব বলে মাছ ধরা নয়, আসলে এর তোড়জোড় আর মজাটাই বড় কথা। বনমালীর বর্ণনা শুনে হঠাৎ পুরনো নেশাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এমন ঘনঘোর বর্ষা দিনরাত্রির ব্যাঙ ডাকছে খালেবিলে—এই তো মাছ ধরার উপযুক্ত সময়। বনমালীকে ডেকে বললাম—বনমালীদা, তোমার কাছে একটা পোলো হবে?

—পোলো? মাছ ধরবে নাকি?

—হ্যাঁ। অনেকদিন অভ্যেস নেই অবিশ্যি, দেখি তবু—

—আছে বোধহয় একটা। ওবেলা এনে দেব এখন।

বিকেলে বনমালী পোলো এনে দিল। পোলো জানো তোমরা? বেত বা কঞ্চির চটা দিয়ে তৈরি একটা গোল খাঁচামত জিনিস, ফুটতিনেক উঁচু। ওপরদিকে সরু মুখ, সেখান দিয়ে হাত গলিয়ে মাছ বের করতে হয়। তলার দিকের ঘের বড়। মাছ দেখতে পেলেই ঝপ্ করে পোলো দিয়ে চেপে ধরলে আর পালাতে পারে না। ছিপ না নিয়ে পোলো নেবার কারণ হল—আমি রাত্তিরে মাছ ধরব স্থির করে ফেলেছি। আলো নিয়ে মাছ ধরা ভারি মজার। বিশেষ করে সে সময়ে বিরক্ত করার কেউ থাকে না, পাশে দাঁড়িয়ে পরামর্শ দেয় না, কটা মাছ পেয়েছি জিজ্ঞাসা করে না। রাত্তিরেই ভাল।

পোলো দিয়ে মাছ ধরতে হলে পুকুর বা বিলে সম্ভব নয়, অগভীর জলাশয় প্রয়োজন। সন্ধ্যের একটু আগে গিয়ে কইখালির মাঠের অবস্থা দেখে এলাম। সমস্ত মাঠটায় পায়ের গোছ ডুবে যায় এমন জল। মাঝে মাঝে সামান্য উঁচু জমি এখানে-ওখানে দ্বীপের মত জেগে আছে। একেবারে আদর্শ জায়গা।

খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত এগারোটা নাগাদ লণ্ঠন আর পোলো নিয়ে বেরুলাম। বনমালী সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, আমি রাজি হইনি। ওই যে বললাম, মাছ ধরার পরিবেশটাই আসল। সঙ্গে লোক থাকলে বকবক করবে, নানান্ কথা বলবে—নাঃ, সে সুবিধে হবে না।

কিন্তু বনমালীকে সঙ্গে নিলেই ভাল করতাম। তখনও জানিনা কি ঘটতে চলেছে সেদিন রাত্তিরে।

সন্ধ্যে থেকে বৃষ্টিটা একটু ধরেছে, আজ পাঁচদিন পর এই প্রথম একটু ক্ষান্তি। কিন্তু সমস্ত আকাশ কালো মেঘে ঢেকে রয়েছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে একটু বাদে বাদেই। যে কোন সময়ে আবার ঝেঁপে জল আসতে পারে। খুড়তুতো ভাইয়ের কাছ থেকে তার বাঁশের হাতলওয়ালা ছাতাখানা চেয়ে এনেছি, সেটা বগলে রয়েছে। ভাঁজ করা ছাতার ভেতরে আছে মুগার সুতো দিয়ে বোনা জালের থলে। মাছ পেলে তাতে রাখা হবে। আয়োজন সব ঠিক, এবার দেখা যাক কি রকম কি হয়। ভোর রাত অবধি চেষ্টা তো চালিয়ে যাব।

মাঠে পা দিয়েই বুঝলাম বনমালী মিথ্যে খবর দেয়নি। খালবিল ভেসে গিয়ে প্রচুর মাছ চলে এসেছে কইখালির মাঠে। কিন্তু মাছ থাকা আর মাছ ধরা এক ব্যাপার নয়। তুমি পোলো হাতে এগিয়ে গিয়ে ঝুপ্ করে চেপে ধরবে বলে মাছ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে তা তো হয় না। জলের জীব—বহু কৌশল করে তবে এদের ধরতে হয়। কৌশল আমার অজানা নেই, ছোটবেলা থেকে মাছ ধরে আসছি। যেমন ধর, শোল বা ল্যাটা মাছ লণ্ঠন উঁচু করে ধরে নাড়ালে আলোয় আকৃষ্ট হয়ে কাছে আসে। কইমাছ আবার আলোটালো কিছুই খেয়াল করে না, ঝাঁকবেঁধে একদিকে চলেছে তো চলেছেই। এদের ধরা সোজা। শিং আর মাগুর খুব চালাক মাছ, মানুষ বা অন্য কিছুর সাড়া পেলেই আর সে তল্লাটে থাকে না, শোঁ শোঁ করে পালায়—এরা ছোটেও খুব জোরে, জলের মধ্যে দৌড়ে নাগাল পাওয়া যায় না। কিন্তু মজা হচ্ছে, শিং-মাগুর ছোটে একদম সোজা, কোন্‌দিকে গেল খেয়াল করলে একটু পরে পেছন পেছন সেখানে গিয়ে হাজির হওয়া যায়। সচরাচর এরা তাড়া খেয়ে আলের ধারে বা গাছের শেকড়ের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়, খোলা জায়গায় থাকে না। অমন জায়গায় পোলো বসানো মুশকিল। তখন পা দিয়ে জলে শব্দ করতে হয়, ভয় পেয়ে মাছ আবার দৌড় দেবার উদ্যোগ করলেই তাড়াতাড়ি পোলো বসিয়ে দিতে হয়। যাক্ গে, কথায় কথায় অন্য প্রসঙ্গে চলে এসেছি, আসল কথাটা বলি।

রাত দেড়টার মধ্যে অনেক মাছ ধরে ফেললাম। মুগার সুতো দিয়ে তৈরি ব্যাগ এত ভারী হয়ে উঠেছে যে, শক্ত সরু সুতো হাতে কেটে বসে যাচ্ছে। এদিকে আবার মেঘ ডাকতে শুরু করেছে, গা শিরশির করা বাদলার হাওয়া দিচ্ছে—বৃষ্টি ফের এল বলে। এবার 'বাড়ি' চলে যাওয়াই ভাল।

অনেকক্ষণ থেকেই মনের ভেতরে কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল, কি অস্বস্তি সেটা আমি ঠিক বলে বোঝাতে পারব না। কোন অমঙ্গল আসবার আগে থেকে আমি টের পাই, এ কথা আগেই বলেছি। এতক্ষণ মনের একেবারে তলায় কোণের দিকে কোথাও একটা বিপদের পূর্বাভাস খচ্ খচ্ করছিল, মাছ ধরার আনন্দ আর উত্তেজনায় খেয়াল করিনি। এবারে পরিপূর্ণ সম্বিত ফিরে পেয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম ঘনবর্ষার মধ্যরাত্রে গ্রামের বাইরে নির্জন জলভরা মাঠে একা দাঁড়িয়ে আছি। একটা শেয়াল পর্যন্ত এই দুর্যোগে আশ্রয় ছেড়ে বাইরে বের হয়নি। তেমন কিছু ঘটলে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে আসবে না। নাঃ, বনমালীকে সঙ্গে আনাই উচিত ছিল। এই জলকাদা ভেঙে বাড়ি পৌছতেও অন্তত আধঘণ্টা সময় লাগবে। তার মধ্যে আবার বৃষ্টি এসে গেলেই তো হয়েছে।

ভাবতে ভাবতেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল। তাড়াতাড়ি ছাতা খুলতে যাচ্ছি, কেমন করে যেন হাত ফসকে লণ্ঠনটা জলে পড়ে নিভে গেল।

চারদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আলো থাকলে বুকে বেশ সাহস থাকে। তাছাড়া আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রে বলে আগুন হচ্ছে পবিত্রকারী শুভশক্তি, কোন অশিব উপস্থিতি আগুনের সান্নিধ্যে আসতে পারে না। এইজন্য সাধকদের আসনে সবসময় ধুনি জ্বালিয়ে রাখা নিয়ম। কিন্তু দাঁড়িয়ে থেকে তো লাভ নেই, বরং আন্দাজে আন্দাজে চলতে শুরু করাই ভাল। মাছ ধরতে ধরতে মাঠের একেবারে অপর প্রান্তে চলে গিয়েছিলাম। এবার মাঠ পার হয়ে সেই চটকাগাছটার পাশ দিয়ে গ্রামের পথে ঢুকতে হবে। মাথায় ছাতি ধরে মাছভর্তি থলে আর নেভা লণ্ঠন হাতে চটকাগাছটা আন্দাজ করে হাঁটতে শুরু করলাম।

হঠাৎ দিকদিগন্ত উদ্ভাসিত করে একবার বিদ্যুৎ চমকাল।

সামনের দিকে তাকিয়েছিলাম, অন্ধকারে হাঁটবার সময় মানুষ যেমন মুখটা একটু তুলে রাখে, বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্ট দেখলাম উলটোদিক থেকে একজন মানুষ আমার দিকে এগিয়ে আসছে। বিদ্যুতের আলো একমুহূর্তের বেশি ছিল না, কিন্তু আলো নিভে যাবার পরেও মনে মনে চিন্তা করে কোথায় কি দেখেছি, কতটা দেখেছি বোঝা যায়। যে লোকটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে তার হাঁটার ভঙ্গিতে কোন জড়তা নেই, অন্ধকারেও যেন সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। তার গা খালি, কালো রঙ—পরনে একটা নেংটিমত কাপড়ের ফালি। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা ও লোকটাকে আমি চিনি! খুব পরিচিত সে, এই—কিছুদিনের ভেতরেই কোথায় যেন দেখেছি। কোথায়? কোথায়?

অকস্মাৎ আমি বুঝতে পারলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম আমি ভয়ানক বিপদগ্রস্ত। জীবিত অবস্থায় এ মাঠ থেকে বেরুতে পারব কিনা তার নিশ্চয়তা নেই। কারণ—

যে মানুষটির মৃতদেহের ওপর বসে ছ-মাস অগে আমি সাধনা করে এসেছি তার শব এগিয়ে আসছে আমার দিকে, বৃষ্টিধারার মধ্যে দিয়ে।

গুরুর কথাই ফলে গেল। সময়মত সাধনা শেষ করতে পারিনি, এবার সেই শৈথিল্যের মূল্য বুঝে নিতে আসছে ওই মূর্তি!

যতদূর সম্ভব শব্দ করা থেকে বাঁচিয়ে সাবধানে জলে পা ফেলে ডানদিকে সরে যেতে লাগলাম—একটু ঘুরপথে হলেও যদি ওই জীবন্ত বিভীষিকার হাত এড়িয়ে গ্রামের পথে পা দিতে পারি। একবার বাড়ি পৌঁছতে পারলে আর ভয় নেই। সেখানে প্রতিষ্ঠিত গৃহদেবতা আছেন, সেখানে এই শরীরী আতঙ্ক প্রবেশ করতে পারবে না।

অনেকখানি সরে এসেছি এমন সময় আবার চমকে উঠল বিদ্যুৎ। চকিত মুহূর্তের মধ্যেই দেখতে পেলাম চলন্ত অপচ্ছায়াও তার গতিপথ বদলে সোজা আমার দিকে আসছে।

আমারই ভুল। অন্ধকারে ওই ভয়ঙ্করের দৃষ্টি বাধা পায় না। এভাবে ওকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা বৃথা। আদিম জড়বিশ্বের বুদ্ধিহীন, চেতনাহীন অন্ধশক্তির দ্বারা চালিত হয়ে একটা বিকৃত মানবদেহ অমোঘগতিতে আমার নিকটবর্তী হচ্ছে। কোনোক্রমে বাড়ি ফিরতে পারলে কয়েকটা গূঢ় প্রক্রিয়ার দ্বারা একে আমি ঠেকাতে পারি, কিন্তু এই মাঠে দাঁড়িয়ে তা সম্ভব নয়।

শেষ চেষ্টা করার জন্য আমি হাতের জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে মাঠের দূর প্রান্তের দিকে প্রাণপণে দৌড়তে লাগলাম। পারব কি গ্রামের পথে পৌঁছতে? সে পথে একটু এগিয়ে হাঁক দিলে গ্রামের শেষে কোনো বাড়ি থেকে হয়ত শুনতে পাওয়া যাবে।

হঠাৎ অন্ধকারে উঁচুমত একটা কিসের সঙ্গে হোঁচট খেয়ে ঠিকরে পড়লাম জলে। প্রথমেই বলেছি মাঠের মধ্যে কয়েক জায়গায় উঁচু ডাঙা দ্বীপের মত জেগে ছিল, তারই একটাতে ঠোক্কর লেগে পড়েছি বুঝতে পারলাম। একটা মাটির ঢেলা বা ইঁটের টুক্‌রোতে ডান হাঁটু পড়েছিল, দারুণ যন্ত্রণায় মাথার ভেতর অবধি ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। হাঁটু আর সোজা করতে পারছি না।

বেশ কিছুক্ষণ আর উঠতে পারব না বুঝতে পারলাম। এতক্ষণ নিজের পায়ের শব্দে টের পাইনি, এবার শুনতে পেলাম ছপ্ ছপ্ করে জলের ওপর দিয়ে ভারী পায়ের আওয়াজ ক্রমেই এগিয়ে আসছে কাছে। এল, এল, ওই এল!

অতিরিক্ত ভয়ে, আতঙ্কে আর আসন্ন ভয়াবহ মৃত্যুর উপলব্ধিতে অকস্মাৎ আমার মন থেকে সবরকম অনুভূতি লুপ্ত হয়ে গেল। হাঁটু চেপে ধরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছি, মুখের ওপর ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, কানে ভেসে আসছে দূরাগত মেঘগর্জন—কিন্তু হাঁটুতে প্রবল যন্ত্রণা ছাড়া পৃথিবীর আর সব বাস্তবতা আমার কাছে অর্থহীন হয়ে গিয়েছে।

এমন সময় আমার চারদিকে জলের ওপর অনেকগুলো পায়ের শব্দ জেগে উঠল। অগুনতি পা দ্রুত জলে পড়ছে, কারা যেন ছুটে যাচ্ছে এদিকে সেদিকে। আশ্চর্য। কাদের পায়ের শব্দ এ? এখানে আসতে হলে তো জল পেরিয়ে জানান দিয়ে আসতে হবে, কিন্তু এই পদশব্দ যেন অকস্মাৎ জলের বুকেই জন্ম নিল—শূন্য থেকে জেগে উঠল হঠাৎ।

তড়বড় করে একদল ঘোড়া যেন ছুটে যাচ্ছে সামনে-পেছনে। কি ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছি না। বিদ্যুতও চমকাচ্ছে না বেশ কিছুক্ষণ।

এবং তারপরেই আমার চারদিকে একপাল শুয়োরের ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনতে পেলাম!

এই দুর্যোগে কইখালির মাঠে শুয়োর কোথা থেকে এল? তাও একটা দুটো নয়, পায়ের আওয়াজে বুঝতে পারছি পনেরো কুড়িটা প্রাণী অন্তত ছুটোছুটি করছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে পড়ে গেল শৈশবে দেখা সেই অদ্ভুত মানুষটিকে, সরু হাড়ের দণ্ড দিয়ে যিনি শূকররূপী হিংস্র প্রবৃত্তিগুলিকে শাসন করেন। তবে কি তিনিই—

আমার খুব কাছে এসে কে দাঁড়িয়েছে। তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু সে আমাকে দেখতে পাচ্ছে। আমার মনে আর ভয় নেই, পরিবেশ থেকে মুছে গিয়েছে অমঙ্গলের অনুভূতি। বরং কার অদৃশ্য উপস্থিতিজনিত পবিত্রতা অনুভব করছি সমস্ত অস্তিত্বে।

কে যেন ভালবেসে হাত রাখল—না, আমার হাতে নয়, শরীরের কোথাও নয়—সে হাত রেখেছে আমার বুকের ঠিক মধ্যেটায়।

তারপরই বুঝলাম মাঠে আমি একা, সে উপস্থিতি আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করে ফিরে গিয়েছে স্বস্থানে। এতক্ষণ বাদে এবার বিদ্যুৎ চমকাল, আকাশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে চিরে যাওয়া আলোয় ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম কোথাও আর কেউ নেই। সে অপচ্ছায়াও নয়—আমার ত্রাণকর্তাও নয়।

রাত বোধহয় আড়াইটে। বৃষ্টি ঝরছে তো ঝরছেই।

কোনোরকমে বাড়ি ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে মেঘ কেটে সূর্য উঠল পাঁচ-ছ'দিন বাদে। ঝকঝকে রোদ্দুরে ভেসে যাওয়া পৃথিবীর রূপ দেখে আমার নিজেরই সন্দেহ হতে লাগল—সত্যিই কি কাল রাত্তিরে কিছু ঘটেছিল? বাড়ির কাউকে কিছু জানালাম না। অনর্থক তাদের চিন্তা বাড়িয়ে লাভ কি?

মা সুস্থ হয়ে ওঠার মাসখানেক পরে আবার বাড়ি ছাড়লাম। একটানা গৃহবাস ঈশ্বর আমার কপালে লেখেন নি। ঘুরতে ঘুরতে এক সন্ধ্যায় খামারবেড়িয়া নামে এক গ্রামে গিয়ে পড়লাম। দেখি গ্রামের একধারে ঝুরিনামা বটগাছের নিচে একজন জটাধারী সাধু ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। ভাবলাম ভালই হল, আজ রাত্তিরটা অন্তত এঁর সঙ্গে কাটানো যাবে। গুটি গুটি ধুনির এপারে গিয়ে বসলাম। প্রত্যেক গ্রামেই কিছু লোক থাকে যারা সাধু-সন্ন্যাসী দেখলে ওষুধ-বিষুধ আর মাদুলির জন্য ভিড় করে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জনাকয়েক লোক করুণমুখে

তাদের দুঃখদুর্দশার কথা সাধুকে জানাচ্ছে। ক্রমে তারা বিদায় নিয়ে চলে গেলে সাধুবাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—তারপর? তোমার কি চাই?

সবিনয়ে জানালাম, আমার কিছু চাই না।

—তবে আর কি, যাও, বাড়ি যাও—

দু-এক কথায় বুঝিয়ে দিলাম আমার বাড়ি এখানে নয়, আমি পথে পথে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি, আপাতত রাতটা এখানে কাটাতে চাই।

সাধু আর কোনো ব্যক্তিগত প্রশ্ন করলেন না, বললেন—থাকো।

একটু পরে নিজের ঝুলি থেকে একটা পাকা কলা আর একটা পেয়ারা বের করে আমাকে দিয়ে বললেন—খাও, আর কিছু আমার কাছে নেই।

—আপনি খাবেন না?

—আমি রাত্তিরে কিছু খাই না।

দু-একটা কথা বলতে বলতে আলাপ জমে উঠল। দেখলাম সাধুজী স্বল্পভাষী হলেও বদমেজাজী নন। একসময় আমাকে বললেন—এখানে ধুনি জ্বেলে আজ ভুল কাজ করেছি, বুঝলে? দু-একদিন থাকব ভেবেছিলাম, কিন্তু কাল চলে যেতে হবে।

—আজ্ঞে, কেন?

ওপরদিকে আঙুল তুলে সাধুজী বললেন—এই গাছে অনেক পাখির বাসা রয়েছে, ধুনির গরম হল্‌কা আর ধোঁয়ায় তারা আজ কেউ বাসায় ফিরতে পারেনি। ওই দেখ, ওদিকে একটা গাছের ডালে বসে কিচ্‌মিচ্ করছে। কাউকে গৃহহীন করা মহাপাপ। ইতর প্রাণীদেরও আত্মা আছে, তাদের মনে দুঃখ দিলে সাধনার ফল ক্ষয় হয়ে যায়—

বললাম—যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—কি?

—আপনি কোন্ মার্গের সাধক?

—কেন বল তো?

—আপনার কথা শুনে আমার খুব ভাল লাগছে। আমি অনেক সাধুসঙ্গ করেছি, বেশির ভাগ সাধকেরা অন্তরে মহৎ হলেও বড় কটুভাষী, অপরের দুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন। আপনার মত কথা বলতে শুনিনি কাউকে।

সাধু মৃদু হেসে বললেন—কোনো মার্গেরই নয়। আমার দীক্ষাই হয়নি।

অবাক হয়ে বললাম—সে কি! তাহলে?

—তাহলে আর কি? ভগবানের স্বরূপ জানতে ইচ্ছে করে, তাই ঘুরে বেড়াই, তাঁর সৃষ্টির বিচিত্র রূপের মধ্যে তাঁকে খুঁজতে চেষ্টা করি। ভগবানকে ডাকব, তার আবার মার্গ কি? দীক্ষা কি?

সাধুজীর ওপর শ্রদ্ধা হল। আবছা অনুভব করতে পারলাম—অনেক বড় সাধক ইনি। সারারাত ধরে কত গল্প করলেন, ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিলেন। সঙ্কীর্ণতা নেই এতটুকু। সব মতের প্রতিই সমান শ্রদ্ধা।

তাঁকে প্রশ্ন করলাম—আপনি যে ভগবানকে ডাকেন, তাঁর কোন্ রূপ কল্পনা করেন ধ্যানের সময়?

—কোনো রূপই নয়। মনকে কেন্দ্রীভূত করতে পারলে ঈশ্বরের রূপকল্পনার প্রয়োজন হয় না। দু-রকম শক্তি মহাবিশ্বে ক্রিয়াশীল। শুভশক্তি, আর ঈশ্বরবিরোধী অশুভশক্তি। বিশ্বের সৃষ্টির সময়েই এই দুই শক্তির জন্ম। ঈশ্বরবিরোধী শক্তির ক্ষমতা কিন্তু কম নয়, বৌদ্ধধর্মে একেই 'মার'

হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। কালভৈরবের মাধ্যমে জগদীশ্বর এর দমন করেন। সর্বদা এই দুই শক্তির লড়াই চলেছে। তোমার চারদিকে তার প্রকাশ তো দেখতেই পাচ্ছ—

বললাম—কালভৈরব কে?

—তিনি শুভশক্তির প্রয়োগকর্তা। দক্ষিণকালিকাতন্ত্রে তাঁর রূপ কল্পনা করা হয়েছে এইভাবে—মহাবলশালী পুরুষ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, নগ্নগাত্র, রিপুতাড়ন তাঁর প্রধান কর্ম। শূকরের ছদ্মবেশে কাম-ক্রোধ-হিংসা ইত্যাদি রিপুগণ তাঁর বশবর্তী হয়ে সর্বদা তাঁর সঙ্গে ঘোরে। নিজের বুকের পাঁজরের একখানা হাড় দিয়ে তিনি তাদের শাসন করেন।

আমি তখন উত্তেজনায় সটান খাড়া হয়ে বসেছি। এ বর্ণনা তো কইখালির মাঠে শৈশবে দেখা সেই মানুষটির সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। বললাম—তারপর?

—আর কি? কালভৈরবই অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করছেন। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শিষ্য তিনি। আমি সেই ভগবানেরই আরাধনা করি।

আমার গলা তখন আবেগে বুঁজে এসেছে। স্বয়ং কালভৈরব সেদিন রাত্তিরে আমাকে স্বয়ং এসে রক্ষা করেছেন। শৈশবে তাঁর অপার করুণার স্পর্শ দিয়েছেন।

একটু চুপ করে থেকে তারানাথ বলল—কিন্তু সে তুলনায় জীবনে কিছুই করতে পারলাম না। কতগুলো তুচ্ছ সিদ্ধাই পেয়েছিলাম, কিছু টাকাকড়ি—বড় কিছুই হল না। এ জন্ম এমনই গেল। দেখি, যদি পরজন্ম বলে কিছু থাকে—অন্তত এবারের ভুলগুলো আর করব না—

তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল—আজকের গল্প এইখানেই শেষ। কিন্তু ভয় পেয়ো না, বলবার মত গল্প আমার ঝুলিতে আরো অনেক রয়েছে। সময়মত বলা যাবে। আজ থামি তাহলে, কেমন?

এই লেখকের আরও
বিখ্যাত কটি বই

কাল নিরবধি
কাজল
সপ্তর্ষির আলো
কক্ষপথ